আলেক্সান্দর পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

আলেক্সান্দর পুশকিন • দ্বিতীয় খণ্ড • গল্প

মহান পুশকিনের (১৭৯৯-১৮৩৭) কথাসাহিত্য তাঁকে যশস্বী করেছে কবিতার চেয়ে কম নয়। লেভ তলস্তয় তাঁর রচনার খুবই গুণগ্রাহী ছিলেন। ১৮৭৩ সালের এপ্রিলে তাঁর এক পত্রালাপীর নিকট তিনি লেখেন, 'পুশকিনের গদ্য আপনি ফের পড়েছেন কি অনেক আগে। আমার জন্যে একটা বন্ধুকৃত্য করুন, 'বেলকিনের গল্প' গোটাটা একবার পড়ে দেখুন... সম্প্রতি আমি পড়লাম, এই পাঠ থেকে আমার কী উপকার হয়েছে আপনাকে বোঝাতে পারব না।'

এই সংকলনে আ্যাছে 'লক্ষ্যভেদ', 'তুষার-ঝঞ্ঝা', 'কফিনওয়ালা', 'স্টেশনের ডাক-বাবু', 'বাবুর মেয়ে, চাষীর মেয়ে' — এই পাঁচটি বিখ্যাত কাহিনী নিয়ে 'প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের গল্প' (১৮৩০) এবং উপন্যাস 'ইস্কাপনের বিবি' ও 'ক্যাপটেনের মেয়ে' (১৮৩৬)।

খণ্ডটি ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক টীকায় সমৃদ্ধ এবং কবির, তাঁর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতিকৃতি, পুশকিনের নিজের আঁকা ছবি এবং তাঁর স্মৃতিজড়িত স্থানের ফোটোগ্রাফে সচিত্র।

আলেক্সান্দর

পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

আলেক্সান্দর পুশকিন। ভ. ত্রপিনিনের আঁকা প্রতিকৃতি। ১৮২৭

আলেক্সান্দর পুশকিন

নির্বাচিত রচনাবলি

দুই খণ্ডে

✿

দ্বিতীয় খণ্ড

গল্প

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ: ননী ভৌমিক এবং অমল দাসগুপ্ত

অঙ্গসজ্জা: দ. ভ. অরলোভ

Александр Пушкин
ИЗБРАННАЯ ПРОЗА

На языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

$\Pi \ \frac{70301-917}{014(01)-80}$ 648—80 4702010100

সূচি

প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের গল্প 7

সম্পাদকের বক্তব্য ৯

লক্ষ্যভেদ . ১৫

তুষার-ঝঞ্ঝা ৩২

কফিনওয়ালা ৫০

স্টেশনের ডাকবাবু ৬০

বাবুর মেয়ে, চাষীর মেয়ে ৭৫

ইস্কাপনের বিবি ১০১

ক্যাপটেনের মেয়ে ১৩৫

টীকা ৩০৩

প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের গল্প

শ্রীমতী প্রস্তাকোভা

আজ্ঞে হাঁ, শৈশবকালেও ওর ঝোঁক ছিল গল্প শোনা।

স্কতিনিন

মিত্রোফানের স্বভাব হয়েছে আমারই মতো।

'বয়স্ক নাবালক'।*

---

* এখানে এবং পরে একটা তারায় চিহ্নিত টীকা বইখানির পরিশেষে দ্রষ্টব্য। — সম্পাঃ

সম্পাদকের বক্তব্য

ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের লেখা যে সব গল্প পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া গেল, তা প্রকাশ করার ভার পেয়ে আমাদের মনে হয়েছিল, লোকান্তরিত লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দিয়ে মুখবন্ধ রচনা করলে ভালো হয়। আমাদের বোধ হয় এই সংক্ষিপ্ত জীবনী রুশ-সাহিত্য অনুরাগীদের বৈধ কৌতূহল কিয়দংশে পূর্ণ করবে। এই ভেবে আমরা ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের নিকটতম আত্মীয়া ও উত্তরাধিকারিণী শ্রীমতী মারিয়া আলেক্সেয়েভ্না ত্রাফিলিনার কাছে অনুরোধ করে চিঠি পাঠাই। দুর্ভাগ্যবশত, বেলকিন সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা গেল না, কেননা বেলকিনের সঙ্গে পরিচয় লাভের কোনো সুযোগই তাঁর হয় নি। তবে তিনি পরামর্শ দেন যেন এ বিষয়ে আমরা বরং ইভান পেত্রোভিচের বন্ধুস্থানীয় একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের কাছে লিখি। এ পরামর্শ আমরা গ্রহণ করি। আমাদের চিঠির যে জবাব আসে তা বেশ সন্তোষজনক; উদার অনুভূতি ও আন্তরিক বন্ধুত্বের অমূল্য স্মারক হিসাবে

চিঠিটিতে আমরা কোনো রকম রদবদল করি নি। জীবনী সংক্রান্ত বিবরণের কাজও এই থেকে বেশ চলে যাবে:

সবিনয় নিবেদন,

আমার এ যাবৎকালের অকৃত্রিম সুহৃদ ও গ্রামাঞ্চলের প্রতিবেশী ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের জন্ম-মৃত্যু, তাঁহার কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, পেশা ও চরিত্র সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহের বাসনা প্রকাশ করিয়া, এ মাসের ১৫ তারিখে আপনারা যে পত্র দিয়াছেন তাহা এই মাসের ২৩ তারিখে আমার হস্তগত হইয়াছে। আমি আপনার অনুরোধ শিরোধার্য করার দায়িত্ব পাইয়া নিজের দিক হইতে অতীব আনন্দ লাভ করিয়াছি। উঁহার সহিত আলাপ পরিচয়ের যাহা কিছু আমার স্মরণে আছে, সে সমুদয় অত্রপত্রে আমার নিজস্ব কিছু কিছু মন্তব্য সহ প্রেরণ করিলাম।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে গরিয়ুখিনো গ্রামের সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের জন্ম হয়। তাঁহার স্বর্গত পিতৃদেব সেকেন্ড্ মেজর পিওতর ইভানভিচ বেলকিন ত্র্যাফিলিন-পরিবারের আইবুড়ী কন্যা পেলাগেয়া গাভ্রিলভনাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক ধনী না হইলেও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং নিজ বিষয়-কার্য পরিচালনার দক্ষতা তাঁহার পূর্ণমাত্রায় ছিল। পুত্রের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় স্থানীয় গির্জার মুনসীর নিকট। এই গুণী লোকটির জন্যেই বোধ হয় বেলকিনের পড়াশুনার আগ্রহ ও মাতৃভাষায় রচনার শখ জন্মে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে বেলকিন জারের একটি পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেন — বাহিনীটির নম্বর আমার স্মরণে নাই। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তিনি এই বাহিনীতে ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা একের পর এক উভয়েই ইহধাম ত্যাগ করায় বেলকিন কাজে ইস্তফা দিয়া জন্মস্থান গরিয়ুখিনো গ্রামে পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি লইয়া বসবাস করিতে থাকেন।

মহাল তদারক করিতে শুরু করিয়া অনভিজ্ঞতা এবং কোমলহৃদয় বশত ইভান পেত্রোভিচের বিষয়-আশয় নিতান্ত অবহেলার মধ্যে গিয়া পড়ে, পৈতৃক আমলের কঠোর শৃঙ্খলা শিথিল হইয়া যায়। মহালের কৃষক প্রজারা তাঁহার প্রধান মন্ডলকে পছন্দ করিত না (প্রজাদের স্বভাবই তাই), এই কারণে তিনি ঐ সুবিবেকী লোকটিকে পদচ্যুত করিয়া গ্রাম-মহালের

তদারকের ভার ছাড়িয়া দেন তাঁহার বাড়ির বৃদ্ধা দাসীর উপর। মেয়েটি ভালো গল্প বলিতে পারিত এই দেখিয়া তিনি উহাকে খুব বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ও বুড়িকে ঠকানো ছিল খুবই সহজ — কোনটা প'চিশ-রুবল নোট কোনটাই-বা পঞ্চাশ রুবল, উহাও সে কখনো চিনিয়া উঠিতে পারিত না। কৃষক প্রজাদের অনেকের ছেলেমেয়ের সে ছিল আবার ধর্ম-মা। তাই উহাকে কোনো প্রজাই ভয় করিত না। তাহারা নূতন এক মণ্ডল স্থির করিল — লোকটি তাহাদের যৎপরোনাস্তি লাই দিত, কৃষকদের সহিত সাঁট করিয়া জানিয়া শুনিয়া সে চুপ করিয়া থাকিত এবং মনিবকে ঠকাইত। ইভান পেত্রোভিচকে ভাগচাষ ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে হইল। উহার পরিবর্তে ভয়ানক কম হারে তিনি কেবল খাজনার প্রবর্তন করিলেন। তৎসত্ত্বেও মনিবের দুর্বলতার সুযোগে কৃষকেরা প্রথম বৎসরের জন্যে বেশ কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিয়া লইল, এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে খাজনার দশ আনারেও বেশি পরিমাণ অংশ কাটানে দিল কেবল বাদাম, বিলবেরি প্রভৃতি ফলপাতি বাবদ এবং এমনকি তাহাতেও বকেয়া খাজনা রহিয়া গেল।

ইভান পেত্রোভিচের স্বর্গত পিতৃদেবের বন্ধু হিসাবে পুত্রকেও সৎপরামর্শ দেওয়া আমার কর্তব্য বলিয়া মনে হয়, ছেলেটির নিজের মুরোদে তো আর কুলাইবে না তাই সাবেকী আমলের নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনার জন্যে আমিই উপযাচক হইয়া বারংবার প্রস্তাব করি। এই উদ্দেশ্যে একদিন আমি বেলকিনের কাছে গেলাম। হিসাব-পাতি খাতাপত্র সব দেখিতে চাহিলাম। হারামজাদা মণ্ডলটাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইভান পেত্রোভিচের সমক্ষেই সে সমুদয় পরীক্ষা করা শুরু করিলাম। নবীন জমিদার প্রথম প্রথম সাতিশয় মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে আমার তদারকি দেখিতেছিলেন; কিন্তু হিসাবপত্র হইতে যেই দেখা গেল যে আগের দুই বৎসরে কৃষক পরিবারগুলিতে লোক বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু হাঁস মুরগী গরু বাছুর ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়াছে অমনি ইভান পেত্রোভিচ আর কিছুই শুনিতে রাজি হইলেন না। হারামজাদা মণ্ডলটাকে আমি জবরদস্ত রকমের জেরা করিয়া ও তদারক চালাইয়া বেসামাল করিয়া আনিয়াছিলাম, উহার পক্ষে আর টুঁ শব্দটি করিবার জো ছিল না, কিন্তু

ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখা গেল ইভান পেত্রোভিচ তাঁহার চেয়ারে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে শুরু করিয়াছেন। ইহাতে আমি যে কিরূপ অপ্রতিভ হই তাহা কি বলিব। সেই মুহূর্ত হইতে আমি উঁহার সম্পত্তির ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করায় ক্ষান্তি দিয়া সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপর তাহা ছাড়িয়া দিই (উনি নিজেও তাহাই করিয়াছিলেন)।

এই সব ঘটনা ঘটিলেও কিন্তু আমাদের মধ্যেকার সৌহার্দ্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কারণ আমাদের যুবাবয়স্ক ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে প্রায়শই যে ধরনের সর্বনাশা শৈথিল্য দেখা যায়, ইভান পেত্রোভিচের মধ্যেও তাহা দেখিয়া আক্ষেপ বোধ করিলেও তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ ছিল অকৃত্রিম। এরূপ সহৃদয় ও মর্যাদাবান যুবাপুরুষের প্রতি প্রীতি অনুভব না করিয়া পারা যায় না। ইভান পেত্রোভিচ নিজেও আমার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং আমার প্রাচীন বয়সের জন্যে যোগ্য সম্মান দেখাইতেন। শেষদিন পর্যন্ত আমাদের দেখাসাক্ষাৎ ছিল প্রায় দৈনন্দিন। আচার-আচরণ, ভাবনাচিন্তা ও স্বভাব চরিত্রের দিক হইতে আমাদের মিল যৎকিঞ্চিৎ হইলেও আমার সহজ আলাপ তিনি পছন্দ করিতেন।

রুচির দিক হইতে ইভান পেত্রোভিচ ছিলেন অত্যন্ত মধ্যম প্রকৃতির— কোনো প্রকার আতিশয্যের মধ্যে তিনি যাইতেন না। মদ্যপানে করিয়া অপ্রকৃতিস্থ হইতে তাঁহাকে আমি দেখি নাই। (আমাদের অঞ্চলের পক্ষে ইহা ভারি আশ্চর্য ব্যাপার বলিতে হয়।) নারী সম্পর্কে তাঁহার বেশ দুর্বলতা ছিল, কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন কুমারীর মতো লাজুক।**

পত্রে যে সমুদয় গল্পের কথা আপনারা লিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া আরো অনেক পাণ্ডুলিপি ইভান পেত্রোভিচ রাখিয়া গিয়াছেন। উঁহারে কতকগুলি আমার নিকট আছে। বাকিগুলিকে বাড়ির দাসী সংসারের নানা কাজে লাগাইয়া দিয়াছেন। যেমন, গতবৎসর শীতকালে, বাড়ির যে অংশে দাসী ছিলেন, তথাকার যাবতীয় বাতায়নের উপর তিনি ইভান পেত্রোভিচের অসমাপ্ত একটি উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের পাতা ছিঁড়িয়া

** এর পরে একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল, বাহুল্য বোধে তা বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পাঠকেরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন তাতে ইভান পেত্রোভিচের স্মৃতির প্রতি হানিকর কিছু ছিল না। (পুশকিনের টীকা)

ছিঁড়িয়া আঠা দিয়া সাঁটিয়া দিয়াছিলেন। উপরিকল্পিত গল্পগুলি তাঁহার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা বলিয়া আমার ধারণা। ইভান পেত্রোভিচ বলিতেন উহার অধিকাংশই সত্য ঘটনা, নানা লোকের নিকট হইতে তিনি সেগুলি শুনিয়াছিলেন।** চরিত্রের নামগুলি কাল্পনিক, যদিও গ্রাম ও বসতগুলি সবই এই অঞ্চলের, উহার মধ্যে আমার নিজের গ্রামটির কথাও রহিয়াছে। কোনোরূপে দুরভিসন্ধিবশত যে তিনি এরূপ করিয়াছেন তাহা নয়, বরং ইহার পিছনে তাঁহার কল্পনার অভাবই কাজ করিয়াছে।

১৮২৮ সালের শরৎকালে ইভান পেত্রোভিচের গুরুতর ঠান্ডা লাগে এবং তাহা হইতে সাংঘাতিক জ্বর দেখা দেয়। আমাদের স্থানীয় যে বৈদ্যটির পায়ের কড়া প্রভৃতি পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসায় সবিশেষ দক্ষতা ছিল, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও কিন্তু ইভান পেত্রেভিচ মারা গেলেন। ঠিক ত্রিশ বৎসর বয়সে ইভান পেত্রোভিচ আমার ক্রোড়েই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, গরিয়ুখিনো গ্রামের গির্জা প্রাঙ্গণে আপন পিতামাতার সমাধির পাশেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

ইভান পেত্রোভিচ ছিলেন মধ্যম দৈর্ঘ্যের লোক, চক্ষু ধূসর বর্ণের, কটা চুল, টিকল নাক, ফরসা মুখ এবং পাতলা ধাঁচের গড়ন।

আমার লোকান্তরিত সুহৃদ ও প্রতিবেশীর জীবনকাহিনী, কাজকর্ম, শখ এবং চেহারা সম্পর্কে এইটুকুই আমার স্মরণ হইতেছে। যদি এ পত্র আপনারা ব্যবহার করা মনস্থ করেন তবে অনুরোধ, দয়া করিয়া আমার নামটি উল্লেখ করিবেন না। কারণ সাহিত্য জগতের ব্যক্তিবর্গের প্রতি সাতিশয় মর্যাদা ও প্রীতি বোধ করিলেও স্বয়ং সে ভূমিকায় অবতীর্ণ

** বস্তুত ই. প. বেলকিনের পাণ্ডুলিপির প্রত্যেকটা গল্পের ওপরেই লেখক স্বহস্তে লিখে রেখেছিলেন অমুকের কাছ থেকে শোনা (কার কাছ থেকে শোনা তা বোঝাবার জন্যে তার পেশা বা খেতাব এবং নামের আদ্যক্ষর দেওয়া ছিল)। উৎসুক পাঠকদের জন্যে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'স্টেশনের ডাকবাবু' গল্পটি তাঁকে বলেছিলেন খেতাবী কাউন্সিলর আ. গ. ন.; 'লক্ষ্যভেদ' গল্পটি বলেছিলেন লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ই. ল. প.। 'কফিনওয়ালা' গল্পটি বলেছিলেন একজন দোকান কর্মচারী ব. ভ.। 'তুষার-ঝঞ্চা' আর 'বাবুর মেয়ে, চাষীর মেয়ে' গল্পদুটি শুনেছিলেন একজন তরুণী মহিলা ক. ই. ত.'র কাছ থেকে। (পুশকিনের টীকা)

হইবার বাসনা আমার নাই। বস্তুতপক্ষে আমার যাহা বয়স তাহাতে উহা মানাইবে না। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে, ইতি...

১৬ই নভেম্বর, ১৮৩০
নেনারাদভো গ্রাম

লেখকের সুহৃদ যে অনুরোধ করেছেন তা পালন করা আমাদের কর্তব্য বলে ভেবেছি। যে বিবরণ তিনি দিয়েছেন তার জন্যে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আশা করি এ চিঠির অকৃত্রিম ও সরল মনোভাবটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

আ. প.

লক্ষ্যভেদ

আমরা একটা ডুয়েল লড়লাম।

বারাতিন্‌স্কি।*

কসম নিয়েছিলাম, ডুয়েলের কান্‌ন মাফিক গ্‌লি করে ওকে
আমি মারব (একটা মার আমার এখনো পাওনা আছে)।

পথচলতি আস্তানায় এক সন্ধ্যা।*

১

ছোটো একটা শহর ক...। সেখানেই আমাদের ছাউনি পড়েছিল। সকলেই জানেন সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসারের জীবনযাত্রাটা কেমন। সকালে ড্রিল আর ঘোড়-দৌড়ের ক্লাস, তারপর রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের বাড়িতে, নয়ত কোনো একটা ইহ্‌দী সরাইখানায় ডিনারের ব্যবস্থা। সন্ধ্যায় মদ আর তাসের আড্ডা। ক... শহরে একটা বাড়িও ছিল না যা আমাদের কাছে অবারিতদ্বার। বিয়ের য্‌গ্যি বয়স হয়েছে এমন মেয়েও পাওয়া যেত না একটিও। তাই এক-একবার এক-একজনের কোয়ার্টারে গিয়ে আমরা জ্‌টতাম। আর সেখানে পরস্পরের ইউনিফর্ম ছাড়া কিছ্‌ই আমরা দেখতাম না।

আমাদের দলের মধ্যে শ্‌ধ্‌ একজন ছিল যে সৈন্যবাহিনীর লোক নয়। বয়স তার প্রায় পঁয়ত্রিশ — আমরা তো তাকে প্রায় প্রৌঢ় বলেই ধরে নিয়েছিলাম। আমাদের তুলনায় ওর একটা মস্ত প্রাধান্য ছিল অভিজ্ঞতা। তা ছাড়া লোকটার স্বাভাবিক গোমড়া ম্‌খ, বদমেজাজী স্বভাব আর কড়া-কড়া কথাবার্তার একটা তীব্র প্রভাব আমাদের কাঁচা মনের ওপর বেশ ছাপ ফেলেছিল। কী একটা রহস্যে তার জীবন ঘিরে ছিল। দেখে মনে হত লোকটা ব্‌ঝি র্‌শী, কিন্তু নামটা ছিল আবার বিদেশী। একসময় সে নাকি ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে কাজ করত — ছিল ভালোই। তা সত্ত্বেও

কেন যে সে ঘোড়সওয়ার বাহিনী থেকে ইস্তফা দিয়ে এই একটা হতচ্ছাড়া ক্ষুদে শহরে এসে ডেরা বাঁধল কেউ জানত না। দিন কাটাত সে একই সঙ্গে কৃপণের মতো, আবার দিলদরিয়ারও মতো। ঘোরাঘুরি করার বেলায় যেত পায়ে হেঁটে, পোশাক বলতে ছিল একটা পুরনো কালো ফ্রক-কোট, কিন্তু আমাদের রেজিমেণ্টের সমস্ত অফিসারের জন্যেই তার বাড়িতে আতিথ্য ছিল অবারিত। একথা অবিশ্যি ঠিক যে ডিনারে পদ থাকত মাত্র দুটি কি তিনটি — আর তা রান্না করত একটা প্রাক্তন সেপাই। অথচ টেবিলে কিন্তু শ্যাম্পেনের স্রোত বইত অফুরন্ত। কী তার আয়, কী বা তার সম্পত্তি এ সব কেউ জানত না, জিজ্ঞেস করতেও সাহস হত না। লোকটার বই ছিল প্রচুর, তার বেশির ভাগই সামরিক পাঠ্যপুস্তক আর উপন্যাস। চাইলেই সে তা পড়তে দিত এবং কখনো ফেরত চাইত না। নিজেও সে কখনো বই ধার নিলে তা আর মালিককে ফেরত দিতে যেত না। কাজের মধ্যে তার কাজ ছিল কেবল পিস্তল চালানো। ওর ঘরের দেয়ালগুলো সব ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল বুলেটের ফুটোয়, মনে হত যেন এক একটি মৌচাক। দরিদ্র যে কুঁড়েতে তার ডেরা ছিল সেখানে ধনসম্পদ বলতে ছিল শুধু একরাশ পিস্তল। লক্ষ্যভেদে হাত ছিল তার খুব উঁচু দরের। সে যদি বলত, এসো মাথার টুপির ওপর পিয়ার ফল রেখে দাঁড়াও, ফল তাক করে গুলি চালাব, তাহলে মাথা পেতে দিতে ভয় করবে এমন একটা লোকেও আমাদের রেজিমেণ্টে পাওয়া যেত না। আমাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যে প্রায়ই উঠত ডুয়েল লড়ার কথা। অথচ সিলভিও (লোকটাকে এই নামেই চালানো যাক) কখনো তাতে যোগ দেয় নি। যদি জিজ্ঞেস করা যেত সে ডুয়েল লড়েছে কিনা তা হলে রূঢ়ভাবে একটা 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া আর কোনো কথায় সে যেত না। বোঝা যেত এরকম প্রশ্ন তার পছন্দসই নয়। আমরা ধরে নিয়েছিলাম হয়ত তার মারাত্মক নিশানার কবলে প্রাণ দিয়েছে এমন কারো স্মৃতি তার বিবেকে বিঁধে আছে। ঘুণাক্ষরেও আমরা ভাবতে পারি নি যে তার মধ্যে কোনো রকম ভীরুতা সম্ভব। কিছু লোক আছে যাদের মুখ দেখেই বলা যায় তা অসম্ভব। কিন্তু পরে এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমরা সকলেই ভারি অবাক হয়ে গেলাম।

সিলভিও-র বাড়িতে একদিন আমরা জন দশ-বারো অফিসার ডিনারে

বসেছি। মদ্যপানও করা গিয়েছিল ঠিক অন্যান্য দিনের মতোই, অর্থাৎ বেশ প্রচুর পরিমাণে। ডিনারের পর গৃহস্বামীকে অনুরোধ করলাম তাস বাঁটতে। সিলভিওকে অনেকক্ষণ ধরেও রাজি করান গেল না — তাস সে খুব কমই খেলত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেদিন সে তাস আনতে বললে, টেবিলের ওপর গোটা পঞ্চাশেক দশ রুবল ছড়িয়ে দিয়ে তাস বাঁটা শুরু করল। আমরাও তাকে ঘিরে বসলাম, শুরু হল খেলা। খেলার সময় একেবারে চুপ করে থাকাই ছিল সিলভিওর ধাত, তর্কও করত না, সাফাইও গাইত না। তাস বাঁটতে যদি কোনো ভুল হত তাহলে সিলভিও হয় তৎক্ষণাৎ দেনা শোধ করে দিত নয়তো বকেয়া হিসাব টুকে রাখত। এসব ব্যাপার আমাদের সকলেরই জানা ছিল — সিলভিওর নিজস্ব নিয়ম কানুন মেনে চলতে আমরা আপত্তি করতাম না। কিন্তু আমাদের মধ্যে সেদিন অন্য রেজিমেণ্ট থেকে সদ্য বদলী একজন অফিসার ছিল। খেলতে খেলতে লোকটা অন্যমনস্কভাবে বাজির পরিমাণ এক পয়েণ্ট বাড়িয়ে দিলে। সিলভিও তার অভ্যাস মাফিক একটা চকখড়ি তুলে নিয়ে আঁকটা ঠিক করে নিল। অফিসারটি ভাবলে বোধ হয় সিলভিওর ভুল হয়েছে, তাই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলে। কিন্তু সিলভিও নীরবে খেলেই চলল। ধৈর্য হারিয়ে অফিসারটি বুরুশ দিয়ে স্কোর বোর্ড থেকে লেখাটা মুছে দিলে। সিলভিও চক নিয়ে সংখ্যাটা আবার লিখে দিলে নতুন করে। মদ আর জুয়ায় আর সঙ্গীদের হাসির প্রভাবে অফিসারটি সহসা উত্তেজিত হয়ে ভাবলে তাকে অপমান করা হয়েছে। টেবিল থেকে পেতলের একটা মোমদানি তুলে সে ছুঁড়ে মারলে সিলভিওর দিকে। অল্পের জন্যে সিলভিও এড়িয়ে গেল। কিন্তু আমাদের অস্বস্তির সীমা রইল না। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে সিলভিও উঠে দাঁড়াল। চোখ তার তখন জ্বলছে। বললে, 'আপনার কপাল ভালো যে ঘটনাটা আর কোথাও না হয়ে আমার বাড়িতেই ঘটল। দয়া করে এবার পথ দেখুন।'

এর পরিণতি যে কোথায় গড়াবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র ছিল না, ধরে নিয়েছিলাম আমাদের নতুন সঙ্গীটির দফা শেষ। লোকটা যাবার সময় বলে গেল, ব্যাঙ্কার ভদ্রলোকটি যখনই বলবেন তখনই এ অপমানের জবাব দিতে সেও প্রস্তুত। খেলা আরো কিছুক্ষণ চলল বটে,

কিন্তু সকলেই আমরা টের পাচ্ছিলাম, গৃহস্বামী আর তাসে মন দিতে পারছে না। সুতরাং একে একে বিদায় নিয়ে আমরা যে যার কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিলাম। শিগ্গিরই যে এবার ওকে খসতে হচ্ছে তাই নিয়ে আলাপ চলল যেতে যেতে।

পরদিন ঘোড়-দৌড়ের ক্লাসে আমরা বলাবলি করছি বেচারা লেফ্‌টেনাণ্ট এখনো বেঁচে আছে কিনা, এমন সময় লেফ্‌টেনাণ্ট নিজেই এসে হাজির। সেই কথা ওকেও জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, সিলভিও এখনো তাকে কিছু জানায় নি। ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগল। সিলভিওর বাড়িতে গিয়ে আমরা হানা দিলাম। দেখি ফটকের ওপর একটা টেক্কা বসিয়ে সে তাসটার ঠিক মধ্যিখানে গুলি করে চলেছে একটার পর একটা। আগের দিনের ঘটনাটার কথা মোটেই না তুলে সে ঠিক তার অভ্যেস মতোই আমাদের আমন্ত্রণ জানালে। এইভাবেই তিনদিন কেটে গেল এবং লেফ্‌টেনাণ্ট বেঁচেই রইলেন। অবাক হয়ে আমরা বলাবলি করলাম, সিলভিও লড়তে চাইছে না, এ কি সম্ভব? কিন্তু সত্যিই সিলভিও লড়ল না। লেফ্‌টেনাণ্টের কাছ থেকে সামান্য একটু ক্ষমা প্রার্থনা আদায় করেই সে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিলে।

জোয়ানদের কাছে এতে বোধ হয় সিলভিওর মর্যাদা অনেকটা খাটো হয়ে গিয়েছিল। সাহসের অভাব বস্তুটা তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য এবং শ্রেষ্ঠ গুণ তাদের কাছে হল নির্ভীকতা, হাজার পাপও তাতে ঢাকা পড়ে যাবে। ক্রমে অবশ্য লোকে ব্যাপারটা ভুলে যায় এবং সিলভিও তার আগের প্রতিষ্ঠা আবার ফিরে পায়।

শুধু আমি কখনো ওরকম করে ভাবতে পারি নি। রোমাণ্টিক কল্পনার দিকে আমার স্বভাবতই একটা ঝোঁক আছে। লোকটার জীবন খানিকটা প্রহেলিকার মতো বলে ইতিপূর্বে আমি ছিলাম তার সবচেয়ে বড়ো ভক্ত — ভেবে রেখেছিলাম লোকটা নিশ্চয়ই কোনো রহস্যময় কাহিনীর নায়ক। তার দিক থেকেও আমার জন্যে একটা টান ছিল। অন্তত আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় তার যা অভ্যাস সেরকম ব্যঙ্গাত্মক ভাষা বিশেষ প্রয়োগ করত না, নানা বিষয়ে চমৎকার আলোচনা করত বেশ স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সেদিনকার ওই দুর্ভাগ্য সন্ধ্যাটার কথা আমি কিছুতেই

আর ভুলতে পারলাম না, লোকটা ইচ্ছে করেই তার মর্যাদা কলঙ্কমুক্ত করলে না এ কথা মনে থাকায় আমি তার কাছে আর কখনো স্বাভাবিক হতে পারি নি। তার চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা হত। সিলভিও এটা নজর করেছিল এবং তার কারণও আন্দাজ করেছিল, কেননা বোকা সে নয়, অভিজ্ঞতাও কম নয় তার। বোধ হয় এতে ওর কষ্ট হত। অন্তত একবার কি দুবার আমি বেশ টের পেয়েছিলাম সে কথা কইবার জন্যে উশখুশ করছে। কিন্তু সে সুযোগ আমি তাকে দিই নি। আমার অনিচ্ছা দেখে সিলভিও তারপর আর কিছু বলে নি। এবং তারপর থেকে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে একত্র হয়ে ছাড়া কখনো সিলভিওর সঙ্গে দেখা করি নি। আগে আমাদের দুজনের মধ্যে যে ধরনের অকপট আলাপ চলত তা বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রাম বা মফস্বল শহরের বাসিন্দাদের কাছে এমন কতকগুলি উত্তেজনার খোরাক আছে যা বড়ো-বড়ো নগরের শহুরে দুলালদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। যেমন ধরা যাক চিঠি বিলির দিনটার জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকা। মঙ্গলবার আর শুক্রবার — এই দুই দিন রেজিমেণ্টাল হেড-কোয়ার্টার ভরে যেত অফিসারে — কারো টাকা আসবে, কারো চিঠি, কারো বা সংবাদপত্র। চিঠি আসা মাত্র তৎক্ষণাৎ তা ওখানেই খুলে পড়া হত, খবরাখবর যা কিছু সব তক্ষুনি পরস্পরকে জানিয়ে দেওয়া হত। অফিস এলাকাটা ভরে উঠত বিপুল চঞ্চলতায়। সিলভিও এখানে প্রায়ই আসত কারণ তার ডাকও বিলি হত আমাদের রেজিমেণ্ট মারফত। সেদিন একটা চিঠি পাওয়া মাত্র অধৈর্যের মতো সে তার সীলটা ছিঁড়লে। চিঠিটা পড়তে পড়তে চোখদুটো তার জ্বলে উঠল। অফিসারেরা সবাই নিজের নিজের চিঠিতে ডুবে ছিল — কিছুই লক্ষ্য করে নি। হঠাৎ শোনা গেল সিলভিও চিৎকার করে বলছে, 'অফিসারমশাইরা শুনুন, অবস্থাগতিকে অবিলম্বে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে। তাই আজ শেষবারের মতো আমার ওখানে ডিনারে যেতে আপনারা যেন না করবেন না এই অনুরোধ।' আমার দিকে চেয়ে সে বললে, 'তোমাকেও আসতেই হবে কিন্তু।' এই বলে সে দ্রুত হেড-কোয়ার্টার ছেড়ে চলে গেল। আমরাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যে যার পথ ধরলাম।

যথাসময়ে সিলভিওর বাড়ি গিয়ে দেখা গেল প্রায় গোটা রেজিমেণ্টটাই এসে হাজির হয়েছে। তার জিনিসপত্র সব ইতিমধ্যেই বাঁধাছাঁদা সারা। নিঃসঙ্গ বুলেট-বেঁধা দেয়ালটা ছাড়া আর কিছুই পড়ে নেই। টেবিলে খেতে বসা গেল। গৃহস্বামীর মনে সেদিন ফূর্তি আর ধরছিল না। অতিথিদের মধ্যেও সে ফুর্তি সংক্রামিত হতে দেরি হল না। সশব্দে বোতলের ছিপি খোলা হতে লাগল অনবরত, ফেনিয়ে উঠল মদ, হিসহিস শব্দ উঠতে থাকল গেলাসে গেলাসে আর বিদায়ী বন্ধুটির জন্যে চরম সৌভাগ্য আর শুভযাত্রার কামনা জ্ঞাপনে আমরা বিরাম মানছিলাম না। টেবিল ছেড়ে যখন ওঠা গেল তখন বেশ রাত হয়েছে। যে যার টুপি নিয়ে বেরুবার সময় সিলভিও এক এক করে প্রত্যেকের কাছ থেকে বিদায় নিলে। আমি চলে যাচ্ছিলাম, সিলভিও হাত ধরে আমায় থামালে। মৃদুস্বরে সে বললে, 'তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।' আমি থেকে গেলাম।

অতিথিরা চলে গিয়েছিল। আছি শুধু আমরা দুজন। পরস্পরের মুখোমুখি বসে আমরা পাইপ ধরাতে লাগলাম নিঃশব্দে। সিলভিও কী যেন ভাবছিল — অল্প আগের দমকা ফুর্তির একটু ছিটেও যেন আর ওর মধ্যে নেই। থমথমে চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, মুখ থেকে কড়া ধোঁয়া বেরুচ্ছে — সব মিলিয়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন আস্ত একটা দানব। কয়েক মিনিট এইভাবে কাটার পর সিলভিও স্তব্ধতা ভেঙে বললে:

'বোধ হয় আমাদের আর কখনো সাক্ষাৎ হবে না। বিদায় নেবার আগে তোমার সঙ্গে একটু কথা কয়ে যেতে চাই। তুমি বুঝতে পারো অন্যে আমার সম্পর্কে কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে আমি থোড়াই কেয়ার করি। কিন্তু তোমাকে আমার ভালো লাগে। আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে তুমি থাকবে একথা ভেবে আমার কষ্ট হবে।'

একটু থেমে সিলভিও তার পাইপের খোল ভর্তি করতে শুরু করলে। কথা না বলে আমি চেয়ে রইলাম মাটির দিকে।

ও আবার বলতে লাগল, 'তোমার হয়ত আশ্চর্য ঠেকেছে, ঐ মাতাল লক্কা র...এর সঙ্গে কেন আমি লড়লাম না। এক্ষেত্রে হাতিয়ার বেছে নেবার অধিকার ছিল আমারই। সুতরাং নিশ্চয়ই মানবে যে লোকটার জান ছিল

আমারই হাতে। আমার নিজের জীবনের দিক থেকে ভয়ের বেশি কিছু ছিল না। তবু যে আমি নিজেকে সংযত করে নিয়েছিলাম সেটা আমার উদারতারই দরুন — এরকম একটা ধারণা তুমি অনায়াসে করতে পারতে। কিন্তু তোমায় ঠকাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আসলে, আমার জীবন মোটেই বিপন্ন হচ্ছে না এই যদি হত, তবে কখনোই আমি লোকটাকে ক্ষমা করতাম না।'

আমি অবাক হয়ে তাকালাম সিলভিওর দিকে। তার মুখে স্বীকারোক্তি শুনে আমি একেবারে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। সিলভিও বলে চলল:

'হাঁ, আমার জীবন বিপন্ন করার কোনো অধিকার আমার নেই। ছয় বছর আগে আমার মুখের ওপর একজন থাপ্পড় মেরেছিল। আর আমার সে শত্রু এখনো বেঁচে।'

আমার কৌতূহলের সীমা পরিসীমা ছিল না।

জিজ্ঞেস করলাম, 'লড়লে না তার সঙ্গে? ঘটনাচক্রে ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে হয়েছিল বুঝি?'

সিলভিও বললে, 'লড়েছিলাম বৈকি। আমাদের ডুয়েলের একটা স্মৃতিচিহ্নও আমার আছে।'

সিলিভও উঠে গিয়ে কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বার করলে একটা পাট করা লাল টুপি — তার সঙ্গে গিল্টি করা একটা ঝুঁটি লাগানো (ফরাসীরা যাকে বলে *bonnet de police*)** সেই রকম। সিলভিও টুপিটা মাথায় দিতেই দেখা গেল কপালের ইঞ্চিখানেক ওপরে তাতে বুলেটের একটা ছেঁদা।

সিলভিও বলে গেল, 'তুমি জানো, আমি একসময় ন... নম্বর ঘোড়সওয়ার দলে কাজ করতাম। আমার স্বভাব কি রকমের তাও তোমার জানা। সব কিছুতেই পয়লা নম্বরের — এই হল আমার অভ্যাস। আর জোয়ান বয়সে সেই-ই ছিল আমার একমাত্র ধ্যান। আমাদের কালে হৈ-হাঙ্গামা করতে পারাই ছিল ফ্যাশন। আর আমাদের বাহিনীতে আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেপরোয়া। মাতাল হতে পারা ছিল একটা গর্বের ব্যাপার।

** পুলিসী ফেজ। (ফরাসী)

কবি দেনিস দাভিদভ যাঁকে অমর করে গেছেন সেই বিখ্যাত বুর্তসোভের* চেয়েও আমি একবার আরো অনেক বেশি মদ টেনেছিলাম। আমাদের রেজিমেণ্টে ডুয়েল লড়া হত মিনিটে-মিনিটে, আর তাতে আমি লড়ছি না কিংবা দোসর লড়িয়ে হিসেবে দাঁড়াচ্ছি না — এমন ডুয়েল প্রায় খুঁজেই পাওয়া যেত না। সঙ্গীরা আমাকে প্রায় পুজো করতে শুরু করেছিল আর রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার যারা সব হরদম বদলী হয়ে আসত তাদের চোখে আমি ছিলাম একটা অপরিহার্য অভিশাপ বিশেষ।

'বেশ নিশ্চিন্তে (কিংবা তেমন নিশ্চিন্তে বোধ হয় নয়) আমি আমার নামডাক উপভোগ করছি এই সময় বড়োলোকের এক পোলা এসে আমাদের রেজিমেণ্টে ভর্তি হয়। লোকটা খুবই একটা নামজাদা বংশের ছেলে (তার নাম আমি বলব না)। এমন চোখ-ধাঁধানো একটা লোক আর ভাগ্যের এমন বরপুত্র আমি আর কোথাও দেখি নি! যৌবন, বুদ্ধি, রূপ, হুল্লোড়ে মেজাজ, অসম সাহস, নামজাদা বংশ আর অফুরন্ত টাকা — দুহাতে খরচ করেও যা বোধ হয় শেষ হবে না — এই সবকটি একত্রে কল্পনা করে দেখো, তা হলে বুঝবে আমাদের ওপর কি রকম প্রভাব সে ফেলেছিল। চ্যাম্পিয়ন হিসেবে যশ আমার গেল টলে। আমার নামডাক শুনে সে প্রথম দিকে আমার সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছিল। কিন্তু আমি গরজ না দেখাতে সেও এতটুকু আপশোস না করে ছাড়ান দেয়। লোকটার ওপর আমার একটা জাতক্রোধ জন্মে গিয়েছিল। রেজিমেণ্টে আর মহিলাদের কাছে ওর খাতির দেখে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। কি করে ওর সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধাই এই ছিল আমার চেষ্টা — কিন্তু আমি যেসব বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতাম ও তৎক্ষণাৎ পাল্টা জবাবে তা এমনভাবে কাটান দিত যে প্রত্যেকবারই আমার মনে হত ওর প্রত্যুক্তিগুলো সব আমার চেয়েও অনেক বেশি সতেজ, আর সরস মজাদার। আমার কথায় থাকত বিষ, ওর কথায় থাকত রহস্য। একদিন এক পোলিশ জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার একটা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার চলছিল। বলনাচের সময় দেখলাম, লোকটা যেন উপস্থিত সমস্ত মেয়েদের কাছেই, বিশেষ করে গৃহকর্ত্রীর একেবারে চোখের মণি হয়ে উঠেছে। ব্যাপার দেখে আমি লোকটার কানে কিছু অশ্লীল ইয়ার্কি ছাড়ি। ও লাল হয়ে উঠে ধাঁ করে আমার মুখের ওপর

একটা থাপ্পড় মেরে বসে। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই আমরা তরোয়ালের হাতল চেপে ধরলাম। মেয়েদের মধ্যে মূর্ছা যাওয়া শুরু হয়ে গেল। জোর করে আমাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হল। সেই রাত্রেই ডুয়েল লড়ব বলে আমরা চলে গেলাম।

'তখন ভোর হয় হয়। তিনজন দোসর সঙ্গে নিয়ে আমি যথাস্থানে গিয়ে দাঁড়ালাম। শত্রুর প্রতীক্ষা করতে গিয়ে আমার ধৈর্য আর বাঁধ মানছিল না। সময়টা ছিল বসন্তকাল। সূর্য উঠল আগেই। চারদিক বেশ গরম হয়ে উঠেছে। এমন সময় দূরে দেখা গেল ও হেঁটে আসছে। উর্দি চাপিয়েছে তরোয়ালের মাথায়। সঙ্গে একজন মাত্র দোসর। আমরা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। চেরি ফলে ভর্তি টুপিটা হাতে ধরে আসছে সে। দোসররা বারো পা জায়গা মেপে আমাদের তফাৎ করে দাঁড় করিয়ে দিলে। কানুন মাফিক আমারই আগে গুলি করার কথা। কিন্তু রাগে এমন বেসামাল বোধ হচ্ছিল নিজেকে যে ভয় হল হাত কেঁপে যাবে। তাই প্রথম গুলি করার পালা ওকেই ছেড়ে দিলাম। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজি হল না। ঠিক হল লটারি হবে। কপাল ওর চিরকালই সুপ্রসন্ন — লটারিতে প্রথম গুলির পালা পড়ল ওর ভাগ্যে। ও তাক করলে কিন্তু গুলি ফসকে লাগল আমার টুপিতে। এবার আমার পালা। এতদিন পরে এবার ওর জান আমার মুঠোয়। আমি ওর দিকে তীক্ষ্ন চোখে চাইলাম, দেখতে চাইছিলাম সেখানে এতটুকু কোনো উদ্বেগ ছায়া ফেলেছে কিনা... ও কিন্তু অনায়াসে আমার পিস্তলের লক্ষ্যের সামনে দাঁড়িয়ে টুপি থেকে বেছে বেছে পাকা চেরি ফলগুলো খেতে শুরু করল, বিচিগুলো ছুঁড়ে ফেলতে লাগল প্রায় আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ততদূর অবধি। ওর এই নিশ্চিন্ত ভাবটা আমায় ক্ষেপিয়ে তুললে। মনে হল লোকটা যখন তার জীবনটাকে মূল্যই দিচ্ছে না, তখন সে জীবন কেড়ে নিয়ে আমার লাভ কি? বীভৎস একটা চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। পিস্তল নামিয়ে বললাম, 'দেখছি তুমি ভারি ব্যস্ত। মরার কথা ভাবারও সময় নেই। তোমার প্রাতরাশের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে আমি চাই না।' ও বললে, 'একটুও না, তোমার জন্যে মোটেই আমার অসুবিধা হচ্ছে না। দয়া করে গুলি করেই ফেল না। তবে তোমার যা ইচ্ছে। একটা গুলি তোমার পাওনা

রইল — যখনই চাইবে, আমি রাজি।' আমি দোসরদের দিকে ফিরে বললাম, আপাতত গুলি করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ডুয়েল ওই অবস্থাতেই সেদিন শেষ হল।

'সৈন্যদল থেকে ইস্তফা দিয়ে আমি এসে বসলাম এই ছোটো শহরটায়। সেদিন থেকে প্রতিশোধ চিন্তা ছাড়া একটা দিনও আমার কাটে নি। এতদিনে আমার প্রতীক্ষা পূর্ণ হতে চলেছে...'

সিলভিও তার পকেট থেকে আজ সকালে আসা চিঠিটা বার করে আমায় দিলে। চিঠিতে মস্কো থেকে কে একজন (সম্ভবত তার উকিল) জানাচ্ছেন যে 'জনৈক ব্যক্তি' নাকি শিগগিরই এক সুন্দরী তরুণীর পাণিপীড়ন করবেন। সিলভিও বললে, 'আন্দাজ করতে পেরেই নিশ্চয়ই এই 'জনৈক ব্যক্তি'টি কে? আমি মস্কো চললাম। চেরি খেতে খেতে নির্বিকারভাবে ও সেদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে পেরেছিল। এবার দেখা যাবে বিয়ের মুহূর্তে তেমনি নির্বিকারভাবে সে মরতে পারে কি না।'

এই কথা বলে সিলভিও উঠে দাঁড়াল, টুপিটা ছুঁড়ে ফেললে মেঝের ওপর আর খাঁচায়-পোরা বাঘের মতো ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলে। পরস্পরবিরোধী আবেগের বিচিত্র আলোড়নে আলোড়িত হয়ে স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে আমি তাঁর কাহিনীটা শুনে গেলাম আগাগোড়া।

চাকর এসে খবর দিলে ঘোড়া তৈরি হয়ে গেছে। সিলভিও আমার হাত চেপে ধরল আবেগভরে। আমরা পরস্পরকে চুম্বন করলাম। সিলভিও গাড়িতে উঠল। দুটি মোট তাতে আগেই চাপানো হয়েছে — একটাতে সিলভিওর পিস্তলগুলো, অন্যটায় তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র। পরস্পরের কাছ থেকে আর একদফা আমরা বিদায় নিলাম। ঘোড়া ছুটল কদমে।

২

কয়েক বছর কেটে গেছে। সংসারের চাপে আমি ক... জেলার দীনদরিদ্র একটা গ্রামে ডেরা নিতে বাধ্য হয়েছি। সম্পত্তির দেখাশুনোয় জড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ত সেই আগেকার হৈ-হল্লা-ভরা চিন্তাহীন জীবনটার জন্যে। যে জিনিসটা এখানে আমার কিছুতেই সহ্য

হচ্ছিল না সে ওই শীত আর শরতের একান্ত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যাগুলো। ডিনারে খাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি যে করেই হোক, গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে কথা বলে, নয়ত কাজ তদারকের জন্যে মহালের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে, নয়তো নতুন চালু-করা কোনো খামার ইত্যাদি দেখে সময় কাটাতে পারতাম। কিন্তু সন্ধ্যে নামতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে নিজেকে নিয়ে কি করব ভেবে পেতাম না। বিভিন্ন দেরাজের তলা আর ভাঁড়ার হাতড়িয়ে যে ক'টি বই পেয়েছিলাম, তা ইতিমধ্যেই প্রায় মুখস্থ হয়ে এসেছিল। বাড়ির বৃদ্ধা দাসী কিরিলোভ্না তার ঝুলি উজাড় করে একই কাহিনী বার বার করে শুনিয়েছে। মেয়েদের যে সব গানের আসর বসত তা শুনে আমার মন শুধু বিষাদেই ভরে উঠত। হয়ত মদ খাওয়াই ধরতাম, কিন্তু তাতে মাথা ধরে উঠত প্রচণ্ড। তা ছাড়া, শুধু নিঃসঙ্গতার হতভাগ্যে মাতাল হয়ে ওঠার কথা ভাবতে গেলে আমার বেশ ভয় করত, এ কথা খোলাখুলি স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। বলতে গেলে এই রকমের লোকেরা হয় সবচেয়ে জঘন্য ধরনের মাতাল — আমাদের জেলায় এ রকম অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমার দেখা আছে। এই ধরনের জন দুই-তিন হতভাগাই ছিল আমার একমাত্র পড়শী। তাদের যা কিছু আলাপ সব হিক্কা আর দীর্ঘনিশ্বাসে ভরা। এ রকম সঙ্গীর চেয়ে নির্জনতা বরং সহনীয়।

চার ভার্স্ট দূরে ছিল কাউণ্টেস শ্রীমতী ব... এর ফলাও সম্পত্তি। কিন্তু সেখানে গোমস্তা ছাড়া আর কেউ থাকত না। কাউণ্টেস তাঁর জমিদারিতে এসেছিলেন শুধু একবার, বিয়ের প্রথম বছরে, কিন্তু মাসখানেকের বেশি থাকেন নি। কিন্তু আমার নির্জন বাসের দ্বিতীয় বসন্তকালে শোনা গেল কাউণ্টেস তাঁর স্বামীসহ গ্রীষ্মে জমিদারি দেখতে আসবেন বলে মনস্থ করেছেন। জুনের শুরুতে তাঁরা সত্যি সত্যি এলেন।

ধনী কোনো প্রতিবেশীর আগমন গ্রামবাসীদের জীবনে একটা মস্ত ঘটনা। জমিদারেরা আর তাদের বাড়ির লোকেরা এ ঘটনা নিয়ে দুমাস আগে থেকে কথা কইতে শুরু করে এবং পরবর্তী তিন বছর পর্যন্ত তার আলাপ চালিয়ে যায়। আমার নিজের কথাই যদি ধরি তরুণী এবং সুন্দরী এক প্রতিবেশিনী আসার খবরটা আমার ওপরেও বেশ জোর ছাপ

ফেলেছিল। মহিলাটিকে দেখার জন্যে আমার তর সইছিল না। ওঁরা আসার ঠিক পরের রবিবারেই আমি ডিনারের পর ওঁদের গ্রামখানার দিকে রওনা দিলাম — ইচ্ছে ছিল হুজুরের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী এবং বিনীত দাসানুদাস বলে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়াব।

চাপরাশি আমাকে নিয়ে কাউণ্টের পাঠকক্ষে বসিয়ে খবর দেবার জন্যে চলে গেল। প্রশস্ত ঘরখানা রাজার হালে সাজানো। দেয়ালের সঙ্গে বই-ভরা অনেক আলমারি। প্রত্যেকটা আলমারির ওপরে ব্রোঞ্জের এক-একটা আবক্ষ মূর্তি। শ্বেতপাথরে বাঁধানো অগ্নিকুণ্ডের ওপরে মস্ত একটা আরশি। সবুজ কার্পেটে মেঝে ঢাকা, তার ওপর গালিচা বিছানো। আমার গরিব ডেরায় বিলাসের কোনো অবকাশ ছিল না। অন্যের ঐশ্বর্য দেখাও আমার অনেক কাল বন্ধ। এর মধ্যে পড়ে তাই আমি খানিকটা জড়োসড়োর মতো স্নায়বিক উদ্বেগ নিয়ে কাউণ্টের দর্শনের অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক যেন মন্ত্রীর সাক্ষ্যাৎ প্রার্থনা করতে এসেছি কোনো গ্রাম্য আবেদনকারী। দরজা খুলে ভেতরে যিনি এলেন তাঁর বছর বত্রিশ বয়স। চেহারা অতি সুশ্রী। কাউণ্ট আমার দিকে যেন আন্তরিকতার সঙ্গে বন্ধুর মতো এগিয়ে এলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে আমার পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই নিজেই আমার নাম বললেন। দুজনে মিলে বসা গেল। কাউণ্ট কথাবার্তা কইতে লাগলেন খুব সহজ সুরে, সৌজন্যের সঙ্গে। দীর্ঘকাল ধরে নিঃসঙ্গভাবে কাটাবার ফলে আমার মধ্যে যে সঙ্কোচ এসে জমেছিল এতে তা শিগ্‌গিরই কেটে গেল। বেশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে শুরু করেছি এমন সময় হঠাৎ কাউণ্টেস এলেন। সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও আরো বেশি বিব্রত লাগল নিজেকে। ভদ্রমহিলা সত্যিই এক রমণীয় সৃষ্টি। কাউণ্ট আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি সহজ হবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যতই স্বচ্ছন্দ হতে যাই ততই যেন ভেতর ভেতর বিব্রত হয়ে উঠতে থাকি। আমি যাতে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পাই এবং অপরিচিতদের সাহচর্যটুক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে সে জন্যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে কথা শুরু করলেন, ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হলে লোকে যা করে, তেমনিভাবে বিশেষ কোনো সৌজন্যের আতিশয্য না দেখিয়ে। ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক পায়চারি করতে করতে বইপত্তর, ছবি-টবি দেখে বেড়াতে লাগলাম। ছবি সম্পর্কে

আমার জ্ঞান সামান্যই, তবু আমার চোখ গিয়ে পড়ল একটার দিকে। ছবিটা ছিল সুইজারল্যান্ডের একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য — কিন্তু আমি আকৃষ্ট হয়েছিলাম ছবিটার জন্যে তত নয়, ছবির মধ্যে একই জায়গায় দুটি বুলেটের গর্ত হয়ে আছে বলে।

'খুব পাকা নিশানা,' আমি বললাম কাউন্টের দিকে চেয়ে।

কাউন্ট বললেন, 'হ্যাঁ, চমৎকার নিশানা। আপনিও কি ভালো গুলি করতে পারেন?'

বললাম, 'পয়লা নম্বরের।' আলাপ-আলোচনাটা যে অবশেষে আমার অতিপ্রিয় একটা বিষয়ে এসে পড়েছে এতে খুশি হয়ে উঠেছিলাম, 'তিরিশ পা দূর থেকে গুলি করলেও কোনো তাস আমার হাত ফসকাবে না — অবশ্য যে সব পিস্তলে আমার অভ্যেস, তাই দিয়ে।'

'সত্যি?' ভয়ানক মনোযোগের ভাব নিয়ে কাউন্টেস জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমিও তিরিশ পা দূরে তাস গুলি করতে পারো নাকি গো?'

কাউন্ট বললেন, 'একদিন চেষ্টা করে দেখা যাবে। বয়সকালে আমিও নেহাৎ খারাপ নিশানী ছিলাম না, কিন্তু এ চার বছরে আমি একবারও পিস্তল হাতে করি নি।'

আমি বললাম, 'ওহ্, তা হলে আমি বাজি রেখে বলতে পারি, হুজুর এখন কুড়ি পা দূরের তাসকেও গুলি করতে পারবেন না — পিস্তল চালাতে হলে দৈনিক তালিম দিয়ে যেতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এটা দেখেছি। আমাদের রেজিমেন্টের সেরা নিশানীদের একজন বলে আমার নাম ছিল। কিন্তু একবার গোটা একটা মাস আমাকে কাটাতে হয় পিস্তল না ছুঁয়ে। আমারটা মেরামত হচ্ছিল। তারপর, জানেন হুজুর? আবার প্রথম গুলি চালাবার দিন পঁচিশ পা দূরের একটা বোতল মারতে গিয়ে চারবার ফসকালাম। আমাদের ক্যাপটেনের মুখ ছিল খুব তুখোড়, রসিকতাও করত খুব। সে বললে, 'বোতল মারা তোমার সইবে না বন্ধু, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছে।' আজ্ঞে না, দৈনিক অভ্যাসের ব্যাপারটা অবহেলা করা উচিত নয়, নইলে শিগ্‌গিরই দেখবেন আপনি সব ভুলে গেছেন। সবচেয়ে ভালো নিশানী বলে আমি যাকে জানতাম, সে প্রতিদিন অভ্যেস করত. ডিনারের আগে অন্তত তিনবার করে সে গুলি ছুঁড়ত। ব্যাপারটা

তার কাছে ছিল যেন ডিনারের আগে এক গ্লাস ভদ্‌কা খাওয়ার মতো একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার।'

কথা কওয়ার মতো বিষয় পেয়েছি দেখে কাউন্ট আর কাউণ্টেস খুশি হয়ে উঠলেন।

কাউন্ট বললেন, 'আচ্ছা, গুলি ছুড়ত কেমন?'

'শুনবেন? তা হলে বলি। কখনো হয়ত দেখা গেল দেয়ালের ওপর একটা মাছি এসে বসেছে—কাউণ্টেস, আপনি হাসছেন কিন্তু দিব্যি দিয়ে বলতে পারি সব সত্যি — যাই হোক, দেখা গেল দেয়ালে একটা মাছি বসেছে, অমনি সে চিৎকার করে উঠত, 'কুজকা, আমার পিস্তল!' কুজকাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি-ভর্তি পিস্তল নিয়ে এসে হাজির। বাস্, অমনি গুম্, দেখা গেল মাছিটা একেবারে দেয়ালের সঙ্গে চেপটে গিয়েছে।'

'সাবাস!' কাউন্ট তারিফ করে উঠলেন, 'কী নাম লোকটার?'

'আজ্ঞে লোকটার নাম সিলভিও।'

'সিলভিও?' কাউন্ট লাফিয়ে উঠলেন চেঁচিয়ে, 'আপনি কি সিলভিওকে চিনতেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে ওর বেজায় বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের রেজিমেণ্টের সকলে তাকে দেখত ঘরের লোকের মতো। কিন্তু সে আজ প্রায় বছর পাঁচেক হল, লোকটার কোনো খবর জানি না। তা হলে, হুজুরও তাকে চিনতেন?'

'হ্যাঁ চিনতাম, খুব ভালো করেই চিনতাম। সে কি কখনো আপনাকে বলে নি... কিন্তু না বলাই সম্ভব... সে কি তার জীবনের খুব অদ্ভুত একটা ঘটনার কথা বলেছিল কখনো?'

'সেই একটা জোয়ান চালবাজ তার মুখে যে থাপ্পড় মেরেছিল, আপনি কি তার কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'সেই লোকটার নামটা সে কখনো বলে নি?'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে না, সে তা বলে নি।' কিন্তু তারপরেই হঠাৎ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, 'ওহ্-হো,' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'মাপ করবেন, আমার খেয়ালই হয় নি... সে কি আপনিই?'

'আমিই,' কাউন্ট বললেন, মুখটা তাঁর তখন ভারি বিমর্ষ হয়ে গিয়েছে।

'আর ঐ বুলেট-বেঁধা ছবিটা হল আমাদের শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি চিহ্ন...'

কাউণ্টেস বলে উঠলেন , 'মাগো! না বাপু, ও নিয়ে আর আলাপ তুলো না, তোমায় মিনতি করে বলছি। জানোই তো ঘটনাটার কথা শুনলে আমার বড়ো ভয় করে...'

কাউন্ট বললেন, 'হুঁ — কিন্তু আমি বলব, সবটা বলব। উনি এইটুকু জানেন যে আমি কেমন করে তাঁর বন্ধুকে অপমান করেছিলাম। সিলভিও কেমন করে তাঁর প্রতিশোধ নিল, সেটাও উনি শুনে রাখুন।'

কাউন্ট একটা আরাম-কেদারা টেনে আনলেন আমার জন্যে। দারুণ কৌতূহল নিয়ে আমি শুনে গেলাম।

'আমার বিয়ে হয় পাঁচ বছর আগে। The honey-moon-এর প্রথম মাসটা আমার এই গ্রামে কাটে। এই বাড়িতেই আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো আমি পেয়েছি আর পেয়েছি আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের একটি মুহূর্ত।

'একদিন সন্ধ্যায় আমরা দুজনে একসঙ্গে ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছি। আমার স্ত্রীর ঘোড়াটা ছটফট করতে শুরু করেছিল। উনি ভয় পেয়ে আমার হাতে লাগাম দিয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে থাকেন। ঘোড়ায় চেপে আমি চলে যাই আগে আগে। এসে দেখি বাড়ির আঙিনায় একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম, পাঠকক্ষে কে একজন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। লোকটা তার নাম বলে নি, শুধু বলেছে আমার সঙ্গে নাকি তার কাজ আছে। এই ঘরটায় ঢুকে দেখলাম সন্ধ্যার ছায়ায় একটা লোক অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক এইখানটায়। লোকটার সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা, দাড়ি গোঁফ কামানো হয় নি। আমি তার কাছে যেতে যেতে মনে করার চেষ্টা করছিলাম কে হতে পারে। 'চিনতে পারছ না কাউন্ট?' লোকটা বললে কাঁপা কাঁপা গলায়। 'সিলভিও!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম এবং সত্যি কথা বলতে কি, টের পেলাম মাথার চুল আমার খাড়া হয়ে উঠেছে। 'সিলভিওই বটে ; এইবার আমার গুলি করার পালা। পিস্তল খালি করার জন্যে আমি এসেছি, তুমি তৈরি?' ওর বুক পকেট থেকে একটা পিস্তল বেরিয়ে ছিল খানিকটা। আমি বারো পা জায়গা মেপে গিয়ে দাঁড়ালাম ওই কোণটায়। বললাম একটু তাড়াতাড়ি করতে — আমার স্ত্রী

আসার আগেই যেন গুলি হয়ে যায়। ও দেরি করতে লাগল। আলো চাইলে। মোমবাতি নিয়ে আসা হল। আমি দরজায় কুলুপ দিয়ে হুকুম দিলাম কাউকে যেন ভেতরে আসতে দেওয়া না হয়। তারপর আবার অনুরোধ করলাম, 'তাড়াতাড়ি গুলি করো।' ও পিস্তলটা বার করে নিশানা করতে লাগল। এক-একটা সেকেন্ড আমি গুণে চলেছি... ভাবছি শুধু আমার স্ত্রীর কথা... পুরো এক মিনিট ধরে চলল এই ভয়ঙ্কর উদ্বেগের অবস্থা। হঠাৎ সিলভিও তার হাত নামিয়ে নিলে, বললে, 'দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে আমার পিস্তল ঠিক চেরির বিচি দিয়ে ভর্তি করা হয় নি। বুলেটগুলো অনেক কড়া চিজ। কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ঠিক ডুয়েল হচ্ছে না, হচ্ছে হত্যা। নিরস্ত্র লোকের দিকে পিস্তল তাক করা আমার ধাতস্থ নয়। সবটাই আবার নতুন করে শুরু করা যাক, কে প্রথম গুলি করবে সেটা লটারি করা হোক।' আমার মাথা ঘুরতে শুরু করেছে... যতদূর মনে পড়ে আমি সায় দিই নি... শেষ পর্যন্ত আর একটা পিস্তল গুলি-ভর্তি করা হল, লটারির জন্যে দুটো কাগজ ভাঁজ করে রাখা হল ওর সেই টুপিটার মধ্যে যেটাতে আমার গুলি গিয়ে বিঁধেছিল। এবং এবারেও ভাগ্যমন্ত কাগজখানা আমারই কপালে পড়ল। 'শয়তানের কপাল তোমার কাউণ্ট,' লোকটা এমন একটা হাসি হেসে বললে যা আমি কখনো ভুলব না। আমায় কী যে পেয়ে বসেছিল, আমাকে দিয়ে গুলি করিয়ে নিতে ও কেমন করেই বা পারলে, জানি না... কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুলি আমি করলাম, আর ঐ ছবিটাতে গিয়ে সে গুলি লাগল।' (বুলেট-বেঁধা ছবিটার দিকে কাউণ্ট দেখালেন। কাউণ্টের গালদুটো উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। কাউণ্টেসের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তাঁর গায়ের শালের চেয়েও বেশি। আমার মুখ দিয়েও একটা অস্ফুট ধ্বনি বেরিয়ে এল।)

কাউণ্ট বলে চললেন, 'আমি গুলি করলাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, গুলিটা ফসকে গেল। তারপর সিলভিও... (সেই মুহূর্তে তার চেহারা হয়ে উঠেছে ভয়ঙ্কর) সিলভিও নিশানা করতে শুরু করল আমার দিকে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ছুটে এসে মাশা চিৎকার করতে করতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। মাশাকে দেখেই বোধ হয় বিচারবুদ্ধি ফিরে পেলাম। বললাম, 'দেখছ না আমরা রহস্য করছি যে গো? এ কী চেহারা হয়েছে তোমার!

যাও, এক গ্লাস জল খেয়ে ফিরে এসো। আমার পুরনো বন্ধু আর সঙ্গীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।' মাশা আমার কথায় ভরসা করতে পারছিল না। দুর্ধর্ষ সিলভিওর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনি বলুন আমার স্বামী যা বলছেন তা কি ঠিক? এ কি সত্যি যে আপনারা দুজনে শুধু রহস্যই করছেন?' সিলভিও বললে, 'উনি সব সময়েই রহস্য করেন কাউণ্টেস। এক সময় আমার মুখে তিনি একটা থাপ্পড় কষেছিলেন নেহাৎ রহস্য করে, আমার টুপির মধ্যে দিয়ে গুলি চালিয়েছিলেন, তাও রহস্য করে এবং এই মাত্র তাঁর নিশানা ফসকে গেল সেও রহস্য করেই। এবার আমারও একটু রহস্য করার ইচ্ছে হয়েছে...' এই কথা বলে সে আমার স্ত্রীর সামনেই আমার দিকে নিশানা করতে শুরু করলে! মাশা গিয়ে ওর পা জড়িয়ে ধরল। উন্মাদের মতো আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছি ছি মাশা, উঠে এসো! আর আপনি — একজন হতভাগ্য মহিলার প্রতি উপহাস করা আপনি বন্ধ করবেন কি? আপনি গুলি করতে চান, কি চান না?' 'চাই না,' সিলভিও জবাব দিলে, 'আমি তৃপ্তি পেয়েছি। তোমার চোখে উদ্বেগ দেখতে চেয়েছিলাম — আতঙ্ক দেখতে চেয়েছিলাম, দেখলাম। তোমাকে দিয়ে ফের আমার দিকে গুলি ছুঁড়ত বাধ্য করলাম। আর কিছু আমি চাই না। এরপর আমার কথা তুমি আর কখনো ভুলতে পারবে না। এবার তোমার ধর্ম তোমার কাছে।' এই কথা বলে সে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে ফিরে তাকালে এবং প্রায় কোন রকম নিশানা না করেই একটা গুলি করে অন্তর্ধান করলে। আমার স্ত্রী মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। চাকর বাকরদের কারো সাহস হয় নি ওকে আটকে রাখতে। ফ্যালফ্যাল করে ওরা শুধু চেয়েছিল লোকটার দিকে। সিলভিও বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোচোয়ানকে হাঁক দিল এবং কি হল তা বুঝে ওঠার আগেই সে চলে গেল।'

কাউণ্ট আর কিছু বললেন না। যে গল্পের শুরুটা একদিন আমায় অমন আলোড়িত করেছিল তার শেষটা এইভাবেই আবিষ্কার করা গেল। এ গল্পের নায়কের সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হয় নি। শোনা যায় সিলভিও নাকি আলেক্সান্দর ইপ্‌সিলান্তি* বিদ্রোহের মধ্যে একটা বাহিনীর নেতৃত্ব করে এবং স্কুলিয়ানির যুদ্ধে মারা যায়।

তুষার-ঝঞ্ঝা

বন্দুর পথ দিয়ে ঘোড়া দৌড়ায়,
তুষারের স্তূপ তারা ক্ষুরেতে মাড়ায়...
হেথা হ'তে অদূরেতে দেখা যায় নাকি
উপাসনা মন্দির দাঁড়িয়ে একাকী।

. . . .

সহসা ঘনিয়ে এল বরফের ঝড়,
নেমে এল তুষারের খই ঝাঁকে ঝাঁক,
ডানার ঝাপট মেরে কালো দাঁড়কাক,
নেমে আসে ধাবমান স্লেজের উপর।
ডাকে তার অমঙ্গল ভনে চরাচর!
ছুটন্ত ঘোড়ারা যেন চমকিয়ে চায়
আতংকে খাড়া হয়ে উঠেছে কেশর
বিষণ্ণ সুদূরে তারা সভয়ে তাকায়।

জুকোভ্স্কি।*

আমাদের ইতিহাসে যে সর্বাদন ভোলার নয়, সেই সময়, ১৮১১ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে নেনারাদভোর জমিদারি মহালে বাস করতেন মাননীয় গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ 'র'। আতিথ্য ও দাক্ষিণ্যের জন্যে সারা জেলার লোক তাঁকে চিনত। বাড়িতে তাঁর পাড়াপড়শীদের আগমনের বিরাম ছিল না। কেউ আসত পানাহার করতে আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পাঁচ কোপেক বাজির 'বোস্টন' খেলতে, আবার কেউ কেউ আসত তাঁর মেয়ে মারিয়া গাভ্রিলভ্নার দর্শন পাবার জন্যে। মেয়েটির বয়স ছিল সতেরো, দেখতে তন্বী, মুখের রঙ ফ্যাকাশে ধরনের। ধনী পাত্রী হিসেবে মেয়েটির সুনাম রটেছিল এবং নিজের জন্যে, নয়ত নিজের ছেলের জন্যে, মেয়েটিকে বৌ করে ঘরে তোলার আশা ছিল অনেকেরই।

আত্মপ্রতিকৃতি। কালিতে। ১৮২৯

পিওতর ভিয়াজেম্‌স্কি (১৭৯২-১৮৭৮) — রুশ কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক। জীবনের শেষ দিকে বিশিষ্ট জার রাজপুরুষ। বিশের দশকে পুশকিনকে এবং তাঁকে ঘিরে ছিল ঘনিষ্ঠ এক প্রগতিশীল সাহিত্যিক-গোষ্ঠী।

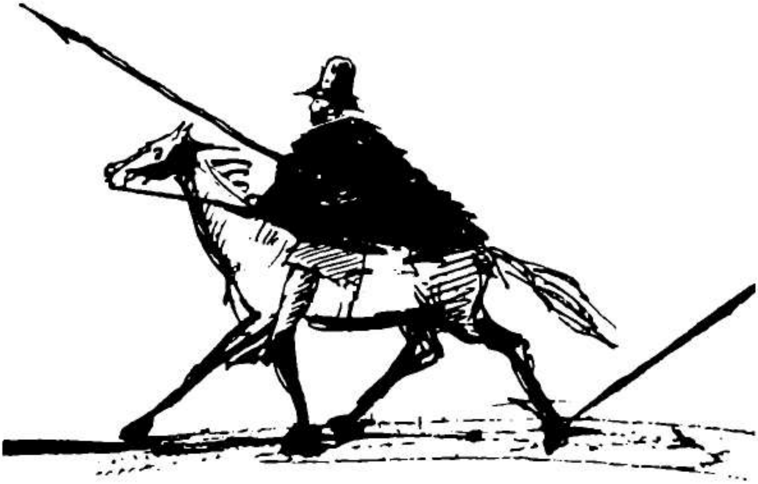

আত্মপ্রতিকৃতি। কালিতে। ১৮২৯ — পুশকিন নিজেকে এ'কেছেন বর্শা হাতে ঝাকড়া-লোমা কসাক কুর্তায় ঘোড়ার পিঠে। ছবির পেছনে আছে ১৮২৯ সালের ১৪ই জুনের একটি ঘটনা: ককেশাস ভ্রমণকালে পুশকিন তখন একটি সামরিক সংঘর্ষে যোগ দিয়েছিলেন।

ইয়েকাতেরিনা উশাকোভা (১৮০৯-১৮৭২) — মস্কোর আলোকপ্রাপ্ত অভিজাত উশাকোভদের বড়ো মেয়ে। ১৮২০-এর দশকে পুশকিন প্রায়ই ও'দের ওখানে সাদর আতিথ্য লাভ করেছেন।

আন্না ওলেনিনা (১৮০৮-১৮৮৮) — শিল্প আকাদমির সভাপতি আলেক্সেই ওলেনিনের কন্যা। তাঁর প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল পুশকিনের, বিয়ে করতে চান, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হন। ড্রইঙ। ১৮৩৩

মেয়েটি বেড়ে উঠেছিল ফরাসী উপন্যাস পড়ে, সুতরাং প্রেমে তাকে পড়তেই হল। যাকে সে পছন্দ করলে সে কিন্তু একজন দরিদ্র নিম্নতন অফিসার, ছুটি কাটাতে এসেছিল তার পিতৃপুরুষের ভিটেয়। যুবকটিও যে ঐ একই জ্বালায় জ্বলে মরছিল তা না বললেও চলে। এবং না বললেও চলে যে ওদের পরস্পর আকর্ষণ লক্ষ্য করে মেয়েটির মা-বাপ নিষেধ করে দিলে যেন মেয়েটি ওর কথা চিন্তা করা ছাড়ে এবং নিজেরা এমন হাঁড়ির মতো মুখ করে ছেলেটির সঙ্গে ব্যবহার করতে লাগল যেন ও একজন অবসর-প্রাপ্ত ছোটো চাকুরে।

ফলে আমাদের প্রেমিক যুগল পত্রালাপের পথ নিলে আর প্রত্যেকদিন তাদের দেখা হতে লাগল পাইন কুঞ্জের নির্জনতায়, নয়ত প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র গির্জার নিকটে। সেখানে তারা চিরন্তন প্রেমের শপথ নিত। নিজেদের পোড়া কপাল নিয়ে আক্ষেপ করত, আর চেষ্টা করত হরেক রকমের সব ফন্দি বার করতে। ইত্যাকার চিঠিপত্র আর আলাপ-আলোচনার পরিণতিস্বরূপ অবশেষে তারা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল (যা স্বাভাবিক): যেহেতু আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারব না এবং নির্দয় মা-বাপ আমাদের সুখের পথে কাঁটা দিচ্ছে, সেই হেতু মা-বাপের মতামতের তোয়াক্কা না করলেই তো হয়? সহজেই আন্দাজ করা যায় যে এই চমৎকার সমাধানটি সর্বপ্রথম উদিত হবে তরুণটির মনে, এবং মারিয়া গাভ্রিলভ্নার রোমাণ্টিক কল্পনা তাতে সাতিশয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

শীত এসে পড়ায় তাদের দেখাশোনা বন্ধ হল বটে কিন্তু পত্রালাপে হয়ে উঠল আরো সজীব। ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচ তার প্রত্যেকটা চিঠিতে প্রিয়তমাকে অনুনয় করতে লাগল, এসো, আমার হও, গোপনে বিয়ে করে কিছুদিন লুকিয়ে থাকা যাব, পরে গিয়ে বাপ-মায়ের পা জড়িয়ে ধরব। প্রেমিক যুগলের নির্ভীক প্রেম এবং তার জন্যে এই দুঃখবরণ দেখে ওঁদের মন নরম না হয়ে পারে না, নিশ্চয়ই ওঁরা ডাক দিয়ে বলবেন, 'আয় বাছারা, আমাদের কোলে ফিরে আয়!'

মারিয়া গাভ্রিলভ্নার মন ঠিক করতে অনেক সময় লাগল। পালিয়ে যাবার অসংখ্য পরিকল্পনা সে এক এক করে বাতিল করলে। অবশেষে একদিন সে মত দিল: ঠিক হল একদিন সে রাতের খাবার টেবিলে না

বসে মাথা ধরেছে বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঠাঁই নেবে। মেয়েটির ঝিকে এর মধ্যে টানতে হবে। ওরা দুজন তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে চলে যাবে বাগানের মধ্যে। তার পিছনে একটা স্লেজ দাঁড়িয়ে থাকবে। তাতে চেপে নেনারাদেভো থেকে পাঁচ ভার্স্ট দূরে যেতে হবে জাদ্রিনো গ্রামে এবং সোজা গিয়ে ঢুকবে গির্জায়। ভ্লাদিমির সেখানে ওদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে।

যেদিন পালাবার কথা, তার আগের দিন মারিয়া গাভ্রিলভ্না সারা রাত একটুও ঘুমোতে পারলে না। আলমারি নেড়ে চেড়ে পোশাকের একটা পোঁটলা বানাল সে, তারপর কথা গেঁথে গেঁথে দুটি সুদীর্ঘ চিঠি লিখলে, একটি তার ভাবপ্রবণ এক সখির কাছে, আর একটি মা-বাপের কাছে। তাতে অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় বিদায় চেয়ে বলা হল তার কাজের পেছনে রয়েছে হৃদয়াবেগের অপরাজেয় তাগিদ এবং চিঠি শেষ করা হল এই বলে যে আবার যেদিন সে তার মা-বাপের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াতে পারবে, সেইটেই হবে তার সবচেয়ে সুখের দিন। চিঠি দুটিকে আঁটল একটি সীল দিয়ে — তাতে শোভন একটি শ্লোকের ওপর উত্তপ্ত দুটি হৃদয়ের নক্‌শা আঁকা। অবশেষে ঠিক ভোরের আগে বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। যেটুকু তন্দ্রা এল, ভয়ানক ভয়ানক সব স্বপ্ন দেখায় তাও ভেঙে যেতে লাগল মিনিটে মিনিটে। একবার সে স্বপ্ন দেখলে যেন গির্জায় যাবার জন্যে স্লেজে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় বাবা এসে পথ আটকালেন আর বরফের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এক অতল অন্ধকূপের মধ্যে... মারিয়া গাভ্রিলভ্না সবেগে নিচে পড়ে যাচ্ছে, দম তার একেবারে বন্ধ হয় আর কি। আর একবার সে দেখলে ভ্লাদিমির যেন ঘাসের ওপর শুয়ে আছে — মুখ বিবর্ণ, সারা শরীর তার রক্তমাখা। মরতে মরতে তীক্ষ্ন গলায় দমকে দমকে অনুরোধ করে সে বলছে বিয়েটা তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে... ভয়াবহ বিশৃংখল নানা মূর্তি তার মনের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে যখন সে উঠলে, তখন সত্যি করেই তার মাথা ধরে উঠেছে, মুখের রঙ হয়েছে আরো ফ্যাকাশে। মেয়ের এই উদ্বিগ্ন মূর্তি দেখে মারিয়া গাভ্রিলভ্নার মা-বাপের সস্নেহ উদ্বেগ আর প্রশ্নের বিরাম ছিল না: 'কী হয়েছে মাশা, অসুখ করেছে নাকি মাশা?' আর তাতে মারিয়া গাভ্রিলভ্নার যেন বুক

ভেঙে যেতে লাগল। ওঁদের শান্ত করতে গিয়ে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না হাসিখুশি দেখাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পেরে উঠল না। সন্ধ্যা হল। বাপের বাড়িতে এই তার শেষদিন একথা ভেবে বুক টনটনিয়ে উঠল মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার। দম তার বন্ধ হয়ে আসতে লাগল বারবার। আশেপাশের এতদিনকার পরিচিত যত জিনিসপত্র, লোকজন, সবার কাছ থেকে সে বিদায় নিলে মনে মনে, গোপনে গোপনে।

রাতের খাবার দেওয়া হল। বুক তার ঢিপঢিপ করে উঠল সজোরে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললে রাতে সে খাবে না, বাপ-মায়ের কাছে বিদায় নিল। ওঁরা রোজকারের মতো মেয়েকে চুমু দিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার চোখের জল আর বাধা মানতে চাইছিল না। নিজের ঘরে কোনো রকমে একবার ঢুকতে পেয়ে আরাম কেদারাটার ওপর সে লুটিয়ে পড়ল কান্নায়। মন চাঙ্গা করতে বলে দাসীটি তাকে প্রবোধ দিতে লাগল। সব কিছুই তৈরি। আর আধ ঘণ্টা পরে মাশা তার বাপের বাড়ি, তার নিজের ঘরখানা, তার শান্ত কুমারী জীবনের কাছ থেকে বিদায় নেবে চিরকালের মতো... বাইরে তখন শুরু হয়েছে একটা তুষার-ঝঞ্ঝা। ঝড় উঠছে গোঁ গোঁ করে। জানলা দরজার খড়খড়িগুলো খটখটিয়ে নড়ছে। মাশার কাছে এ সব কিছুই মনে হচ্ছিল যেন কীসের একটা শাসানি — কিছু একটা শোকার্ত সঙ্কেত। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়িটা ঘুমিয়ে পড়ল। মাশা তার কাঁধের ওপর একটা শাল জড়ালে, গায়ে চাপালে গরম একটা পোশাক, তারপর গয়নার হাত-বাক্সটি নিয়ে বেরিয়ে এল খিড়কির দরজা দিয়ে, দুটি পুঁটলি হাতে করে তার ঝিও এল সঙ্গে সঙ্গে। ওরা যখন বাগানে গিয়ে পৌঁছুল, তখনো তুষার-ঝঞ্ঝা একটুও কমে নি। যেন এই তরুণী অপরাধিনীকে নিরস্ত করবার জন্যেই মুখের ওপর এসে ঝাপটা মারছে হাওয়া। বাগানের কিনার পর্যন্ত যেতেই ওদের হয়ে এল। রাস্তায় স্লেজটা দাঁড়িয়ে আছে। হিমে জমতে জমতে ঘোড়াগুলো আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। অস্থির জানোয়ারগুলোকে বাগ মানাবার জন্যে ভ্লাদিমিরের কোচোয়ানকে গাড়ির ডাণ্ডাটার সামনে কেবল পায়চারি করতে হচ্ছিল এদিক-ওদিক। দাসী সমেত তরুণীটিকে সে এনে বসালে তার গাড়ির ভেতরে, গয়নার বাক্স আর পোঁটলাগুলো স্লেজের ওপর তুলে

দিয়ে সে বসল লাগাম নিয়ে। সোৎসাহে কদম বাড়াল ঘোড়াগুলো। এবার কপাল আর কোচোয়ান তেরেশ্‌কার হাতযশের ওপর মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক আমাদের নবীন প্রেমিকটি কী করছেন।

সেদিন সারা বেলা শুধু এখান থেকে ওখানে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়িয়েছে ভ্লাদিমির। সকালে সে গিয়েছিল জাদ্রিনোর পুরোহিতের কাছে — তার সম্মতি পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তারপর সে গেল আশেপাশের জমিদারদের মধ্যে থেকে সাক্ষী জোগাড় করতে। প্রথমে যাঁর কাছে সে গেল তাঁর নাম দ্রাভিন, বছর চল্লিশ বয়সের সর্বনিম্নপদস্থ একজন অবসর-নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসার। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলেন এবং বললেন ব্যাপারটা দেখে তাঁর সে আমলের কথা আর ঘোড়সওয়ারীদের নানা রগড়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। ভ্লাদিমিরকে ভরসা দিয়ে তিনি তাকে জোর করে আটকে রাখলেন দুপুরের খাওয়ার জন্যে। বললেন, বাকি দুজন সাক্ষী জোগাড় করতে কোনো অসুবিধাই হবে না। আর, বলতে কি দুপুরের খাওয়ার পর এসে হাজিরও হয়ে গেলেন জমি জরীপের জনৈক কানুনগো স্মিট এবং তার সঙ্গে জেলা পুলিস অফিসারের এক ছেলে। স্মিটের বেশ বড়ো বড়ো মোচ, পায়ে ঘোড়সওয়ারী কাঁটা। ছেলেটার বয়স প্রায় বছর ষোলো, হালে সে উলানের একটা রেজিমেণ্টে ঢুকেছে। ওরা ভ্লাদিমিরের প্রস্তাবে রাজি তো হলই, উপরন্তু ঘোষণা পর্যন্ত করে বসল যে ভ্লাদিমিরের জন্যে তারা জান দিতেও প্রস্তুত। ভ্লাদিমির আবেগে কোলাকুলি করলে তারপর যোগাড়যন্ত্র করার জন্যে রওনা দিলে বাড়ির দিকে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল অনেকক্ষণ। বিশ্বাসী কোচোয়ান তেরেশ্‌কাকে যথাবিহিত উপদেশ দিয়ে সে তাকে ত্রয়কা* সমেত পাঠালে নেনারাদভোতে। তারপর নিজের জন্যে তার এক-ঘোড়ার স্লেজখানাকে জুততে বলে রওনা দিলে জাদ্রিনোর দিকে — আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই সেখানে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার এসে পড়ার কথা। রাস্তাটা ভ্লাদিমিরের পরিচিত, হাঁকিয়ে যেতে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় লাগা উচিত নয়।

গ্রাম ছেড়ে বাইরের খোলা এলাকায় পৌঁছানো মাত্র কিন্তু ঝড় উঠল। তুষার-ঝঞ্ঝা এমন ঘনঘটায় নামল যে চোখে কিছুই আর দেখা যাচ্ছিল না।

মিনিট খানেকের মধ্যেই সারা রাস্তা ঢেকে একাকার হয়ে গেল বরফে, আশেপাশের সব কিছু হারিয়ে গেল একটা তুহিন ঝিলিমিলির মধ্যে — মিটমিটে হলদেটে সেই কুজ্ঝটির মধ্যে শুধু পাক খেয়ে খেয়ে ঝরতে লাগল বরফের শাদা শাদা টুকরো। আকাশ মাটি সব কিছু হয়ে গেল একাকার। ভ্লাদিমির টের পেলে সে একটা মাঠের মাঝখানে গিয়ে পড়েছে। রাস্তাটায় ফিরে যাবার হাজার চেষ্টা করেও সে পারলে না। ঘোড়াটা যতই এগোয় ততই গিয়ে পড়ে এক অজানা রাজ্যের মধ্যে — কখনো ধাক্কা খায় কোনো তুষার-স্তূপের সঙ্গে, কখনো হুমড়ি খেয়ে পড়ে গর্তের মধ্যে। স্লেজখানা বারবার উলটে যাচ্ছিল। ভ্লাদিমিরের একমাত্র চেষ্টা ছিল কিছুতেই যাতে সে পথটা না হারায়। কিন্তু তার ধারণা মতো আধঘণ্টাখানেক সময় কেটে যাবার পরেও দেখা গেল যে জাদ্রিনো গ্রামের উপকণ্ঠের গুল্মবনটুকু পর্যন্ত সে পৌঁছতে পারে নি। আরো মিনিট দশেক কাটল, কিন্তু গুল্মবনের কোনো চিহ্নই নেই। খোলা একটা ডাঙ্গার ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে চলল ভ্লাদিমির, চারিদিকে তার গভীর সব নালা কাটা। তুষার-ঝঞ্ঝা তখনো কমে নি, আকাশ মেঘে ঢাকা। ঘোড়াটা কাহিল হয়ে পড়তে শুরু করেছে। বারবার কোমর পর্যন্ত বরফে ডুবে যেতে হলেও ভ্লাদিমির গলগল করে ঘামতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে ভ্লাদিমির টের পেলে সে এতক্ষণ ভুল দিকে গাড়ি হাঁকিয়েছে। ঘোড়ার লাগাম টেনে সে এবার চিন্তায় পড়ল। মনে মনে নানা রকম হিসেব করে অবশেষে তার মনে হল বোধ হয় তার ডান দিকে বাঁক নেওয়া উচিত ছিল। ডানদিকেই সে এবার মোড় নিলে। ঘোড়াটার নড়ার শক্তি আর প্রায় নেই। পথে কেটেছে প্রায় এক ঘণ্টা। সুতরাং জাদ্রিনো খুব দূর হওয়ার কথা নয়। অথচ গাড়ি সে হাঁকিয়েই চলল, ডাঙ্গাটার শেষ আর পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল তা শুধু মধ্যে মধ্যে বরফের স্তূপ আর নালা। স্লেজটা ক্রমাগত ওলটাতে লাগল, আর ক্রমাগত তাকে ঠিক করে নিতে হল। এদিকে সময় ফুরিয়ে আসছে — ভ্লাদিমিরের মন ভরে উঠল তীব্র উদ্বেগে।

শেষ পর্যন্ত এক কোণে কালো মতো কিছু একটা নজরে পড়ল। সেই দিকেই ঘোড়া হাঁকালে ভ্লাদিমির। কাছাকাছি এসে দেখলে একটা গুল্মবন।

ভাবলে ঈশ্বরের কৃপায় বোধ হয় সে এবার জাদ্রিনোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। বনটা পেরিয়ে গাড়ি হাঁকালে ভ্লাদিমির। বনটার ঠিক পরেই জাদ্রিনো। আশা ছিল হয় সে এবার তার চেনা রাস্তাটা পাবে, নয়ত বনটাকে বেড় দিয়ে তাকে খানিকটা যেতে হবে। রাস্তাটা পেতে দেরিও হল না। দুপাশে তার গাছ — শীতে ঝরে গেছে পাতা। এই গাছের সারির তলা দিয়েই অন্ধকারে হাঁকিয়ে চলল ভ্লাদিমির। হাওয়ার ঝাপটা এখানে আসতে পারছিল না। রাস্তাটাও বেশ পরিষ্কার। ঘোড়াটা নতুন জোর নিয়ে আবার ছুটল। আর এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ভ্লাদিমির।

কিন্তু গাড়ি চলল তো চললই — জাদ্রিনোর দেখা নেই, গুল্মবনটারও শেষ নেই যেন। সভয়ে সে টের পেলে যে একটা অচেনা জঙ্গলের মধ্যে সে এসে পড়েছে। হতাশ হয়ে সে চাবুক হাঁকাতে শুরু করল। বেচারা জানোয়ার চেষ্টা করলে কদমে ছুটতে, কিন্তু শিগ্গিরই নেতিয়ে পড়ল এবং হতভাগ্য ভ্লাদিমিরের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও হেঁটে চলার বেশি কিছুই তাকে দিয়ে করানো গেল না।

অবশেষে বনটা একসময় পাতলা হয়ে এল। ভ্লাদিমির সেখান থেকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু জাদ্রিনোর কোনো চিহ্নই নেই কোথাও। মনে হল সময়টা প্রায় দুপুর রাত। গাল বেয়ে তখন তার চোখের জল নামতে শুরু করেছে। এলোপাতাড়ি গাড়ি হাঁকাতে লাগল ভ্লাদিমির। ঝড় থেমে গেছে, মেঘও গেছে কেটে। সামনে পড়ে আছে শুধু একটা তরঙ্গায়িত শাদা বরফের গালিচায় ঢেকে যাওয়া সমতল প্রান্তর। রাতটা মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। অনতিদূরে ভ্লাদিমিরের চোখে পড়ল একটা বসতি — মাত্র গুটিকয় কুটিরের একটা ঝাঁক। ভ্লাদিমির এবার সেই দিকে স্লেজ হাঁকাল। প্রথম কুঁড়েটার কাছে পোঁছনো মাত্র সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল জানলার কাছে। জানলায় ধাক্কা দিতে খানিক বাদে কাঠের খড়খড়ি তুলে একটা বুড়ো তার প্যাকা দাড়িওয়ালা মুখটা বার করে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই?' 'বলতে পারো, জাদ্রিনো এখান থেকে কত দূর?' 'কী বললে, জাদ্রিনো কত দূরে?' 'হ্যাঁ, হ্যাঁ কত দূর?' 'খুব দূরে নয়, তবে প্রায় দশ ভার্স্ট।' উত্তর শুনে মাথার চুল ছিঁড়ে বজ্রাহতের মতো থমকে দাঁড়াল ভ্লাদিমির, যেন এইমাত্র সে তার ফাঁসির হুকুম শুনল।

'তা তুমি কোথা হতে আসছ গো?' বুড়ো লোকটা জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু জবাব দেবার মতো শক্তিও যেন আর ভ্লাদিমির খুঁজে পাচ্ছিল না। বললে, 'জাদ্রিনো যাবার জন্যে একটা ঘোড়া জোগাড় করে দিতে পারো বুড়ো?' চাষীটা বললে, 'আমাদের ঘোড়া থাকলে তো!' 'তা হলে অন্তত রাস্তাটা দেখিয়ে দেবার জন্যে কাউকে আমার সঙ্গে দিতে পারো? সে যা চাইবে দেবো।' খড়খড়ি বন্ধ করে বুড়ো বললে, 'খানিক দাঁড়ালে তা হলে আমার ব্যাটাই যাবে।' ভ্লাদিমির অপেক্ষা করতে লাগল কিন্তু মিনিট খানেক সময় কাটতে না কাটতেই আবার জানলায় ধাক্কা দিলে। খড়খড়ি তুলে দাড়িওয়ালা মুখটা আবার বেরিয়ে এল, 'কী চাই গো আবার?' 'কই, তোমার ব্যাটা কোথায়?' 'আসছে গো, বুট পরছে। হিম লাগছে তো ঘরে খানিক আগুন পুইয়ে লিন ক্যানে।' 'না, না, দরকার নেই — তোমার ব্যাটাকে একটু জলদি করতে বলো।'

অবশেষে দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। হাতে একটা লাঠি নিয়ে জোয়ানবয়সী একটা ছোঁড়া বেরিয়ে এল। আগে আগে চলল, কখনো পথ দেখিয়ে দিচ্ছিল, কখনো-বা প্রবল তুষার-পাতের নিচে ঢাকা-পড়া রাস্তাটা খুঁজে বার করার জন্যে ও থেমে পড়ছিল। ভ্লাদিমির জিজ্ঞেস করেছিল, 'কটা বেজেছে বলতে পারো?' জোয়ান ছোঁড়াটা জবাব দিয়েছিল, 'ক্যানে, আর খানিক বাদেই তো সব ফরসা হয়ে যাবে।' — তারপর আর একটা কথাও ভ্লাদিমির উচ্চারণ করে নি।

ওরা যখন জাদ্রিনো পেঁছিল তখন মোরগ ডাকছে, চারিদিক ফরসা হয়ে গেছে। দেখা গেল গির্জাটায় তালা দেওয়া। ভ্লাদিমির ছোঁড়াটার পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ছুটল পুরোহিতের বাড়ি। আঙিনায় তার ত্রয়কা গাড়িখানার কোনো চিহ্ন নেই। আর কী সংবাদই না তাকে শেষকালে শুনতে হল!

কিন্তু এবার নেনারাদভোর মাননীয় কর্তাদের কাছে ফেরা যাক এবং দেখা যাক সেখানে কী হচ্ছে।

কী আবার হচ্ছে, কিছুই না!

সকালে ঘুম ভেঙে কর্তাগিন্নি এসে বসলেন তাঁদের বৈঠকখানায়। গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচের গায়ে ফ্লানেলের কুর্তা, মাথায় নাইট ক্যাপ।

প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভ্‌না পরেছেন একটা বালাপোষের পোশাক। সামোভার নিয়ে আসা হল। মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না কেমন আছে, রাতে ঘুমিয়েছে কেমন জেনে আসার জন্যে গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ একটা চাকরানীকে খোঁজ নিতে পাঠালেন। সে ফিরে এসে জানাল দিদিমণির ঘুম ভালো হয় নি, কিন্তু এখন একটু ভালো বোধ করছেন, এখুনি বৈঠকখানায় আসছেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না প্রথা-মাফিক মা-বাপকে প্রীতি সম্ভাষণ জানালে।

গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ জিজ্ঞেস করলেন, 'মাথার যন্ত্রণাটা এখন কেমন, মাশা?' মাশা বললে, 'একটু ভালো, বাবা।' প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভ্‌না বললেন, 'ও নিশ্চয়ই হয়েছিল ঐ চুল্লীটার জন্যে।' মাশা উত্তরে বললে, 'বোধ হয় তাই হবে।'

সারা দিন আর কিছু ঘটল না, কিন্তু রাত্রে মাশার জ্বর এল। পাশের শহর থেকে একজন ডাক্তার ডাকতে পাঠানো হল। সে এসে পেঁছিল সন্ধ্যায় — রোগী তখন ভুল বকতে শুরু করেছে। অসুখটা বেশ ভারি রকমের হয়ে উঠেছিল। দুই সপ্তাহ ধরে হতভাগিনীকে নিয়ে টানাটানি চলল যমে-মানুষে।

মেয়েটি যে পালাবার মতলব করেছিল তা বাড়ির কেউ জানতে পারে নি। আগের দিন সন্ধ্যায় লেখা চিঠিপত্রগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। মাশার ঝিটিও কর্তার ক্ষেপে ওঠার ভয়ে কারো কাছে একটা কথাও ফাঁস করে নি। পুরোহিত, অবসর-নেওয়া ঘোড়সওয়ার অফিসারটি, মোচয়ালা কানুনগো আর তরুণ উলান কোনো কারণবশত চুপ করে ছিল। মাতাল অবস্থাতেও কোচোয়ান তেরেশ্‌কার মুখ ফসকে একটা ফালতু কথাও বেরোয় নি। সুতরাং ব্যাপারটা গোপন রইল কেবল গণ্ডা-দেড়েক চক্রীর কাছেই। কিন্তু মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না তার অশান্ত ভুল বকুনির মধ্যে নিজেই তা ফাঁস করে দিলে। তবে ভুল বকুনিটা এতই অস্পষ্ট রকমের যে মাশার মা বিশেষ কিছু বোঝেন নি। ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের রোগশয্যা ছেড়ে নড়তেন না। ভুল বকুনির মধ্যে থেকে তিনি শুধু এইটুকু টের পেলেন যে তাঁর মেয়ে ভ্লাদিমির নিকোলায়েভিচের প্রতি একান্ত অনুরক্তা এবং রোগটার উৎপত্তি সম্ভবত এই প্রেমের কারণেই। এ নিয়ে তিনি স্বামীর

সঙ্গে এবং কিছু পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গেও আলাপ করে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত সকলেই একমত হয়ে ঠিক করলেন, এ বোধ হয় বিধাতারই নির্বন্ধ। কপাল কেই বা খণ্ডাতে পারে? তা ছাড়া গরিব হওয়া তো আর অপরাধ নয়। মেয়ে তো আর টাকার থলির সঙ্গে ঘর করবে না, ঘর করবে মানুষের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি। যা করে ফেলা হয়েছে তা সমর্থনের মতো যুক্তি যখন পাওয়া যায় না তখন চালু আপ্তবাক্যগুলো খুব কাজ দেয় বৈকি।

ইতিমধ্যে মেয়েটি ধীরে ধীরে সেরে উঠল। গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচের বাড়িতে অনেকদিন থেকেই ভ্লাদিমিরের আসা যাওয়া ছিল না। যে রকমের অভ্যর্থনা সে আগে পেয়েছে তাতে এখানে আসার সাহস তার হয় নি। এবার যেচে গিয়ে তাকে ডেকে পাঠানো হল, অপ্রত্যাশিত সুখের সংবাদটিও সে পেলে — বিয়েতে কর্তারা সম্মতি দিয়েছেন। কিন্তু এ নিমন্ত্রণের জবাবে যে অর্ধোন্মাদ একটা চিঠি এসে পেঁাছল তা দেখে নেনারাদভোর কর্তাদের বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না। চিঠিতে ভ্লাদিমির আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছিল এ বাড়ির কপাট সে আর মাড়াবে না, হতসুখ এই দুর্ভাগার কথা যেন ওঁরা ভুলে যান, মৃত্যু ছাড়া ওর আর কোনো গতি নেই। দিন কয়েক পরে শোনা গেল লোকটা সৈন্যদলে ফিরে গেছে। সময়টা তখন ১৮১২ সাল।

অসুখ থেকে সেরে উঠছে বলে ব্যাপারটা মাশাকে দীর্ঘদিন জানানো হয় নি। সে নিজেও কখনো ভ্লাদিমিরের কথা তোলে নি। শুধু মাস কয়েক পরে, বোরোদিনোর যুদ্ধের পর সাহসের জন্যে পুরস্কৃত ও মারাত্মক আহতদের তালিকায় ভ্লাদিমিরের নাম দেখে মাশা মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। ভয় হয়েছিল অসুখটা বুঝি আবার চেগে ওঠে। কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মূর্ছাটা খারাপের দিকে আর যায় নি।

কিছুদিন যেতে না যেতে কিন্তু নতুন একটা শোকের ঘটনা ঘটল। গাভ্রিলা গাভ্রিলভিচ ইহধাম ত্যাগ করলেন। গোটা সম্পত্তির মালিক হল এখন মাশা — কিন্তু তাতে তার কোনো সান্ত্বনা ছিল না। প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভ্‌নার দুঃখে সেও আন্তরিকভাবে ভাগ নিতে চাইলে এবং শপথ করলে, মাকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। দুঃখের স্মৃতি ঘেরা নেনারাদভো

গ্রাম ছেড়ে তারা গিয়ে বসবাস শুরু করলে মহালেরই আর একটা গ্রাম ক...এতে।

এখানেও সুন্দরী ধনীকন্যার চারপাশে পাণিপ্রার্থীর অভাব ঘটল না। কিন্তু মাশার দিক থেকে কেউ এতটুকু উৎসাহ পায় নি। মেয়েটি যাতে তার জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয় সে জন্যে মা মাঝে মাঝে বোঝাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু মারিয়া গাভ্রিলভ্না তাতে শুধু তার মাথা নেড়ে কী এক চিন্তায় ডুবে যেত। ভ্লাদিমির বাঁচে নি। ফরাসীরা যখন মস্কো প্রবেশ করে তার ঠিক আগেই সে মারা যায়। মাশার কাছে ওর স্মৃতি ছিল পবিত্র, অন্তত তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এমন যা কিছু সে পেয়েছে তাই সে সযত্নে জমিয়ে রেখেছিল --- যে বইগুলো সে একসময় পড়ত, তার আঁকা ড্রইং, যে সব কবিতা আর স্বরলিপি সে মাশার জন্যে নকল করে দিয়েছিল, সব। প্রতিবেশীরা তার এই নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এই সতী আর্তেমিস্‌টির* করুণ সতীধর্ম শেষ পর্যন্ত কোন নায়কের কাছে হার মানে তা দেখার জন্যে তারা অপেক্ষা করে রইল সাগ্রহে।

এদিকে যুদ্ধে আমাদের জয় হল। বিদেশের নানা জায়গা থেকে সৈন্যদল ফিরতে শুরু করলে দলে দলে। লোকে ঘর থেকে ছুটে ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের দেখতে। শত্রুপক্ষের কাছ থেকে রপ্ত করে আনা সঙ্গীত বাজাত আমাদের বাজনদার বাহিনীগুলো — 'Vive Henri-Quatre',** তিরোলিজ ওয়াল্‌জ্‌, কিংবা 'জকোন্দ্‌'-এর এক-একটা আরিয়া*। অভিযানে যারা গিয়েছিল কিশোর বয়সে, সে সব অফিসাররা ফিরল যুদ্ধের আবহাওয়ায় সাবালক হয়ে, বুকে তাদের পুরস্কারের ক্রুশ ঝোলানো। সেপাহিরা খোশ-মেজাজে আলাপ করে চলত নিজেদের মধ্যে. কথায় তাদের অতি স্বচ্ছন্দে ফরাসী আর জার্মান শব্দের মিশেল ঘটত। গৌরব আর উদ্দীপনার কী দিনই গেছে সে সব! 'মাতৃভূমি' শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র সেদিন কী প্রবল আবেগেই না রুশদের বুক ভরে উঠত! কী মধুর সেই পুনর্মিলনের অশ্রু! জাতীয় গৌরবের সঙ্গে জারের প্রতি

** 'আঁরি কোয়াত্‌র দীর্ঘজীবী হউক।' (ফরাসী) — টীকা দ্রঃ

ভালোবাসা সেদিন কী রকম এক করে আমরা মিলিয়ে নিয়েছিলাম — জারের কাছে সে এক দিনের মতো দিনই বটে!

মেয়েরা, রুশী মেয়েরা, সেদিন হয়ে উঠেছিল অতুলনীয়। কোথায় ভেসে গেল তাদের স্বাভাবিক সঙ্কোচ। বিজয়ীদের ফিরতে দেখে তারা:

চিৎকার করে উঠত 'হুররে'
আর ওড়না উড়িয়ে দেয় বাতাসে!*

তখন সে কী উল্লাস আর উত্তেজনা!

সে সময়কার এমন কোনো অফিসার নেই যিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে সেরা, সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কারটির জন্যে কোনো রুশ নারীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবেন না।

এই অপূর্ব সময় মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বাস করছিল তার মার সঙ্গে ক... প্রদেশে। সৈন্যদলের প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে রাজধানীদুটিতে কী উৎসব হয়েছিল তা দেখার সৌভাগ্য তাদের হয় নি। কিন্তু উদ্দীপনার ব্যাপকতা যে মফস্বল আর গ্রামগুলোতে আরো বেশি হয়েছিল তা বেশ বলা যায়। এই সব এলাকায় কোনো অফিসার এসে পৌঁছলে আর কথা নেই — যেন রাজ সমারোহ শুরু হয়ে যেত, আর ফ্রককোট-পরা লোকটি যদি একটু প্রেমিক-গোছের হত তো আর রক্ষা থাকত না।

আগেই বলেছি, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার দিক থেকে কোনো রকম উষ্ণতার অবকাশ না থাকলেও তার চারপাশে পাণিপ্রার্থীর ভিড় লেগেই ছিল। কিন্তু এবার সকলকেই কিছু হটতে হল যখন বুর্‌মিন নামে এক জখম ঘোড়সওয়ার-কর্ণেল বুকের ওপর জ্বলজ্বলে একটা সেণ্ট জর্জ ক্রুশ নিয়ে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার দুর্ভেদ্য কেল্লায় উপস্থিত হলেন। লোকটার মুখের রঙে এমন একটা বিবর্ণতা, যা, স্থানীয় তরুণীদের মতে, ভারি মন টানে। বয়স প্রায় তার ছাব্বিশ, — তার নিজের জমিদারিটা, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার জমিদারির খুব কাছেই, সেখানেই সে চলছিল ছুটি কাটাতে। লোকটার প্রতি মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বেশ খানিকটা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুরু করলে। ওর কাছে সে যখন থাকত তখন দেখা যেত মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার স্বাভাবিক বিষাদ কেটে গিয়ে খানিকটা সজীবতা ফিরে

এসেছে। এর মধ্যে মারিয়া গাব্রিলভ্‌নার দিক থেকে ছেনালীপনার এতটুকু কোনো লক্ষণ ছিল না বটে, কিন্তু কবি তাকে দেখে নিশ্চয়ই বলতেন:

Se amor non è, che dunque?. .**

বুর্‌মিন সত্যিই মন কাড়ার মতো যুবক। মেয়েদের যা পছন্দ বুর্‌মিনের মনটা ছিল একেবারে সেই রকম — শোভন স্বভাব, মনোযোগী, কথাবার্তায় চালিয়াতি নেই, আর সব কিছুতেই একটু স্বচ্ছন্দ রহস্যের আমেজ। মারিয়া গাব্রিলভ্‌নার সঙ্গে সে সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহারই করত বটে, তবে মারিয়া গাব্রিলভ্‌না যা কিছু বলত, যা কিছু করত তা থেকে সে তার মন আর চোখ ফেরাতে পারত না। দেখে মনে হত লোকটা ভারি শান্ত এবং সংযমী। কিন্তু শোনা গেল নাকি সে এক সময় বেদম বেপরোয়ার মতো দিন কাটিয়েছে, তাতে অবশ্য মারিয়া গাব্রিলভ্‌নার চোখে সে খাটো হল না। (সাধারণত অধিকাংশ তরুণীর মতো) সে সব কীর্তি-কেলেঙ্কারি তার কাছেও মনে হল সাহস আর হৃদয়ের উদ্বেলতার লক্ষণ, সুতরাং সানন্দে তা সে ক্ষমা করে নিলে।

ঘোড়সওয়ার বাহিনীর এই যুবকটি তাকে কখনো প্রেম নিবেদন করে নি। আর বিশেষ করে এই জন্যেই তার শোভন আদব-কেতা, তার সুন্দর আলাপ-আলোচনা, তার মনোহর বিবর্ণতা, তার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বাহু, এ সব কিছুর চাইতেও বেশি করে এই নীরবতার জন্যেই মারিয়া গাব্রিলভ্‌নার কৌতূহল আর কল্পনা আলোড়িত হয়ে উঠল। সে টের পেয়েছিল, মানুষটার ওপর তার একটা ছাপ পড়েছে। বুর্‌মিনের যা বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা, তাতে সেও নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছে যে মারিয়া গাব্রিলভ্‌নাও তার প্রতি মোটেই উদাসীন নয়। তা হলে এখনো কেন তাকে মারিয়া গাব্রিলভ্‌নার পদতলে এসে প্রেম নিবেদন করতে দেখা গেল না? কী জন্যে সে পিছিয়ে থাকছে? সেকি সেই শঙ্কার জন্যে, অকৃত্রিম ভালোবাসার সঙ্গে যা সব সময় জড়িয়ে থাকে? নাকি তার অহঙ্কারের জন্যে? নাকি এ শুধু এক নিপুণ নাগরের চতুরালি মাত্র?

** 'যদি প্রেম না হয় তবে কী?..' (ইতালীয়)

মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার কাছে লোকটা হয়ে উঠল এক দুর্বোধ্য রহস্য। অনেক ভেবে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না স্থির করলে এ সংযমের একমাত্র কারণ নিশ্চয়ই সংকোচ। তাই ওকে সাহস দেবার জন্যে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না আরো খোলাখুলিভাবে ওর দিকে নজর দিতে শুরু করলে। আর সুযোগ পেয়ে গেলে এমনকি দরদ প্রকাশ করতেও ভুললে না। এমন একটা উপলক্ষ্য সে রচনা করতে চাইছিল যা হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিত হয়ে দেখা দেবে। অধৈর্য হয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল সেই মুহূর্তের জন্যে যখন রোমান্টিক ঘোষণা সে শুনবে। যে কোনো রকমেরই হোক না কেন, যা রহস্যময়, মেয়েদের কাছে তা চিরকালই অসহ্য। মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার এই সব মহড়া ব্যর্থ হল না, বুর্‌মিন এমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠতে লাগল, তার কালো চোখজোড়া এমন গভীরভাবে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার মুখের দিকে চাইতে শুরু করলে যে মনে হল চূড়ান্ত মুহূর্তটা বুঝি আসে। পাড়াপড়শীরা পর্যন্ত বিয়ের কথা নিয়ে এমনভাবে আলাপ-আলোচনা করতে লাগল যেন ব্যাপারটা সব ঠিকই হয়ে আছে। আর স্নেহাতুরা প্রাস্কোভিয়া পেত্রোভ্‌না খুশি হয়ে ভাবলে এতদিনে তাহলে মেয়ের রাজজোটক বর জুটল।

একদিন বৃদ্ধা মহিলাটি তাঁর বৈঠকখানায় বসে বসে 'গ্রাঁদ পেশেন্স' খেলার জন্যে তাস বাঁটছেন এমন সময় বুর্‌মিন এসে জিজ্ঞেস করলে, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না কোথায়। বৃদ্ধা বললেন, 'ও তো বাগানে রয়েছে। যাও না তুমি। তোমরা দুটিতে না ফেরা পর্যন্ত আমি এখানেই একটু বসে থাকি।' বুর্‌মিন চলে গেল আর বুড়ি তার বুকের ওপর ক্রুশের চিহ্ন এঁকে ভাবলেন, 'ভগবান করুন, আজই তাহলে পাকা কথাটা হবে।'

বুর্‌মিন গিয়ে দেখলে মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না বসে আছে একটা পুকুরের পাড়ে, উইলো গাছের নিচে, হাতে তার একখানা বই, পরনে শাদা পোশাক, দেখে মনে হবে ঠিক যেন উপন্যাসের কোনো নায়িকা। মামুলী জিজ্ঞাসাবাদটুকুর পর মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না ইচ্ছে করেই আলাপ-আলোচনায় ছেদ টেনে চুপ করে রইল, তাতে পরস্পরের অস্বস্তির ভাবটা এমনভাবে বেড়ে ওঠার কথা যে আকস্মিক মরীয়া একটা ঘোষণা দিয়েই তার অবসান ঘটানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যা ঘটল তা এই। বুর্‌মিন তার বিব্রত অবস্থাটার

চাপে অস্থির হয়ে বললে, অনেকদিন থেকে সে তার হৃদয় মেলে ধরার একটা সুযোগ খুঁজছিল, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না কি তার কথা একটু শুনবে? মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার যে তাতে আপত্তি নেই একথা বোঝাবার জন্যে সে তার বইটি বন্ধ করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

বুর্‌মিন বললে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি, কী ভয়ানকই না ভালোবাসি!' (মারিয়া গাভ্রিলভনার মুখ লাল হয়ে উঠল। মাথাটা তার আরো ঝুঁকে এল মাটির দিকে।) 'তোমাকে রোজ দেখতে আসা, রোজ তোমার কথা শোনার মধুর এই আকর্ষণে ভেসে যাওয়া আমার ঠিক হয় নি...' (মারিয়া গাভ্রিলভ্‌নার মনে হল St.-Preux**-এর প্রথম পত্রের কথা।) 'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার, নিয়তিকে আর ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তোমার স্মৃতি, তোমার অতুলনীয় মধুময় ছবি এখন থেকে আমার সারা জীবনের আনন্দ আর সারা জীবনের বেদনা হয়ে রইল। খুব কষ্টের একটি কর্তব্য আমার বাকি আছে। তোমার কাছে আমার জীবনের একটা মারাত্মক গোপন বিষয় আমায় খুলে বলতে হবে, তাতে তোমার আমার মিলনের মাঝখানে একটা দুস্তর বাধা এসে দাঁড়াবে...' মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না অধৈর্যের মতো বাধা দিয়ে বললে, 'সে রকম দুস্তর বাধা সব সময়েই থাকে... তোমার স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হত না...' 'জানি,' — বুর্‌মিন বললে কোমল করে, 'আমি জানি তুমি আর একজনকে ভালোবাসতে। কিন্তু মৃত্যু আর তারপর এই তিনবছর ধরে শোকের পর... প্রিয়তমা মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না, আমার একমাত্র সান্ত্বনা তুমি দয়া করে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিও না। যখন ভাবি, আমার সুখ পূর্ণ করে তুলতে অমত করতে না, যদি... না, না, কথা কোয়ো না, মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না! তোমার জন্যে কী যন্ত্রণা যে সইতে হচ্ছে। আমি জানি, আমি বুঝতে পারি তোমায় আমি পেতে পারতাম, কিন্তু আমি বড়ো হতভাগ্য — আমি বিবাহিত!'

মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না হতবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

বুর্‌মিন বললে, 'আমি বিবাহিত। আজ চার বছর হল আমার বিয়ে

** সাঁ-প্রে। (ফরাসী) — টীকা দ্রঃ

হয়েছে, কিন্তু আমি জানি না কে আমার স্ত্রী, কোথায়ই বা সে আছে, আদৌ তার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হবে কিনা।'

'কী বললে?' মারিয়া গাভ্রিলভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার — আমিও তোমায় কিছু বলব... কিন্তু আগে তোমারটা শুনি, বলো তো সবখানি।'

বুর্‌মিন বললে, '১৮১২ সালের গোড়ার দিকে আমি যাচ্ছিলাম ভিলনোর দিকে। বেশ তাড়া ছিল। আমাদের রেজিমেণ্ট ছাউনি ফেলেছিল সেখানে। একটা ডাক-স্টেশনে এসে পেঁছিতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমি হুকুম দিলাম জলদি করে আমার জন্যে ঘোড়া জুততে। এমন সময় একটা তুষার-ঝঞ্ঝা শুরু হয়ে গেল। ডাক-স্টেশনের কর্তা আর গাড়োয়ানেরা সকলেই বললে, ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। প্রথমটা ওদের কথা শুনে অপেক্ষা করলাম খানিকটা, কিন্তু কেমন অদ্ভুত একটা উদ্বেগ আমায় পেয়ে বসল। মনে হল ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে তাড়া দিচ্ছে। ওদিকে ঝড়ের দাপট কমারও কোনো লক্ষণ নেই। অধৈর্য হয়ে আবার ঘোড়া জুততে হুকুম দিলাম আর বেরিয়ে পড়লাম ঝড় মাথায় করেই। কোচোয়ান কী ভেবে নদীর পাড়ের পথ ধরলে, তাতে নাকি তিন ভার্স্ট পথ বাঁচবে। নদীর পাড় সব কিন্তু বরফে ঢেকে গিয়েছিল। ফলে রাস্তার যে মোড়ে আমাদের বাঁক নেওয়ার কথা তা আমরা পেরিয়ে চলে গেলাম। যেখানে গিয়ে পেঁছিলাম সেটা এক অপরিচিত জায়গা। তখনো ঝড় কমার কোনো লক্ষণ নেই। দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছিল। সেই দিকেই গাড়ি হাঁকাতে বললাম। গিয়ে দেখা গেল, জায়গাটা একটা গাঁ, কাঠের একটা গির্জার ভেতরে আলো জ্বলছে। গির্জার দরজা খোলা, বেড়ার ভেতর দিকে কয়েকটা স্লেজ গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বারান্দার ওপর পায়চারি করছিল জনকয়েক লোক। আমাকে দেখে একসঙ্গে কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল, 'এই দিকে, এই দিকে!' কোচোয়ানকে বললাম গির্জার বেড়ার ভেতর ঢুকতে। কে একজন বললে, 'কী ব্যাপার, এত দেরি করলে কী বলে? কনে মূর্ছা গেছে। পুরোহিত ভেবে পাচ্ছে না কী করা উচিত। আমরা তো বাড়িই ফিরে যাচ্ছিলাম। শিগ্‌গির এসো!' দ্বিরুক্তি না করে আমি স্লেজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে গিয়ে ঢুকলাম গির্জার ভেতরে।

কয়েকটা মাত্র মোমবাতি জ্বলছে, তাতে একটু আলো হয়েছে আবছা। অন্ধকার এক কোণে একটি তরুণী বসে আছে বেঞ্চিতে, আর একটি মেয়ে তার কপাল টিপে দিচ্ছে। সে মেয়েটি বললে, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন। খুব সময়ে এসে পড়েছেন যা হোক। দিদিমণিকে আর একটু হলেই মেরে ফেলতেন আর কি।' বুড়ো মতো একজন পুরোহিত এসে জিজ্ঞেস করলে, 'তা হলে শুরু করা যাক?' অন্যমনস্কভাবে আমি বললাম, 'করুন, পাদ্‌রি শুরুই করুন।' মেয়েটিকে ধরাধরি করে এনে দাঁড় করানো হল। মনে হল সে বেশ সুন্দরী হবে... ব্যাপারটা এমন একটা যুক্তিহীন, ক্ষমার অযোগ্য চ্যাংড়ামি হয়েছিল... আমি বেদীর সামনে মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাড়াহুড়ো করছিল পুরোহিত। তিনটে লোক আর ঝিটি মেয়েটিকে ধরে রাখতেই ব্যস্ত — অন্য কোনোদিকে তাদের নজর ছিল না। আমাদের স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করা হল। ওরা বললে, 'এবার চুমু খেতে হবে।' আমার স্ত্রী তার বিবর্ণ মুখখানাকে আমার দিকে উঁচু করে তুলে ধরলে। আমি চুমু খেতে যাব এমন সময় মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এ নয়, এ নয়!' তারপর পড়ে গেল অচৈতন্য হয়ে। সাক্ষীরা আমার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাইতে শুরু করলে। আমি অবিচলিতের মতো ফিরে চলে এলাম গির্জা ছেড়ে। স্লেজের ওপর লাফ দিয়ে উঠে হাঁকলাম, 'চালাও!'

মারিয়া গ্যাভ্রিলভ্‌না চিৎকার করে উঠল, 'মাগো! তারপর তোমার বেচারী বৌটির কী হল? তার কোনো খোঁজই রাখলে না?'

বুর্‌মিন বললে, 'না। যে গাঁয়ে বিয়ে হল তার নামটা পর্যন্ত আমি জানি না। কোন ডাক-স্টেশন থেকে যে আমি রওনা দিয়েছিলাম তাও খেয়াল নেই। সে সব দিনে গর্হিত এই ধরনের রগড় সম্পর্কে আমার এতটুকু দায়িত্ববোধ ছিল না। গির্জাটা পেছনে সরে যাওয়া মাত্র আমি স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর সে ঘুম ভাঙে মাত্র পরদিন সকালে, তৃতীয় ডাক-স্টেশনে আসার আগে। আমার সঙ্গে যে ভৃত্য ছিল লড়াইয়ে তার মৃত্যু হয়। ফলে যাকে নিয়ে অমন নিষ্ঠুর তামাসা করেছিলাম এবং এখন যে এত নিষ্ঠুরভাবে প্রতিশোধ নিলে, তাকে খুঁজে বার করার আশা আমার নেই।'

'মাগো!' ম্যারিয়া গাভ্রিলভ্না বর্‌মিনের জামার আস্তিনটা আঁকড়ে ধরে বললে, 'তা হলে সে ব্যক্তিটি তুমিই — অথচ আমাকে চিনতে পারলে না?'

বর্‌মিনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল... তারপর গিয়ে বসলে মারিয়া গাভ্রিলভ্নার পায়ের কাছে...

কফিনওয়ালা

কফিন কি দেখা যায় না প্রতিটি দিন,
লোলচর্ম বিশ্বের পাকা চুল?

দের্জাভিন।*

কফিন-টানা গাড়িখানার ওপর কফিনওয়ালা আদ্রিয়ান প্রোখোরভের গেরস্থালি জিনিসপত্রের শেষ টুকিটাকিটি পর্যন্ত চাপানো হল। রোগা রোগা ঘোড়াদুটো এই নিয়ে বার বার চারবার কোঁথাতে কোঁথাতে রওনা দিলে বাস্‌মান্নায়া স্ট্রিট থেকে নিকিৎস্কায়া স্ট্রিটের দিকে। বাড়ি বদল করে সপরিবারে সে ওখানেই উঠে যাচ্ছে। দোকানে তালা ঝুলিয়ে সে ফটকের মাথায় বিজ্ঞাপন লটকিয়ে দিলে, 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রি করা যাইবে', তারপর নতুন বাসার দিকে যাত্রা করলে পায়ে হেঁটে। বাড়িখানার জন্যে তার অনেকদিন থেকেই লোভ ছিল। বেশ মোটা টাকা দিয়ে তা এতদিন পরে কেনা গেছে। তবু এই বহুবাঞ্ছিত বাড়িটির হলুদ-রঙা দেয়ালের কাছাকাছি এসে অবাক হয়ে সে টের পেলে তেমন আনন্দ লাগছে না। বাড়িটার তখনো কোনো গোছগাছ করা হয় নি। এখনকার অচেনা চৌকাঠ পেরিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে তার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল সেই খুপরিটার জন্যেই যেখানে দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে সব কিছুর মধ্যেই ছিল একটা পরিপাটি শৃংখলা। ঢিলেমির জন্যে কফিনওয়ালা ধমক দিলে তার মেয়েদুটি আর ঝিটিকে, তারপর নিজেই গিয়ে ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। ঘরখানা গুছিয়ে তুলতে দেরি হল না। ধর্মকর্মের দেবীপট, বাসনপত্রের দেরাজ, টেবিল, কোচ আর শয্যা ভেতর-ঘরের নানা কোণে সকলেই যথাযোগ্য স্থান পেল, গৃহকর্তার যা কিছু সম্পত্তি সব গাদা করা হল রান্নাঘর আর বৈঠকখানায় — নানা রঙ আর নানা গড়নের যত কফিন, আর আলমারি-ভর্তি শোকের নানা আলখাল্লা, মাথার ঢাকনি, মশাল। ফটকের

ওপর টাঙ্গানো হল একটা সাইন-বোর্ড, তাতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট এক 'কিউপিড'-মূর্তি আঁকা, উলটিয়ে-ধরা একটা মশাল তার হাতে, নিচে লেখা 'সাধারণ ও চিত্রবিচিত্র নানা প্রকার কফিন বিক্রয় ও সুসজ্জিত করা হয়। কফিন ভাড়া দেওয়া বা মেরামত করার কাজও আমরা করিয়া থাকি'। গোছগাছের পর আদ্রিয়ানের কন্যারা তাদের নিজ নিজ কুঠরিতে গিয়ে ঢুকল। আর আদ্রিয়ান তার নতুন আবাসখানার চারিদিক আর একবার তদারক করে এসে বসল জানলার পাশে, হুকুম দিলে সামোভার গরম করতে।

বিদগ্ধ পাঠকদের জানা আছে যে শেক্সপিয়র এবং স্যার ওয়ালটার স্কট — উভয়েই কবর খোঁড়নেওয়ালাদের এঁকেছেন এমনভাবে যেন তারা ফুর্তিবাজ, রগুড়ে লোক। এর পেছনে তাঁদের লক্ষ্য ছিল বৈপরীত্য সৃষ্টি করে গভীরতর ছাপ ফেলা। কিন্তু সত্যের প্রতি অনুগত থাকতে হলে তাঁদের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে অনুসরণ করা আমাদের সম্ভব হবে না। বলতে আমরা বাধ্য যে আমাদের এই কফিনওয়ালাটির স্বভাব ছিল ঠিক তার বিষণ্ণ উপজীবিকারই অনুরূপ। আদ্রিয়ান প্রোখোরভ হল একজন গম্ভীর আর বিমর্ষ ধরনের মানুষ। স্তব্ধতা সে নিতান্ত ভাঙত শুধু যখন তার নজরে পড়ত মেয়েদুটো জানলা দিয়ে আলসের মতো রাস্তার লোকেদের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন বকুনি দেবার জন্যে, কিংবা দুর্ভাগ্যবশত (অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে সৌভাগ্যবশত), তার হাতের কাজের জন্যে খদ্দের এলে তখন চড়া দাম হাঁকার উদ্দেশ্যে। তাই সপ্তম কাপ চা সামনে নিয়ে আদ্রিয়ান বসেই রইল তার জানলার কাছে আর তার অভ্যাসমতো বিষণ্ণ নানা চিন্তায় ধীরে ধীরে ডুবে গেল। সে ভাবছিল গত সপ্তাহের সেই অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের শবযাত্রাটার কথা। তোলা আদায়ের ফটকটা পার হচ্ছে ঠিক এমন সময় ঝমঝম করে কী বৃষ্টি। তার ফলে আদ্রিয়ানের অনেকগুলো আলখাল্লা চুপসে গেছে, অনেক ক'টা টুপি দুমড়িয়ে গেছে। সামনে তার এক মস্ত খরচ — সৎকার বাসরের সাজপোশাকগুলোর অবস্থা একেবারে কাহিল। আশা ছিল এই ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়া যাবে বুড়ি ত্রিউখিনার সৎকার-কর্ম থেকে, ধনী এক কারবারীর বিধবা এই বুড়ির আজ বছরখানেক থেকে প্রায় যায়-যায় অবস্থা। কিন্তু মরছে বুড়ি সেই

রাজ্‌গুলিয়াই চত্বরে। সেই জন্যেই প্রোখোরভের দুর্ভাবনা হচ্ছিল, কথা দিয়ে রাখা সত্ত্বেও হয়ত বুড়ির উত্তরাধিকারীরা এতদূর এসে তাকে ডাকতে পাঠাবে না, এবং কাছাকাছি কোনো ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলবে।

সদর দরজায় তিনটি বিশেষ ধরনের টোকায় আদ্রিয়ানের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। 'কে হে?' কফিনওয়ালা জিজ্ঞেস করলে চেঁচিয়ে। দরজা খুলতে একটি লোক ঘরে ঢুকে কফিনওয়ালার দিকে এগিয়ে এল ফুর্তির মেজাজে। দেখেই চেনা যায় লোকটা একটা জার্মান কারিগর। ভাঙ্গা-ভাঙ্গা রুশ ভাষায় সে যেভাবে কথা কইছিল তা শুনে আজ পর্যন্ত হাসি চেপে রাখা মুশকিল। বললে, 'মাপ করবেন ভালোমানুষ পড়শী, আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে মাপ করবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। আমার নাম গট্‌লিব শুলট্‌স — জুতোর কারিগর। থাকি রাস্তার ঠিক ওপারে — ওই যে ছোটো বাড়িটা, আপনার জানলা থেকেই চোখে পড়বে। আগামী কাল আমার বিয়ের পঁচিশ বছর পালন করতে চাইছি। আপনার আর আপনার মেয়েদের নেমন্তন্ন রইল। ঘরের লোকের মতো একসঙ্গে ডিনার খাওয়া যাবে।' নেমন্তন্ন সাদরে গ্রহণ করা হল। কফিনওয়ালা চা এগিয়ে দিল জুতোর কারিগরটিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গট্‌লিব শুলট্‌সের দিল-খোলা মেজাজের দৌলতে ওদের দুজনের মধ্যে আলাপ জমে উঠল বেশ দোস্তের মতো। 'আপনার কারবারের কী খবর?' আদ্রিয়ান প্রশ্ন করল। শুলট্‌স বললে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ... আমাদের কারবারেও চড়া মন্দা আছে, তবে আফশোস করে কী হবে। আমার অবিশ্যি আপনার মতো নয় — জ্যান্ত লোকের জন্যে অনেক সময় বুট না কিনলেও চলে, কিন্তু মরা লোকের জন্যে কফিন না নিয়ে উপায় নেই।' আদ্রিয়ান বললে, 'তা বটে। তবে কিনা জ্যান্ত লোকের টাকা না থাকলে সে খালি-পায়েই হাঁটবে, আপনার খরচা করাবে না। কিন্তু টাকা নেই এমন লোক যদি মরে তখন বিনা পয়সাতেই কফিন ছেড়ে দিতে হয়।' এমনি আলাপ চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। বিদায় নেবার সময় হলে জুতোর কারিগর আর একবার তার নেমন্তন্নের কথাটা জানিয়ে গেল।

পরদিন ঠিক দুপুরে সকন্যা কফিনওয়ালা তাদের নতুন কেনা বাড়িটির

ফটক খুলে বেরিয়ে এল এবং রওনা দিলে প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে। পোশাকের বর্ণনা দেওয়া আজকালের সাহিত্যের একটি প্রচলিত রীতি। এ রীতি লঙ্ঘিত হলেও আমি কিন্তু আদ্রিয়ান প্রোখোরেভের রুশ 'কাফ্‌তান' কিংবা আকুলিনা আর দারিয়ার ইউরোপীয় পোশাকের বর্ণনা দিতে যাব না। শুধু এইটুকু বললেই বোধ হয় হবে যে দুই কন্যার পরনেই ছিল সেই হলদে রঙের টুপি আর লাল রঙের জুতো — বিশেষ উপলক্ষ্য না ঘটলে যেটি ওরা সাধারণত বার করত না।

জুতো-মিস্ত্রির ছোটো ঘরখানা নিমন্ত্রিতে ভরে গিয়েছিল। জার্মান কারিগর আর তাদের বৌ আর শিক্ষানবিশীরাই তার মধ্যে বেশি। রুশ সরকারী কর্মচারী বলতে ছিল মাত্র একজন -- পুলিস চুখোনেৎস* ইউর্কো। পদের দিকে উঁচু না হলেও গৃহকর্তার বিশেষ অনুগ্রহ তার ওপরে ছিল, কেননা পগোরেল্‌স্কির সেই বিখ্যাত পোস্টম্যানের* মতো দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে সে অকপট সততার সঙ্গেই কাজ চালিয়ে এসেছে। ১৮১২ সালের অগ্নিকাণ্ডে যখন এই সেকেলে রাজধানী পুড়ে যায় তখন সেই সঙ্গে তার হলুদ-রঙা গুমটি-ঘরটিও যায়। কিন্তু শত্রুদের তাড়িয়ে দেবার পর সে জায়গায় নতুন একটি গুমটি-ঘর উঠতে দেরি হয় নি। এবার তার রঙ করা হল ধূসর আর শাদা থামগুলো করা হল 'ডোরিক' ছাঁদের। আপাদমস্তক সশস্ত্র হয়ে ইউর্কো আবার তার সামনে টহল দেওয়া শুরু করলে। নিকিৎস্কি গেটের চারপাশে যত জার্মান ছিল তাদের প্রায় সকলের সঙ্গে ইউর্কোর আলাপ ছিল। ওদের কাউকে কাউকে এমনকি তার গুমটি-ঘরে গিয়ে রবিবারের সন্ধ্যে কাটাতেও দেখা যেত। সুতরাং ও লোকটাকে দিয়ে ভবিষ্যতে তার কাজ হবে এটা আন্দাজ করে আদ্রিয়ান তার সঙ্গে আলাপ করে নিতে দেরি করলে না। খেতে বসার সময় আদ্রিয়ান আর ইউর্কো বসল পাশাপাশি। অভ্যাগতদের সঙ্গে খেতে খেতেই শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী শুলট্‌স আর তাদের সতেরো বছরের মেয়ে লট্‌হেন খাওয়ার তদারক করতে লাগল আর মাঝে মাঝে পরিবেশনের ব্যাপারে সাহায্য করতে শুরু করলে পাচিকাকে। বিয়ারের বান ডাকল টেবিলে। ইউর্কো একাই সাঁটল চারজনের মতো। আদ্রিয়ানও পিছ-পা হল না এবং তার কন্যাদ্বয় যথারীতি তাদের আদব-কেতা মেনে। কথাবার্তা চলছিল জার্মান

ভাষায় এবং ক্রমেই তা সরব হয়ে উঠতে লাগল। তারপর একসময় গৃহকর্তা সকলকে একটু থামতে বলে উঠে দাঁড়াল এবং আলকাতরার পোঁচ-দেওয়া একটা বোতলের ছিপি খুলে রুশ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার আদরের লুইজার স্বাস্থ্যের জন্যে!' হালকা শ্যাম্পেন ফেনাতে থাকল। গৃহকর্তা তার মধ্যবয়সী কর্মসঙ্গিনীর তাজা-তাজা দেখতে মুখখানার ওপরে চুমু খেলে আর কলরব করতে করতে অভ্যাগতেরা আদরের লুইজের জন্যে স্বাস্থ্য পান করলে। গৃহকর্তা এবার আর একটি বোতল খুলে ঘোষণা করলে, 'আমার প্রীতিভাজন অতিথিদের স্বাস্থ্যের জন্যে!' অতিথিরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধন্যবাদ দিয়ে গেলাসগুলি আবার শূন্য করে দিলে। তারপর শুরু হল ঘনঘন টোস্ট-ঘোষণা। স্বাস্থ্য পান করা হল এক-এক করে প্রত্যেকটি লোকের জন্যে, মস্কো শহরের জন্যে, গণ্ডা তিনেক জার্মান ছোট শহরের জন্যে, এক-এক করে প্রত্যেকটা পেশার জন্যে এবং একত্রে সব রকমের পেশার জন্যে, এবং তাতে যত কারিগর আর শিক্ষানবিশ আছে তাদের সকলের জন্যে। আদ্রিয়ান বিবেচকের মতোই মদ্য পান করছিল বটে তবু শেষ পর্যন্ত ফুর্তির মাথায় সেও একটা খামখেয়ালী টোস্ট প্রস্তাব করে বসল। অতঃপর অতিথিদের মধ্যে থেকে মোটামতো এক রুটিওয়ালা তার গ্লাস উঁচু করে ঘোষণা করলে: 'আমাদের খদ্দেরদের স্বাস্থ্যের জন্যে — unscrer Kundleute!'** আগের টোস্টগুলোর মতো এ টোস্টও পান করা হল ঐকতান ফুর্তির সঙ্গে। অতিথিরা পরস্পর পরস্পরকে অভিবাদন করতে শুরু করল। দর্জি অভিবাদন করলে জুতোর কারিগরকে, জুতোর কারিগর অভিবাদন করলে দর্জিকে, তাদের দুজনকেই অভিবাদন করলে রুটিওয়ালা, তারপর গোটা দলটাই গিয়ে অভিবাদন করলে রুটিওয়ালাকে, এবং এই-ই চলল। পারস্পরিক এই অভিবাদনের মধ্যে ইউর্কো হঠাৎ কফিনওয়ালার দিকে ফিরে চিৎকার করে বললে, 'এসো ভাই, এবার তোমার মরা-মানুষগুলোর স্বাস্থ্য পান করা যাক!' সকলে হেসে উঠল কিন্তু কফিনওয়ালা হাসল না। আহত বোধ করে সে ভ্রূকুটি করলে। কিন্তু কারোরই তা নজরে পড়ল না, পান চলতে

** 'আমাদের খদ্দেরদের জন্যে!' (জার্মান)

লাগল পুরোদমে। টেবিল ছেড়ে ওরা যখন উঠল তখন সন্ধ্যার ঘণ্টা শুরু হয়েছে।

ফিরতে সকলের বেশ রাত হয়ে গেল। সবাই বেশ মাতাল। মোটা রুটিওয়ালা আর দপ্তরী যার মুখখানা হয়েছে ঠিক তার

লাল মরক্কোর-বাঁধানো বইয়ের মতো,*

দুজনে মিলে ইউর্কোর দুই বগলের নিচে দুই হাত দিয়ে ধরে তাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে এল গুমটিতে। প্রত্যেকটা দানেরই প্রতিদান মিলবে — এই রুশ প্রবাদ বাক্যটি তারা এক্ষেত্রে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। কফিনওয়ালাও বাড়ি ফিরল বেশ বেসামাল হয়ে। মেজাজ তার চড়ে গিয়েছিল। যেটা তার মনে মনে ভাবার কথা সেটা সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'যাই বলো, আমার পেশা অন্যের চেয়ে কম সম্মানের হল কেমন করে? কফিনওয়ালা আর জল্লাদ তা হলে এক বলতে চাও? এক কি? এ কারবারে হাসির কি আছে, কী পেল ওই পরদেশী লোকগুলো? আমাকে কি ওরা এক আলখাল্লা-পরা সং ঠাউরাল নাকি? আর এদেরকেই কিনা আমি গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করব বলে ভাবছিলাম? ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে বরং আমি যাদের জন্যে মেহনত করি তাদেরই ভোজ দেব — আমার খ্রীষ্টান মড়াগুলোকেই নেমন্তন্ন করব।' ঝি বুট খুলে দিচ্ছিল আদ্রিয়ানের। সভয়ে সে বলে উঠল, 'হেই মাগো! কী বলছেন গো কর্তা। ক্রুশ দেন শিগগির। গৃহপ্রবেশের জন্যে মরা মানুষদের নেমন্তন্ন! মাগো!' 'ভগবানের দিব্যি, তাই-ই করব, আর কালই! আমার উপকারী গ্রাহকেরা, আপনারা শুনুন, যদি কাল আমার বাড়িতে আপনারা নৈশ ভোজনের নেমন্তন্ন গ্রহণ করেন তা হলে বাধিত হব। গরিবের খুদকুঁড়ো যেটুকু আছে তাই ভাগ করে খাওয়া যাবে।' এই বলে কফিনওয়ালা বিছানায় গা এলিয়ে দিল আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল তার নাক ডাকা।

আকাশ তখনো ফরসা হয় নি এমন সময় আদ্রিয়ানকে জেগে উঠতে হল। রাত্রে কারবারী গিন্নী ত্রিউখিনা মারা গেছে। বাড়ির সরকারের কাছ থেকে একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে খবরটা নিয়ে এসেছে আদ্রিয়ানের ওখানে।

ভদ্‌কা খাবার জন্যে কফিনওয়ালা তাকে দশ কোপেক বখশিস করলে। তারপর তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে দ্রজ্‌কি চেপে রওনা দিলে রাজ্‌গুলিয়াই-এর দিকে। মৃতের বাড়িতে ইতিমধ্যেই পুলিস-পাহারা বসানো হয়েছে। ভাগাড়ের কাকের মতো কারবারী ব্যাপারীরা সবাই পায়চারি করে বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। মড়া বার করে এনে রাখা হয়েছে টেবিলের ওপর। পচ্‌ ধরে চেহারা এখনো বিকৃত না হয়ে এলেও বুড়ির মুখ হয়েছে মোমের মতো প্যাটপেটে। তার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে যত আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, আর বাড়ির চাকর-বাকর। জানলাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে, মোমবাতি জ্বলছে, মৃতের জন্যে প্রার্থনা শুরু করেছেন পুরোহিত। আদ্রিয়ান গিয়ে দাঁড়াল মৃত কর্ত্রীর ভাইপোর কাছে। লোকটা একজন জোয়ান বয়সী কারবারী, গায়ে তার একটা হালফ্যাসনের ফ্রক-কোট। আদ্রিয়ান তাকে গিয়ে জানাল সে দাফন, কফিন, মোমব্যতি, কফিনের আচ্ছাদনী আর সৎকারের যাবতীয় জিনিসপত্র অবিলম্বে বেশ সরেস অবস্থায় জোগান দিতে পারে। হবু মালিক তাকে অন্যমনস্কের মতো ধন্যবাদ দিয়ে বললে, দাম নিয়ে সে দরাদরি করতে চায় না। কফিনওয়ালার ধর্মের ওপর সে সবই ছেড়ে দিচ্ছে। কফিনওয়ালা তার অভ্যাসমতো দিব্যি গেলে বললে, একটা কোপেকও সে বেশি নেবে না। তারপর বাজার-সরকারের দিকে চোখ মটকে একটু তাকিয়ে জোগাড় যন্ত্র করার জন্যে চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে। সারাদিন ধরে তাকে কেবলি রাজ্‌গুলিয়াই আর নিকিৎস্কি গেটের মধ্যে যাওয়া-আসা করে বেড়াতে হল। সন্ধ্যার মধ্যে সব কিছু তৈরি হয়ে যাবার পর, সে কোচোয়ানকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরে আসছিল পায়ে হেঁটে। রাতটা ছিল চাঁদনী। নিকিৎস্কি গেট পর্যন্ত পেঁছিতে কোনো কষ্ট হল না। এসেন্‌সন গির্জার সামনে দিয়ে যাবার সময় শুধু একবার আমাদের সেই বন্ধু ইউর্কো একবার চৌকির হাঁক পেড়েছিল, 'কে যায়?' তারপর শুভরাত্রি জানিয়েছিল আদ্রিয়ানকে চিনতে পেরে। ইতিমধ্যে রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। কফিনওয়ালা বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময় তার মনে হল কে যেন তার বাড়ির ফটক খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। আদ্রিয়ান অবাক হয়ে ভাবলে, 'ব্যাপার কী! আমার কাছে এখন আবার কে আসবে? চোর

নাকি? রাতের ফাঁকে আমার ঐ বেকুফ ছুকরিদুটোর কাছে জোয়ান ছোঁড়া-ফোঁড়া কেউ আসে না তো আবার?' একবার ভাবলে দোস্ত ইউর্কোকে সাহায্যের জন্যে ডাক দেবে কিনা। ইতিমধ্যে দেখা গেল আরো একজন কে চলেছে তার ফটকের দিকে। সেও ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, এমন সময় কফিনওয়ালাকে হনহন করে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সে তার তেকোণা টুপিটা উঁচু করলে। আদ্রিয়ানের মনে হল মুখটা তার চেনা, কিন্তু তাড়াতাড়ির জন্যে ভালো করে নজর করার সময় তার ছিল না। হাঁপাতে হাঁপাতে সে বললে, 'আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, ভেতরে চলুন-না।' ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় অচেনা লোকটা বললে, 'আপনি পথ দেখিয়ে আগে চলুন। ভদ্রতার দরকার নেই।' আদ্রিয়ানেরও এতই তাড়া ছিল যে ভদ্রতা করার অবকাশ ছিল না তার। খোলা ফটক দিয়ে সে বাড়ির পৈঠায় উঠতে শুরু করলে। লোকটা এল তার পেছু পেছু। আদ্রিয়ানের মনে হল ঘরের মধ্যে আরো যেন সব লোকজন ঘোরাফেরা করছে। তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে সে ভাবলে, 'শালা ব্যাপার কী এসব?' আর... ব্যাপার দেখে তার হাঁটু খুলে এল। ঘরখানায় মড়ারা এসে হাজির হয়েছে। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তাদের হলদে নীল চেহারার ওপর, তাদের চুপসানো মুখ, আধ-বোঁজা মিটমিটে চোখ আর ঠোকরানো নাকের ওপর। যে সব লোককে কবরস্থ করতে আদ্রিয়ান সাহায্য করেছে এবার সভয়ে তাদের চিনতে পারলে সে। যে লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকেছিল দেখা গেল সে হচ্ছে সেই ব্রিগেডিয়ার যাকে কবর দেবার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। কফিনওয়ালার চারপাশে ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা মড়ারা সব ফিরে দাঁড়িয়ে অভিবাদন আর অভিনন্দন জানাতে শুরু করলে। শুধু একজন বিশেষ কাছে এল না — বেচারিকে কিছুদিন আগে কফিন দিতে হয়েছিল বিনা পয়সায়। একটা কোণের কাছে গিয়ে লোকটা সবিনয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন তার ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকের কথা ভেবে বড়ো কুণ্ঠিত বোধ করছে। সে ছাড়া আর সকলেরই পোশাক-আশাক বেশ ভালো, মহিলাদের মাথায় ফিতেওয়ালা টুপি, ভূতপূর্ব সরকারী কর্মচারীদের দাড়িগোঁফ কামানো না হলেও গায়ে উর্দিটি আছে ঠিক, আর কারবারীদের পরনে তাদের সেরা সেরা পোশাকগুলো। গোটা

দলটার পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার বললে, 'এই দেখো প্রোখোরভ, তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্যে আমরা সকলেই কবর থেকে উঠে এসেছি। শুধু যাদের আর কোনো উপায় নেই, যারা একেবারেই ক্ষয়ে গেছে কিংবা যারা একেবারেই শুধু কঙ্কাল, তারা আসে নি। তবে এই কঙ্কালদের মধ্যেকারই একজন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে এতই আগ্রহ বোধ করেছিলেন যে না এসে পারেন নি...' সঙ্গে সঙ্গে হ্রস্বকায় একটি কঙ্কাল ভিড়ের মধ্যে থেকে গুঁতোগুঁতি করে এগিয়ে এল আদ্রিয়ানের দিকে। তার মাংসহীন মুখখানা আদ্রিয়ানের দিকে চেয়ে সস্নেহে কটাক্ষপাত করলে। টকটকে লাল আর হালকা সবুজ রঙের ছিটের কিছু টুকরো আর ঝুলিঝুলি সুতি কাপড় কিছু তার গায়ে এখানে-ওখানে লেগে আছে যেন একটা লাঠির সঙ্গে তা বাঁধা। উঁচু উঁচু সওয়ারী বুটের মধ্যে তার পায়ের হাড়গুলো খটখট করে বাজছে যেন খল-নোড়ার শব্দ। কঙ্কাল বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না প্রোখোরভ? রক্ষী বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট পিওতর পেত্রোভিচ কুরিলকিনের কথা তোমার মনে নেই? সেই যাকে তুমি তোমার প্রথম কফিন (তুমি বলেছিলে কফিনটা ওক কাঠের কিন্তু আসলে তা ছিল পাইন কাঠের) বিক্রি করেছিলে ১৭৯৯ সালে?' এই বলে কঙ্কাল তার হাত বাড়িয়ে একটা হাড্ডিসার কোলাকুলির জন্যে এগিয়ে গেল আদ্রিয়ানের দিকে। কিন্তু আদ্রিয়ান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠে তার গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। পিওতর পেত্রোভিচ টলতে টলতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল শুধু একরাশ হাড়ের স্তূপ সৃষ্টি করে। মড়াদের মধ্যে থেকে ক্রোধের গুঞ্জন শোনা গেল। সঙ্গীর সম্মান রক্ষার জন্যে তারা একযোগে এগিয়ে এসে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল আদ্রিয়ানের ওপর। তাদের সে চিৎকারে বেচারা নিমন্ত্রণ-কর্তা কানে তালা লেগে, হামলায় বিপর্যস্ত হয়ে, বোধশক্তি খুইয়ে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল ওই সেই রক্ষী বাহিনীর মৃত সার্জেন্টের হাড়গুলোরই ওপর।

কফিনওয়ালা যখন চোখ মেললে তার অনেক আগে বিছানায় বেশ রোদ এসে পড়েছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে ফুঁ দিয়ে ঝি আঁচ দিচ্ছে সামোভারে। সভয়ে আদ্রিয়ানের মনে পড়ল রাত্রের কথা। ত্রিউখিনা, ব্রিগেডিয়ার আর সার্জেন্ট কুরিলকিনের মূর্তিগুলো অস্পষ্টভাবে তার

মনে তখনো বিভীষিকা জাগিয়ে রেখেছে। কথা না বলে সে চুপ করে অপেক্ষা করে রইল। ভাবলে, ঝিই বলবে কাল রাতের কাণ্ডকারখানা শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়িয়েছিল।

আক্সিনিয়া তাকে সকালের পোশাক এগিয়ে দিয়ে বললে, 'আর কত ঘুমোবেন আদ্রিয়ান প্রোখোরেভিচ? আমাদের পড়শী ঐ দর্জিটা এসেছিল আপনাকে দেখতে, আর এখানকার পুলিস কনেস্টবল ছুটে বলতে এসেছিল যে আজ তাদের পুলিস ইনস্পেক্টরের রাশি-তিথি জন্মতিথি, কিন্তু আপনি ঘুমোচ্ছিলেন দেখে আর ওঠাই নি।'

'আর ঐ যে মারা গেল ত্রিউখিনা, তার কাছ থেকে কেউ আসে নি আমার কাছে?'

'ত্রিউখিনা? কেন? সে মারা গেছে নাকি?'

'তোমাকে নিয়ে পারা যাবে না! তার সৎকারের তোড়জোড় করার কাজে তুমি আমার সঙ্গে হাত লাগলে না কাল?'

'আপনি কি পাগল হলেন কর্তা? নাকি কাল রাতের নেশা আপনার এখনো কাটে নি? কাল আবার সৎকার হল কোথায়! সারা দিন তো আপনি ওই জার্মানটার ওখানে ভোজ খেয়েছিলেন। তারপর ফিরেছিলেন মাতাল হয়ে। তারপর সেই বিছানা নিয়েছেন আর এই এতক্ষণ বাদে উঠলেন। ওদিকে গির্জায় দুপুরের ঘণ্টা পর্যন্ত থেমে গেছে।'

হাঁপ ছেড়ে কফিনওয়ালা বললে, 'তাই নাকি?'

ঝি বললে, 'তা নয় ত আবার কী!'

'তা হলে, জলদি চা বানাও আর আমার মেয়েগুলোকে ডেকে দাও।'

স্টেশনের ডাকবাবু

পদেতে যদিও কেরানী, তবু
ডাক-স্টেশনেতে স্বৈরপ্রভু।

প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কি।*

এমন কে আছে যে স্টেশনের ডাকবাবুকে অভিশাপ দেয় নি, গালাগালি করে নি? রূঢ়তা, বেয়াদবি ও অকর্মণ্যতার নিষ্ফল নালিশ টুকে রাখার জন্যে হঠাৎ ক্ষেপে উঠে সেই করাল খাতাখানা চেয়ে বসে নি; সেকেলে নায়েবদের মতো, এবং অন্ততপক্ষে মুরোম দস্যুদের মতোই মানবজাতির কুলাঙ্গার বলে তাকে ভাবে না কে? তবু একবার নিরপেক্ষ হবার চেষ্টা করা যাক এবং ওদের জায়গায় দেখা যাক নিজেকে দাঁড় করিয়ে। তা হলে হয়ত বা অনেক ক্ষমার চোখে ওদের দেখা সম্ভব হবে। ডাকবাবুটি কে? নিতান্তই সর্বনিম্ন কর্মচারী পদের এক শহীদ। চড়চাপড় ঘুষি থেকে যে বাঁচে সেটা শুধু তার সরকারী তকমাটির জোরে, তাও সর্বদা নয় (পাঠকেরা নিজের বিবেকের দিকে তাকান)। প্রিন্স ভিয়াজেম্‌স্কি যাকে রহস্য করে 'ডাক-স্টেশনের স্বৈরপ্রভু' বলে অভিহিত করেছেন সেই লোকটির কাজটা কী রকম? একেবারে খাঁটি কয়েদ খাটুনি নয় কি? দিনে রাতে শান্তি নেই। বিরক্তিকর যাত্রাপথে যত রাগ জমে ওঠে, তার সবই এসে যাত্রীরা ঝাড়ে ডাকবাবুর ওপর। আবহাওয়াটা বিশ্রী, রাস্তা জঘন্য, কোচোয়ানটা একগুঁয়ে, ঘোড়াগুলো গেঁতো — এর সব দোষ ডাকবাবুর। তারই হতভাগ্য ঘরখানায় এসে উঠে যাত্রীরা তাকেই গণ্য করছে শত্রু বলে। অনিমন্ত্রিত এই অতিথিদের কবল থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পেলে সে তার সৌভাগ্য। আর যদি ঘটনাচক্রে সে সময় ঘোড়া মজুত না থাকে?.. হায় ভগবান, তা হলে সে কী গালাগালি তর্জনগর্জনের পালা! বৃষ্টি হোক কাদা হোক এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি করে বেড়াতে সে বাধ্য। ক্ষিপ্ত

যাত্রীর চিৎকার আর ঘাড় ধাক্কা থেকে ক্ষণেকের মুক্তির জন্যে তাকে হয়ত বড়োদিনের তুষার-পাত আর ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেই গিয়ে দাঁড়াতে হবে বাইরের খোলা বারান্দায়। হয়ত এলেন এক জেনারেল, কম্পমান ডাকবাবুকে তার শেষ দুটো ত্রয়কাও ছেড়ে দিতে হল — অথচ ওর একটা ছিল ডাকগাড়ির জন্যে রিজার্ভ করা। মৌখিক একটু ধন্যবাদ পর্যন্ত না দিয়ে জেনারেল চলে গেলেন। আর তার পাঁচ মিনিট পরেই শোনা গেল ঘণ্টার শব্দ — সরকারী হরকরা এসে টেবিলের ওপর হুকুম-নামা ফেলে দিয়ে তাজা ঘোড়ার চাহিদা জানিয়ে বসল!.. এই সব ঘটনাগুলো ভালো করে ভেবে দেখলে ক্রোধের বদলে হৃদয় ভরে উঠবে অকৃত্রিম সহানুভূতিতে। তা ছাড়া আরো কয়েকটা কথা বলি। কুড়ি বছর ধরে আমি রাশিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রায় সব ক'টি ডাক-রাস্তা আমার চেনা। কোচোয়ানদের কয়েক পুরুষের সঙ্গে আমার পরিচয়। আমি চিনি না কিংবা সংশ্রবে আসি নি এমন ডাকবাবু নেই বললেই হয়। আমার এই সব সফরের সময় যে সব চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা যথাসত্বর প্রকাশ করার একটা আশাও আমার আছে। আপাতত এইটুকু বলি যে স্টেশনের ডাকবাবু এই সম্প্রদায়টা সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যে ধারণা সেটা খুবই ভুল। বহুনিন্দিত এই সব ডাকবাবুরা আসলে বেশ শান্তিপ্রিয় লোক, পরোপকারী তাঁদের স্বভাব, বেশ মিশুক ব্যবহার, নিজেদের মান মর্যাদা নিয়ে খুঁতখুঁতি নেই, আর টাকার খাঁইও খুব বেশি নয়। বেশ শিক্ষাপ্রদ এবং চিত্তাকর্ষক বহু বিষয় তাদের কথাবার্তা থেকে আহরণ করা সম্ভব, (পরিব্রাজক মহাশয়েরা অযথাই এগুলি তাচ্ছিল্য করেন)। আমার কথা যদি বলেন, আমি বরং সরকারী কাজে ভ্রাম্যমাণ কোনো ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির রাজপুরুষের ভাষণ শোনার চাইতে এদের সঙ্গেই আলাপ করতে ভালোবাসি।

বুঝতেই পারেছেন, ডাকবাবু এই শ্রদ্ধেয় সম্প্রদায়টির মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছে। বলতে কি, এদের একজনের স্মৃতি আমার কাছে অতি মূল্যবান। ঘটনাচক্রে আমায় তার সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। সে কথা আমি এবার আমার দরদী পাঠকদের কাছে বলব।

১৮১৬ সালের মে মাসে আমাকে ক... গুবের্নিয়া দিয়ে যেতে হয়েছিল, সে পথটা এখন লুপ্ত হয়ে গেছে। আমি তখন ক্ষুদে এক

অফিসারের পদে ঢুকেছি, যেতে হয়েছিল ডাক-রাস্তা দিয়েই, আর পয়সা ছিল কেবল দুটি ঘোড়ার জন্যে। ফলে ডাকবাবুরা আমায় বিশেষ সম্ভ্রম দেখাত না। তাই আমার যা ন্যায্য প্রাপ্য বলে আমার ধারণা, তা আমাকে প্রায়ই আদায় করতে হত জোরজার করে। বয়স তখন কাঁচা, স্বভাবটাও ছিল একটু রগচটা। তাই যখন আমার ত্রয়কার জন্যে তৈরি রাখা ঘোড়া হঠাৎ কোনো এক বড়ো চাকুরিয়াকে দিয়ে দেওয়া হত তখন এই সব ডাকবাবুদের নীচতা ও কাপুরুষতা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলত। এটা গা-সহা করতে আমার ততদিনই লেগেছিল, যতদিন লেগেছিল লাট সায়েবের ভোজসভায় বিচক্ষণ ভৃত্যের খাদ্য পরিবেশনে আমার বাদ পড়াটা গা-সহা করে নিতে। আজকাল ও দুটো ব্যাপারই আমার কাছে অতি স্বাভাবিক বলে মনে হয়। কেননা পদমর্যাদার হিসেবে যারা ছোটো তারা বড়োকে মানবে এই নিয়মের বদলে যদি ধরা যাক মননশক্তির হিসেবে যারা ছোটো তারা তাদের চেয়ে বড়োদের মানবে এই নিয়ম চালু করা যায় তা হলে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে? কী ভয়ানক তর্কই না শুরু হয়ে যাবে! চাকর-বাকরেরাই বা কাকে পরিবেশনের সময়ে তোয়াজ করবে প্রথম? কিন্তু সে কথা যাক, কাহিনীতে ফিরে আসি।

সেদিন বেশ গরম পড়েছিল। ক... ডাক-স্টেশনটায় পেঁছিতে তখনো তিন ভার্স্ট পথ বাকি, এমন সময় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে শুরু করল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ঝমঝম বৃষ্টিতে ভিজে চবচবে হয়ে গেলাম। ডাক-স্টেশনটায় পেঁছে আমার প্রথম কাজ হল যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পোশাক বদলে ফেলা এবং দ্বিতীয় কাজ চায়ের হুকুম করা। ডাকবাবু হাঁক দিল, 'এই, দুনিয়া, সামোভারটায় আগুন দে তো, আর গিয়ে খানিকটা ক্রীম জোগাড় করে আন।' জবাবে পার্টিশন দেয়ালের ওপাশ থেকে বছর চোদ্দ বয়সের একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে ছুটে গেল বাইরের বারান্দার দিকে। মেয়েটির রূপ দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ও কে, তোমার মেয়ে?' বেশ অহঙ্কারের সুরে ডাকবাবু বললে, 'হ্যাঁ, ভারি বুদ্ধিমতী, ভারি চটপটে — ঠিক ওর পরলোকগত মায়ের মতো।' লোকটা আমার অর্ডার টুকে নিতে শুরু করলে, আর আমি তার অনাড়ম্বর কিন্তু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানার দেয়ালে-টাঙানো ছবিগুলো দেখতে

শুরু করলাম। ছবিগুলোতে 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে একজন শ্রদ্ধাভাজন বৃদ্ধকে। মাথায় তার রাতের টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। একটি অস্থিরমতি যুবককে তিনি বিদায় দিচ্ছেন। যুবকটি তাড়াহুড়ো করে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ আর একটি টাকার থলি গ্রহণ করছে। পরের ছবিতে খুব জাজ্বল্যমান করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুবকটির স্খলিত চরিত্রের কথা। পানভোজনের টেবিলের সামনে সে বসে আছে আর তার চারিপাশ ঘিরে আছে কপট বন্ধু ও লজ্জাহীনা নারীর দল। এর পরে রয়েছে যুবকটির সর্বনাশ ঘটার ছবি — পরনে ছেঁড়া-ছেঁড়া পোশাক, মাথায় তেকোণা টুপি, শুয়োর চরাচ্ছে আর ওই শুয়োরের খাদ্যই ভাগ করে খাচ্ছে। মুখে তার গভীর বিষাদ ও অনুশোচনার ছাপ। শেষ ছবিখানায় দেখা যাচ্ছে সে বাপের কাছে ফিরে এসেছে, সহৃদয় বৃদ্ধ মানুষটির মাথায় এবারেও সেই রাতের টুপি, গায়ে ড্রেসিং গাউন। তিনি ছুটে এসেছেন তাকে গ্রহণ করতে। কুপুত্র তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসেছে — পেছনে দেখা যাচ্ছে বাবুর্চি একটি মোটাসোটা গোবৎস জবাই করছে আর যুবকটির বড়ো ভাই চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস করছে ধুমধামের কারণটা কী? প্রত্যেকটি ছবির নিচেই সভ্যভব্য সব জার্মান ছড়াও বেশ পাঠ করা গেল। এর সবটাই এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে — মনে আছে সেই দোপাটী ফুলের ভাঁড়গুলো, রঙচঙে পর্দা ঢাকা বিছানাটা, আমার চারপাশে যত কিছু জিনিস ছিল সব। গৃহকর্তাটির মূর্তি এখনো আমার চোখে ভাসছে — স্বাস্থ্যবান, ফুর্তিবাজ, বছর পঞ্চাশেক বয়স, গায়ে একটা লম্বা সবুজ জোব্বা, তাতে বিবর্ণ ফিতেয় লটকানো তিনটি মেডেল।

আমার বৃদ্ধ কোচোয়ানকে পাওনা মিটিয়ে দিতে না দিতেই দুনিয়া ফিরে এল তার সামোভার নিয়ে। কিশোরী এই লাস্যময়ীর বুঝতে দেরি হয় নি কী রকম সে ছাপ ফেলেছে আমার মনে। আমাকে দেখে সে তার বড়ো বড়ো নীল চোখদুটো নামিয়ে নিলে। তার সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলাম আমি — সে একটুও সংকোচ না করে জবাব দিয়ে গেল সংসারাভিজ্ঞা মেয়ের মতো। দুনিয়ার বাপের দিকে আমি এক গ্লাস মদের পাঞ্চ এগিয়ে দিলাম — দুনিয়ার জন্যে এগিয়ে দিলাম এক কাপ চা। তারপর তিনজনে

কথা কইতে শুরু করলাম যেন কত কাল থেকে আমাদের জানাশোনা।

অনেক আগেই ঘোড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাকবাবু আর তার মেয়েটিকে ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। তবু একসময় উঠতে হল। বাপ শুভযাত্রা কামনা করলে, মেয়ে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে এল। বার-বারান্দায় এসে আমি একটু দাঁড়ালাম, চুমু খাওয়ার অনুমতি চাইলাম। দুনিয়া আপত্তি করলে না...

যেদিন থেকে নেমেছি এই পথে

সেদিন থেকে অনেক চুম্বনই আমি পেয়েছি। কিন্তু তার কোনটার স্মৃতিই এমন দীর্ঘ, এমন মধুর হয়ে থাকে নি।

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ঘটনাচক্রে আবার আমাকে সেই একই পথ দিয়ে সেই একই সব জায়গায় যেতে হয়েছিল। বুড়ো ডাকবাবুর মেয়েটির কথা আমার মনে ছিল। তাকে আবার দেখা যাবে এই কল্পনায় খুশি হয়ে উঠেছিল মনটা। কিন্তু মনে হল, হয়ত বুড়ো ডাকবাবুর জায়গায় এখন অন্য কেউ এসেছে, ইতিমধ্যে দুনিয়ার বিয়েও হয়ে গেছে নিশ্চয়। ওদের কেউ একজন হয়ত বা বেঁচেই নেই — এ কথাটাও আমার মনে উঁকি দিয়ে গেল আর ডাক-স্টেশনের দিকে যত এগুতে লাগলাম ততই নানা আশঙ্কায় মন হয়ে উঠছিল বিষণ্ণ।

ঘোড়াগুলো এসে ডাক-বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর ঢুকতেই নজরে পড়ল সেই 'কুপুত্রের কাহিনী' বর্ণনা করা ছবিগুলো। টেবিল আর বিছানাটা সেই পুরনো জায়গাটিতেই আছে। কিন্তু জানলায় এবার আর কোনো ফুল দেখা গেল না। ঘরের সব কিছুতেই কেমন একটা জীর্ণতা আর অবহেলার ছাপ। ডাকবাবু একটি ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমার আগমনে ঘুম ভেঙে উঠে বসল... হ্যাঁ, সাম্‌সন ভিরিনই বটে, কিন্তু কী ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে লোকটা! ও যখন আমার অর্ডার নকল করে নিচ্ছিল তখন ওর পাকা চুল, না-কামানো গালের ওপর গভীর ভাঁজ, আর কুঁজো হয়ে আসা পিঠের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না, অমন হৃষ্টপুষ্ট একটা মানুষ এই তিন-চার বছরেই এমন

বোল্‌দিনো গ্রাম। নিজনি নভ্‌গরদ গুবের্নিয়ায় কবির পৈতৃক সম্পত্তি।

বোল্‌দিনো গ্রামের পরিপার্শ্ব। 'লুচিন্নিক' বন, পুশকিন এখানে বেড়াতে ভালোবাসতেন।

পুশকিনের আঁকা ছবি সমেত 'কফিনওয়ালা' গল্পের পাণ্ডুলিপি। ১৮৩০
মুচি গট্‌লিব শুলট্‌স আর কফিনওয়ালা আদ্রিয়ান প্রোখোরভের চা পান।

পুশকিনের আঁকা ছবি সমেত 'কফিনওয়ালা'
গল্পের পাণ্ডুলিপি। ১৮৩০ — 'সৎকার'।

পিটারবর্গ। অস্ত্রাগার। লিথোগ্রাফ। ১৮৩০-এর দশক

নাতালিয়া গলিৎসিনা (১৭৪১-১৮৩৭) — বড়োলাট দ্‌মিত্রি গলিৎসিনের জননী। উচ্চ সমাজের অতি স্বকীয় ধরনের এক ব্যক্তি, উপনাম জুটেছিল 'Princess Moustache' (গুঁপো প্রিন্সেস)। 'ইস্কাপনের বিবি' উপন্যাসে বৃদ্ধা কাউন্টেসের চরিত্র অংকনে পুশকিন তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি কাজে লাগিয়েছিলেন। মিনিয়েচার। ১৮১০-এর দশক

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ হয়ে গেল কী করে! 'আমায় চিনতে পারছ না?' আমি বললাম, 'আমরা পুরনো আলাপী।' ও বিমর্ষভাবে বললে, 'তা খুবই সম্ভব। রাস্তাটা বড়ো, অনেক যাত্রীই এখানে আসে।' বললাম, 'তা তোমার দুনিয়া ভালো আছে তো?' বুড়ো মানুষটা ভ্রূকুটি করলে, বললে, 'ভগবান জানেন।' 'ওর বিয়ে হয়ে গেছে তাহলে?' বুড়ো লোকটা ভাব দেখালে যেন আমার কথা সে শুনতে পায় নি। বিড়বিড় করে আমার অর্ডারখানা পড়ে যেতে লাগল। সুতরাং প্রশ্ন করা বন্ধ রেখে কেটলিটা চাপাতে হুকুম দেওয়া গেল। কৌতূহল আমায় খোঁচা মারছিল। আশা করলাম এক গ্লাস পাঞ্চ দিয়ে আমার পুরনো বন্ধুর মুখ খোলা যাবে।

আশাটা ভুল হয় নি। এগিয়ে দেওয়া গ্লাসটাতে বুড়োর আপত্তি হল না। দেখা গেল 'রাম' টানতে টানতে ওর বিমর্ষ ভাবটা কেটে যাচ্ছে। দ্বিতীয় গ্লাসের শেষে সে কথা কইতে শুরু করলে। আমি কে তা চিনতে পারলে, অন্তত চিনতে পারার ভান করলে। অতঃপর তার কাছ থেকে যে কাহিনীটা শোনা গেল, তা যুগপৎ আমায় ভয়ানক রকমের আকৃষ্ট ও বিচলিত করে তুলেছিল।

ও শুরু করলে, 'তা হলে আমার দুনিয়াকে আপনি চিনতেন? কেই বা তাকে না চিনত! দুনিয়া! দুনিয়া রে! কী মেয়েই না সে ছিল! এখানে যেই এসেছে সেই ওর তারিফ করেছে। কেউ নিন্দে করে নি। জমিদার গিন্নিরা ওকে কত উপহারই না দিয়েছে, কেউ একটা রুমাল কেউ এক জোড়া দুল। জমিদার বাবুরা এলে খাবার-দাবারের অজুহাতে ইচ্ছে করেই দেরি করত, আসলে ওকে আরো কিছুক্ষণ দেখতে চাইত। যতই রাগ হোক না কেন, ওকে দেখা মাত্র রাগ জল হয়ে যেত — আমার সঙ্গে তারা কথা শুরু করত ভদ্রভাবে। বিশ্বাস করবেন না হয়ত — কিন্তু হরকরা আর সরকারী পিয়নরা পর্যন্ত আধ ঘণ্টাখানেক কথা কয়ে যেত ওর সঙ্গে। ওর দৌলতেই সংসার চলত। এটা পরিষ্কার করা, ওটা রান্না করা, সবই পরিপাটী। আর আমি এই বুড়ো বেকুব — দেখে আমার আর আশ মিটত না, আনন্দ আমার আর ধরত না। দুনিয়াকে ভালোবাসি নি তা তো নয়, ওকে মাথায় করে রাখতে চাই নি তা তো নয়। জীবনে ওর দুঃখ কষ্ট তো কিছু ছিল না! কিন্তু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে কি আর কেউ সর্বনাশ

ঠেকাতে পেরেছে? — কপাল খণ্ডাবে কে!' এই বলে ডাকবাবু সর্বনাশের বিশদ বিবরণ আমায় শোনালে।

তিন বছর আগে এক শীতের সন্ধ্যায় ডাকবাবু নতুন একটা খাতার ওপর রুল টানছে আর তার মেয়ে পার্টিশনের পেছনে বসে বসে নিজের জন্যে একটা পোশাক সেলাই করছে। এমন সময় একটি ত্রয়কা এসে থামল। ঘরে ঢুকল একজন যাত্রী। মাথায় তার একটা চের্কেসীয় টুপি, গায়ে একটা মিলিটারি গ্রেটকোট আর মোটা মাফলার। ঢুকেই সে ঘোড়ার তলব করলে। ঘোড়া তখন সব বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা শুনে যাত্রীটি তার গলার পর্দা চড়ালে, উঁচু করলে হাতের চাবুক। এ রকম ঘটনা দেখতে দুনিয়া অভ্যস্ত ছিল। ঠিক সেই মুহূর্তে পার্টিশনের পেছন থেকে ছুটে এসে সে মোলায়েমভাবে জিজ্ঞেস করলে উনি কিছু খাবেন কিনা। দুনিয়ার উদয়ে সচরাচর যা ঘটে এবারেও তাই ঘটল। যাত্রীটির রাগ পড়ে গেল। ঘোড়া না ফেরা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে রাজি হয়ে রাতের খাবারের ফরমাশ দিলে। ভেজা খসখসে ফারের টুপিটা খুললে, মাফলারটা খসালে আর গ্রেটকোটটা ছুঁড়ে ফেললে, দেখা গেল লোকটা ছিমছাম চেহারার একজন তরুণ ঘোড়সওয়ার অফিসার। মুখে তার ছোটো কালো একটু মোচ। ডাকবাবুর সংসারে সে বেশ জমে বসল, ডাকবাবু আর তার মেয়ের সঙ্গে খোশ-গল্প শুরু করে দিলে। রাতের খাবার দেওয়া হল। ইতিমধ্যে ঘোড়াও এসে গিয়েছিল। ডাকবাবু হুকুম দিলে ঘোড়াগুলোকে দানাপোনি দেবারও দরকার নেই। এখুনি তাদের ঐ যাত্রীটির স্লেজের সঙ্গে যুতে দিতে হবে। ঘরে ফিরে কিন্তু দেখা গেল যুবকটি প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় বেঞ্চের ওপর পড়ে আছে। লোকটার নাকি অসুস্থ বোধ হচ্ছে, মাথা ধরেছে, সফর করার মতো অবস্থা নয়... কী আর করা যায়? ডাকবাবু তার নিজের বিছানাটি ওর জন্যে ছেড়ে দিলে। ঠিক হল রোগী যদি সকালের মধ্যে ভালো হয়ে না ওঠে তাহলে স... শহর থেকে বৈদ্য ডেকে আনতে হবে।

পরের দিন ঘোড়সওয়ারটির অবস্থা আরো কাহিল হয়ে দাঁড়াল। ওর চাকর গেল ঘোড়া চেপে কাছের শহরটায় বৈদ্য ডেকে আনতে। ভিনিগারে রুমাল ভিজিয়ে দুনিয়া তার কপালে জলপটি দিয়ে বিছানার পাশে গিয়ে

বসল সেলাই নিয়ে। ডাকবাবু সামনে থাকলে রোগী শুধু উঃ আঃ করত, একটা কথাও প্রায় বলতে পারত না, যদিও কাপ দুয়েক কফি সে খেলে ঠিকই আর গোঙাতে গোঙাতেই ফরমাশ দিলে ডিনারের। দুনিয়া তার পাশ থেকে কখনো নড়ত না। মিনিটে মিনিটে লোকটার তেষ্টা পেত আর দুনিয়া তার জন্যে নিজের হাতে তৈরি করা এক-এক মগ লেমনেড এনে দিত। রোগী তা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে মগ ফেরত দেবার সময় প্রত্যেকবারই দুনিয়ার হাতটা নিজের দুর্বল মুঠিতে ধরে চাপ দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা বোঝাত। বৈদ্য এলেন ডিনারের সময়। তিনি রোগীর নাড়ী দেখলেন, রোগীর সঙ্গে কথা কইলেন জার্মান ভাষায়, তারপর রুশ ভাষায় জানালেন যে এখন রোগীর প্রয়োজন শুধু বিশ্রামের। দিন দুয়েকের মধ্যেই সে সফর করার মতো অবস্থায় ফিরে আসবে। ঘোড়সওয়ারটি তাঁকে ভিজিট বাবদ পঁচিশ রুবল শোধ দিয়ে ডিনারে নেমন্তন্ন করলে। বৈদ্য নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে আপত্তি করলেন না। তারপর দুজনে মিলে খেল পেট পুরে, এক বোতল মদ নিঃশেষ করলে আর বিদায় নিলে অতি বন্ধুর মতো।

আরো একদিন কাটল। ঘোড়সওয়ারটি পুরোপুরি ভালো হয়ে উঠল। ভারি খুশি দেখা গেল তাকে, অনবরত রহস্য তামাসা করলে কখনো দুনিয়ার সঙ্গে, কখনো ডাকবাবুর সঙ্গে, শিস দিয়ে গান গাইলে, অন্য যাত্রীদের সঙ্গে গল্প জমালে, লেজারে যাত্রীদের অর্ডার সব নিজেই টুকে রাখলে, লোকটাকে শেষ পর্যন্ত ভালোমানুষ ডাকবাবুর এতই পছন্দ হয়ে গেল যে তৃতীয় দিন সকালে এই অমায়িক অতিথিটিকে বিদায় দিতে কষ্ট হল তার। দিনটা ছিল রবিবার — দুনিয়া গির্জায় যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিল। ঘোড়সওয়ারটিকে ঠিক করে রাখা হয়েছে। তার থাকা-খাওয়ার বাবদ লোকটা ডাকবাবুকে ঢালাওভাবে বকশিস করে বিদায় নিলে। দুনিয়ার কাছেও সে বিদায় নিলে, প্রস্তাব করলে যাবার পথে দুনিয়াকে সে গির্জায় পৌঁছে দিয়ে যাবে, কারণ গির্জাটা ছিল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। মনে হল দুনিয়া একটু বিব্রত বোধ করছে... কিন্তু বাপ বললে, 'ভয় কী, হুজুর তো আর নেকড়ে নন। খেয়ে ফেলবেন না; তা গাড়ি করেই যা-না গির্জায়।' দুনিয়া স্লেজে উঠে লোকটার ঠিক পাশেই বসল। চাকরটি লাফিয়ে উঠল বক্স-সীটে। কোচোয়ান শিস দিলে, ঘোড়া ছুটল কদমে।

বেচারী ডাকবাবু কখনো ভেবে পায় নি কী করে সে তার দুনিয়াকে ও লোকটার সঙ্গে যেতে দিল, কী করে অমন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে, কী করে অমন বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল তার। আধ ঘণ্টাও কাটে নি, ডাকবাবুর বুকটা টনটন করতে শুরু করল। এমনই দুশ্চিন্তা পেয়ে বসল তাকে যে সে আর থাকতে পারল না, দুনিয়ার খোঁজ করতে গেল গির্জায়। গির্জার কাছে পেঁাছতে দেখা গেল লোকজন সব বেরিয়ে আসছে কিন্তু গির্জার দাওয়ায় বা আঙ্গিনায় কোথাও দুনিয়ার দেখা পাওয়া গেল না। গির্জার ভেতরেও সে ঢুকলে হন্তদন্ত হয়ে। পুরোহিত বেদী ছেড়ে চলে গেছে। সেক্সটন মোমবাতিগুলো নিবিয়ে দিতে শুরু করেছে, শুধু এক কোণে দুটি বুড়ির তখনো প্রার্থনা শেষ হয় নি। কিন্তু দুনিয়া নেই কোথাও। অভাগা বাপ শেষ পর্যন্ত সেক্সটনকেই জিজ্ঞেস করলে, দুনিয়া প্রার্থনায় এসেছিল কিনা। সেক্সটন জানালে সে আসে নি। ডাকবাবু যখন বাড়ি ফিরল তখন তাকে জ্যান্ত মানুষ বলে আর চেনা যায় না। তার শেষ আশা তখনো এই — দুনিয়া হয়ত তার এক কৈশরের লঘুচিত্ততায় পরের ডাক-ঘাঁটি পর্যন্ত উজিয়ে গিয়ে থাকবে, সেখানে তার ধর্ম-মা আছেন। যে গাড়িখানা দেওয়া হয়েছিল সেটা ফিরে না আসা পর্যন্ত ডাকবাবুকে দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে অপেক্ষা করতে হল। সারাদিন কেটে গেল, কোচোয়ান ফিরল না। অবশেষে রাতের দিকে সে ফিরল একা এবং একটু মত্ত অবস্থায়। যে সংবাদ সে দিলে তা মারাত্মক। 'পরের ডাক-ঘাঁটি থেকে দুনিয়া লোকটার সঙ্গেই কোথায় চলে গিয়েছে।'

বুড়ো মানুষটা এই দুর্বিপাক সইতে পারল না। সেই রাতেই সে বিছানা নিলে — সেই বিছানা যাতে ঠিক আগের দিন তরুণ প্রতারকটি শুয়েছিল। সব ব্যাপারটা মনে মনে খতিয়ে দেখে ডাকবাবুর এখন মনে হল অসুখের ঘটনাটা ছিল ভান। বেচারীর জ্বর বাড়তে লাগল হুহু করে, তাই তাকে স... শহরে নিয়ে যাওয়া হল। অন্য একজন ডাকবাবু তার জায়গায় বহাল হল সাময়িকভাবে। যে বৈদ্যটি সেই ঘোড়সওয়ারটিকে দেখেছিলেন তিনিই ডাকবাবুরও চিকিৎসা করলেন। তাঁর কাছ থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা গেল যে লোকটা নাকি বেশ সুস্থই ছিল, তখনই নাকি বৈদ্যটি তার বদ্ মতলব টের পেয়েছিলেন, কিন্তু ঘোড়সওয়ারটির

চাবুকের ভয়ে কাউকে কিছু বলেন নি। জার্মানটা সত্যি কথাই বলুক কিংবা নিতান্তই তার দূরদৃষ্টির বড়াই করে থাকুক, তাতে বেচারা রোগীর কোনো সান্ত্বনাই ছিল না। অসুখ সারা মাত্রই সে স... শহরের ডাক-কর্তৃপক্ষের কাছে দুমাসের ছুটির দরখাস্ত করলে এবং কাউকে কিছু না বলে মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল পায়ে হেঁটে। লেজার থেকে সে দেখে নিয়েছিল ক্যাপটেন মিন্‌স্কির গন্তব্য ছিল স্মলেন্‌স্ক থেকে পিটারবুর্গ। যে কোচোয়ান তাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে বললে দুনিয়া নাকি সারা রাস্তা কেঁদেছে, যদিও দেখে মনে হচ্ছিল সে গিয়েছে নিজের ইচ্ছেতেই। ডাকবাবু ভাবল, 'আমার হারিয়ে যাওয়া মেষশাবকটিকে হয়ত ফিরিয়েই আনব।' এই আশায় ডাকবাবু এসে পৌঁছল পিটারবুর্গে। সেখানে সে উঠল ইজ্‌মাইলভ রেজিমেণ্টে, অবসরপ্রাপ্ত এক নিম্ন-স্তরের অফিসারের ঘরে। এ লোকটি ছিল তারই আগের কালের এক সহযোদ্ধা। সেখান থেকে সে তার সন্ধান শুরু করলে। শিগ্‌গিরই খোঁজ পাওয়া গেল যে ক্যাপটেন মিন্‌স্কি পিটারবুর্গেই আছে — দেমুতভ্ পান্থনিবাসে নাকি তার আস্তানা। ডাকবাবু ঠিক করলে তার ওখানে গিয়ে হাজির হবে।

অতি প্রত্যুষে সে মিন্‌স্কির সদর ঘরে এসে অনুরোধ করলে হুজুরকে যেন খবর দেওয়া হয় যে একজন বৃদ্ধ সৈনিক তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। একটা সওয়ারী-বুট খোঁটায় লাগিয়ে চাকরটা সেটাকে পরিষ্কার করছিল। সে বললে, 'কর্তা ঘুমুচ্ছেন, এগারোটার আগে তিনি কারুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করেন না।' ডাকবাবু তখন চলে গেলেও ফিরে এল ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে। গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন, মাথায় একটা লাল ফেজ — মিন্‌স্কি নিজেই এসে তার সঙ্গে দেখা করলে। বললে, 'কী চাই ভাই তোমার?' বুড়োর বুকের ভেতরটা তখন টগবগ করছে, চোখ ছাপিয়ে জল আসছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে শুধু বললে, 'হুজুর, ভগবানের দোহাই, হুজুর দয়া করুন!..' মিন্‌স্কি তার দিকে একবার ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করে লাল হয়ে উঠল। তারপর তাকে হাতে ধরে নিজের আপিস-ঘরে নিয়ে গিয়ে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে। বুড়ো বলে চলল, 'হুজুর, কথায় বলে একবারের পতন, চিরকালের মতন। তবু অন্তত আমার বেচারী দুনিয়াকে

ফিরিয়ে দিন। তাকে নিয়ে আপনার যা আনন্দ করার তা তো করেছেন — মিছিমিছি তাকে আর মারবেন না।' যুবাপুরুষটি ভয়ানক থতমত খেয়ে বললে, 'যা ঘটেছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। তোমার প্রতি আমি অবিচার করেছি, আমায় ক্ষমা করো। তবে ভেবো না যে দুনিয়াকে ফেলে পালাব। ও সুখী হবে — তোমায় শপথ করে বলছি। তাকে নিয়ে তুমি কী করবে? আমায় সে ভালোবাসে। তার আগের জীবনের সঙ্গে সে আর খাপ খাবে না। যা ঘটে গেছে তা ভুলতে তুমিও প্যারবে না, সেও পারবে না।' তারপর ডাকবাবুর আস্তিনের মধ্যে কী একটা গুঁজে দিয়ে সে দরজা খুলে দিলে। ডাকবাবু ঠাহরও করতে পারলে না কখন সে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বহুক্ষণ সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত খেয়াল হল আস্তিনের মধ্যে কী এক গোছা কাগজ রয়েছে। জিনিসটা বার করতে দেখা গেল পাঁচ আর দশ-রুবলের কয়েকটা দলামোচড়া নোট। চোখ ছাপিয়ে আবার তার কান্না এল — ক্রোধের কান্না! নোটগুলো একটা দলা পাকিয়ে সে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলে, তারপর জুতোর গোড়ালি দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে চলে গেল সে... কয়েক পা যাবার পর দাঁড়িয়ে পড়ে আবার কী ভাবলে, তারপর... ফিরে এল... কিন্তু নোটগুলো তখন আর সেখানে নেই। বেশ সাজগোজ করা একটি যুবক ওকে দেখে ছুটে গেল একটা ছ্যাকরা গাড়ির দিকে এবং চটপট বসে হুকুম দিলে, 'চালাও!' তাকে অনুসরণ করার কোনো চেষ্টাই ডাকবাবু আর করলে না। ঠিক করল ডাক-স্টেশনেই ফিরে যাবে। কিন্তু তার আগে মাত্র একবারের জন্যে হলেও অভাগা দুনিয়াকে একবার দেখে যেতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে দিন দুই পরে সে আবার গেল মিন্স্কির কোয়ার্টারে। কিন্তু সেপাই চাকরটা কড়া গলায় জানিয়ে দিলে তার মনিব কারো সঙ্গেই দেখা করবে না। তারপর ঘাড় ধরে তাকে হলের বাইরে ঠেলে দিয়ে মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তারপর ফিরে গেল ডাকবাবু।

সেই দিনই সন্ধ্যায় সে শহিদ গির্জায় সাধারণ প্রার্থনার পর লিতেইনায়া স্ট্রিট ধরে ফিরছিল। এমন সময় একটা দামী গাড়ি তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাকবাবুর নজরে পড়ল তাতে মিন্স্কি বসে আছে। গাড়িটা

তিনতলা একটা বাড়ির সামনে দরজার মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল আর মিন্স্কি লাফ দিয়ে নামল বাড়িটার বার-বারান্দায়। একটা আশা ঝলক দিয়ে গেল ডাকবাবুর মনে। ফিরে এসে সে কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলে, 'কার গাড়ি ভাই এটা? মিন্স্কির নয় কি?' কোচোয়ান বললে, 'তারই বটে, কেন?' 'ব্যাপার হয়েছে কি, তোমার মনিব আমায় বলেছিলেন তাঁর দুনিয়ার কাছে একটা চিঠি পেঁছে দিতে। কিন্তু এই দুনিয়া কোথায় থাকে, সেই ঠিকানাটা ভুলে গেছি।' — 'সে কী? সে তো এখানেই থাকে, ঐ দোতলায়। কিন্তু চিঠি পেঁছাতে ভাই তোমার বড়ো দেরি হয়ে গেছে। মিন্স্কি নিজেই এসে হাজির হয়ে গিয়েছেন যে।' ডাকবাবুর বুকের মধ্যে দুর্বোধ একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বললে, 'দরকার আর নেই। পাত্তা মিলিয়ে দিলে সে জন্যে ধন্যবাদ। তবে আমার যা কাজ, তা করি।' এই বলে সে সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলে।

দরজা বন্ধ ছিল। ঘণ্টা দিয়ে সে ডাকলে। প্রতীক্ষার যন্ত্রণায় কয়েক সেকেন্ড তার কাটল। অবশেষে দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দ পাওয়া গেল, দরজা খুলল। সে জিজ্ঞেস করলে, 'আভদোতিয়া সাম্সনভ্না কি থাকেন এখানে?' অল্পবয়সী ঝিটি উত্তর দিলে, 'হ্যাঁ, থাকেন, কী দরকার?' কোনো কথার জবাব না দিয়ে ডাকবাবু ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে হলের ভেতরে। ঝি পেছন থেকে হাঁক দিলে, 'না, না, ভেতরে যাওয়া চলবে না! আভদোতিয়া সাম্সনভ্নার কাছে এখন অতিথি।' কিন্তু ডাকবাবু কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়েই গেল। প্রথম যে দুটি ঘর পড়ল তা অন্ধকার। কিন্তু তৃতীয় ঘরখানায় আলো জ্বলছে। খোলা দরজাটার কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল। অতি সুসজ্জিত ঘরখানার ভেতরে মিন্স্কি গভীর কী একটা চিন্তায় মগ্ন। দুনিয়া তার চেয়ারের হাতলে বসে আছে ঠিক ইংরেজী কায়দায় ট্যারচাভাবে ঘোড়ায় চাপার ভঙ্গিতে। সাজসজ্জায় তার ফ্যাশনের বেশ ঘটা। মিন্স্কির দিকে সে চেয়ে আছে স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে আর তার কোঁকড়ানো কালো চুলের গুচ্ছ নিয়ে জড়াচ্ছে তার জড়োয়া আঙুলে। বেচারী ডাকবাবু! মেয়েকে তার এত রূপসী সে আর কখনো দেখে নি। মুগ্ধের মতো সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। 'কে ওখানে?' মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলে দুনিয়া। ডাকবাবু চুপ করে রইল। জবাব

না পেয়ে দুনিয়া মুখ তুলে তাকালে... আর তারপর চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। ভয় পেয়ে মিন্স্কি দুনিয়াকে ধরে তোলার জন্যে যেতে গিয়ে হঠাৎ দেখল দরজায় বুড়ো ডাকবাবু দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়াকে ফেলে রেখে সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল তার দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাও তুমি? ডাকাতের মতো আমার পিছু নিয়েছ কেন বলো ত? নাকি খুন টুন করার ইচ্ছে? বেরোও এক্ষুনি!' তারপর সজোরে বুড়োর কোটের কলার ধরে টানতে টানতে সে তাকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিলে।

বুড়ো মানুষটা তার ডেরায় ফিরে এল। বন্ধুটি পরামর্শ দিলে নালিশ করতে। ডাকবাবু কী ভাবল খানিক, তারপর হাত নেড়ে ঠিক করলে কিছুই সে করবে না। দুদিন পরে পিটারবুর্গ ছেড়ে সে ফিরে এল তার ডাক-স্টেশনে। এসে বসল তার সেই পুরনো কাজেই। গল্প শেষ করে ডাকবাবু বললে, 'সেদিন থেকে আজ প্রায় তিন বছর — দুনিয়া আমার কাছ-ছাড়া। খবর নেই, সংবাদ নেই। ভগবান জানেন, মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি নেই। কী না ঘটতে পারে। পথ চলতি লম্পট মেয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে দিন কয়েক রেখে ভাগিয়ে দিলে এমন ঘটনা ত এই প্রথম ঘটল এমন নয়, এই শেষও নয়। পিটারবুর্গে এরকমের কাঁচা বয়সের বেকুফ মেয়ে কত! আজ হয়ত তারা সাটিন আর মখমলে সাজগোজ করছে। কাল দেখবেন চৌমাথার মোড়ে ঝাড়ু দিচ্ছে সর্বস্বান্ত কাঙাল ভিখিরিদের সঙ্গে। যখন মাঝে মাঝে মনে হয় কে জানে আমার দুনিয়াও হয়ত ঐ অবস্থায় গিয়ে পড়বে, তখন ইচ্ছে না থাকলেও পাপ চিন্তাই মনে আসে, ভাবি কবরেই যাক মেয়েটা...'

এই হল আমার বন্ধু বুড়ো ডাকবাবুর কাহিনী — সে কাহিনী বলতে গিয়ে বারবার তাকে থামতে হয়েছে চোখের জলে, দ্মিত্রিয়েভের সেই অপরূপ ব্যালাডের জেদী তেরেন্তিচের মতো সে-চোখের জল কোটের প্রান্ত দিয়ে বারবার যেভাবে সে মুছে নিচ্ছিল তা দেখবার মতো। এই চোখের জলের আংশিক একটা কারণ অবশ্যই আমার দেওয়া সেই পাঞ্চ — কাহিনী বলতে বলতে সে পাঁচ গ্লাস টেনেছিল। কিন্তু সে যাই হোক, তার কান্না আমার খুবই মর্ম স্পর্শ করে। তার কাছ থেকে বিদায় নেবার পর অনেকদিন

পর্যন্ত বুড়ো ডাকবাবুর কথা আমি ভুলতে পারি নি, অনেকদিন ধরেই মনে হয়েছে হতভাগিনী দুনিয়ার কথা...

কিছুদিন আগে ক... শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় এই পুরনো বন্ধুর কথা আবার মনে পড়েছিল। খবর পেলাম যে ডাক-স্টেশনটায় সে একচ্ছত্র ছিল সেটা আর নেই। 'বুড়ো ডাকবাবু কি এখনো বেঁচে আছে?' এ প্রশ্নের কেউ সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে পারলে না। ইচ্ছে হল একবার আগের সেই সব পরিচিত জায়গাগুলো দেখে আসি। ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ন... গাঁয়ের দিকে গাড়ি হাঁকালাম।

তখন শরৎকাল। ধূসর রঙের মেঘে আকাশ ছাওয়া — ফসল-কাটা খেত থেকে হিমেল বাতাস বইছে, লাল হলুদ ঝরা পাতা উড়িয়ে আনছে সঙ্গে করে। সূর্য ডোবার ঠিক আগেই গাঁখানায় এসে পেঁছিলাম এবং ডাক-ঘরের সামনে থামলাম। মোটামতো একটা মাগী এসে দাঁড়াল বার-বারান্দায় (একদিন এখানেই আমায় চুমু খেয়েছিল হতভাগিনী দুনিয়া)। আমার প্রশ্নের জবাবে মেয়েটি জানালে যে বুড়ো ডাকবাবু বছরখানেক আগে মারা গেছে, তার বাড়িতে এখন থাকে একজন শুঁড়ী, মেয়েটি আসলে সেই শুঁড়ীরই বৌ। আমার এতখানি আসা আর তার জন্যে সাত রুবল খরচাই সার হল দেখে আফসোস হচ্ছিল। শুঁড়ী-বৌকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মারা গেল, কী হয়েছিল?' মেয়েটা বললে, 'মদ খেয়েই গেছেন বাবু।' 'কোথায় তাকে কবর দেওয়া হয়েছে?' 'গাঁয়ের ঠিক শেষে — ওর বউয়ের কবরের পাশে।' 'আমায় কেউ তার কবরে একবার নিয়ে যেতে পারে?' 'তা কেন পারবে না। এই, ভান্‌কা! বেড়াল নিয়ে খুব হয়েছে, এবার এই ভদ্দরলোকটিকে একটু কবরখানায় নিয়ে যা। গিয়ে ডাকবাবুর কবরটা দেখিয়ে দিবি।'

ছেঁড়াখোঁড়া জামা-পরা, পাটকিলে চুল, একচোখ কাণা একটা ছেলে ছুটে এসেই চটপট পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল গাঁয়ের শেষ প্রান্তে।

যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি ডাকবাবুকে চিনতে?'

'চিনব না কেন! ওই তো আমায় বাঁশি বানাতে শিখিয়েছিল। যেই সে শুঁড়িখানা থেকে বেরুত — ভগবান তার আত্মার মঙ্গল করুন — অমনি আমরা তার পেছনে ছুটতাম, 'দাদু, ও দাদু, বাদাম দাদু!' আমাদের সকলকে

সে বাদাম বিলাত। আমাদের সঙ্গে ভারি ভাব ছিল তার।'

'আচ্ছা, যাত্রীরা তার খোঁজ খবর করে এখনো?'

'আজকাল যাত্রী তো আর বিশেষ আসে না। হাকিম মাঝে মধ্যে আসে, কিন্তু মরা লোকেদের নিয়ে তার কোনো গরজ নেই। তবে এই বছর গরমকালে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। তিনি বুড়ো ডাকবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, তার কবর দেখতেও এসেছিলেন।'

কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রকম মহিলা?'

ছেলেটা বললে, 'ভারি সুন্দর দেখতে। ছয়-ঘোড়ার এক গাড়িতে করে উনি এসেছিলেন। সঙ্গে তিনটে বাচ্চা, একজন আয়া, আর একটা কালো বাঁটকুল কুকুর। যেই শুনলে বুড়ো ডাকবাবু মরে গেছে, অমনি কী তার কান্না. ছেলেমেয়েদের বললেন, 'তোরা চুপ করে একটু বসে থাক, আমি কবরখানায় যাব।' পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার ডাক পড়েছিল আমার। কিন্তু উনি বললেন, 'পথ আমি চিনি।' ভারি দরাজ মেয়ে — আমায় পাঁচ কোপেকের চাঁদি সিক্কা দিয়েছিলেন একটা।'

কবরখানায় পৌঁছানো গেল। ন্যাড়া একটা জায়গা — কোথাও এতটুকু বেড়া নেই। এখানে ওখানে কাঠের ক্রুশ — গাছের কোনো চাঁদোয়াও নেই তাদের ওপর। এমন বিষন্ন একটা কবরখানা আমি জীবনে কখনো দেখি নি।

ছেলেটা একটা বালির ঢিপির ওপর লাফিয়ে উঠে বললে, 'এই হল বুড়ো ডাকবাবুর কবর।' ঢিবিটার ওপর পেতলের মূর্তি লটকানো কালো একটি ক্রুশ পুঁতে রাখা হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, এইখানেই এসেছিলেন মহিলাটি?'

ভান্‌কা বললে, 'হ্যাঁ, এসেছিলেন। আমি দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। এসে লুটিয়ে পড়লেন এখানে, পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ। তারপর মহিলাটি গাঁয়ে ফিরে এসে পাদ্‌রিকে ডেকে পাঠান, টাকা-পয়সা দেন তাকে আর আমাকে দেন পাঁচ কোপেকের একটা চাঁদি সিক্কা — ভারি চমৎকার মহিলা!'

আমিও ছোঁড়াটাকে একটা পাঁচ-কোপেকী সিক্কা দিলাম। এখানে আসা বা তার জন্যে যে সাত রুবল খরচা হল — তাতে আমার আর কোনো আফসোস ছিল না।

বাবুর মেয়ে, চাষীর মেয়ে

যে সাজেই সাজো, ওগো প্রিয়তমা, সবেতেই সুন্দরী।

বোগদানোভিচ।*

ইভান পেত্রোভিচ বেরেস্তভের জমিদারিটা ছিল আমাদের দেশের সুদূরগম্য একটি প্রদেশে। যৌবনে ইভান পেত্রোভিচ কাজ নিয়েছিলেন রাজকীয় রক্ষী-বাহিনীতে। তারপর ১৭৯৭ সালের প্রথম দিকে কাজ থেকে ছাড় নিয়ে তাঁর জমিদারিতে গিয়ে সেই যে বাস শুরু করেন আর নড়েন নি। বিয়ে করেছিলেন একটি অভিজাত ঘরের গরিব মেয়েকে। মেয়েটি প্রসব করতে গিয়ে মারা যায়। বেরেস্তভ সে সময় উপস্থিতও থাকতে পারেন নি — শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। স্ত্রী-বিয়োগের সান্ত্বনা খুঁজতে বেরেস্তভ অতঃপর তাঁর সম্পত্তি দেখা শোনার কাজে ডুবে যান। বাড়িখানি তৈরি করলেন নিজের বানানো এক প্ল্যান মাফিক, জমিদারির মধ্যে একটি সুতাকল বসালেন, আয় তিনগুণ বাড়িয়ে তুললেন এবং সারা জেলার মধ্যে বিজ্ঞতম ব্যক্তি বলে নিজেকে গণ্য করতে শুরু করলেন। তাঁর এ ধারণায় বাদ সাধার ইচ্ছে প্রতিবেশীদের কারো হয় নি, — পরিবার পরিজন আর শিকারী কুকুর সমভিব্যাহারে তারা বেরেস্তভের বাড়ি এসে বেশ কিছুদিন করে কাটিয়ে যাবার অভ্যেস রপ্ত করে নিয়েছিল। রবিবার ছাড়া সপ্তাহের বাকি ছয়দিন বেরেস্তভের গায়ে থাকত একটা ভেলভেটিনের জ্যাকেট, ছুটির দিনগুলোতে তিনি পরতেন ঘরে-বোনা কাপড়ের ফ্রককোট। হিসেব পত্তর সব নিজেই রাখতেন এবং 'সিনেটের কার্যবিবরণী' ছাড়া আর কিছুই পাঠ করতেন না। মোটের ওপর লোকে তাঁকে অহংকারী বলে মনে করলেও বেশ পছন্দই করত। তাঁর সঙ্গে বনত না এমন লোক ছিল শুধু একজন — তাঁরই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী গ্রিগোরি ইভানভিচ মুরম্স্কি। তিনি ছিলেন আবার একেবারে

সাবেকী চালের এক রুশ ভদ্রলোক। সম্পত্তির বেশির ভাগটা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন মস্কোতে। তারপর বিপত্নীক হয়ে বসবাস করতে আসেন যে গ্রামটিতে, সেইটিই ছিল তাঁর সম্পত্তির একমাত্র অবশেষ। এখানেও তিনি তাঁর সম্পদ খোয়াতে থাকেন, যদিও একটু অন্যভাবে। বিলেতী কায়দায় তিনি একটি বাগান বসালেন এবং টাকা-পয়সা যা ছিল তার প্রায় সবটাই তিনি ঢাললেন এর পেছনে। তাঁর ঘোড়ার সহিসগুলোকে সাজ করতে হত বিলাতী জকিদের মতো করে। নিজের মেয়ের জন্যে বহাল ছিল ইংরেজ গৃহ-শিক্ষিকা। তাঁর জমিতে চাষও চালানো হত বিলেতী পদ্ধতি অনুসারে। কিন্তু,

যার কাজ তারে সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে... *

ফলে ব্যয়ের পরিমাণ কমে গেলেও গ্রিগোরি ইভানভিচের আয় কিন্তু বাড়ল না। এই মফস্বলের এলাকাতেও নতুন নতুন দেনা করে বসার মতো উপলক্ষ আবিষ্কার করতে তাঁর দেরি হয় নি। তবু সব মিলিয়ে তাঁকে বেশ একজন পাকা লোক গণ্য করা হত — এমন একজন জমিদার যার মাথা থেকে তাঁর প্রদেশে সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ জমিদারি-দপ্তরে সম্পত্তি বন্ধক রাখার মতলব বেরিয়েছে। এরকম মামলা সে যুগে বেশ জটিল এবং দুঃসাহসী বলে মনে করা হত। তাঁর সমালোচকদের মধ্যে সবচেয়ে কড়া সমালোচক ছিলেন বেরেস্তভ — নতুন কিছু একটা করা সম্পর্কে তাঁর ছিল ঘোর অপছন্দ। তাঁর এই প্রতিবেশীটির বিলিতিয়ানার কথা উঠলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না, খুঁত ধরায় তাঁর ক্লান্তি ছিল না। নিজের সম্পত্তি দেখিয়ে আনার সময় কেউ যখন তাঁর ব্যবস্থাপনার প্রশংসা শুরু করত, তখন ধূর্তের মতো বিদ্রূপ করে তিনি বলতেন, 'তবে, হ্যাঁ! আমাদের প্রতিবেশী গ্রিগোরি ইভানভিচ যেভাবে চালান, আমার এখানে সেভাবে আমরা চালাই না। বিলাতী কায়দার বালাই নিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনাটা ঠিক আমাদের পোষাবে না। আমাদের রুশিয়ার যা চল তাতেই যদি ভরপেট খাওয়া জোটে তো সেই আমাদের ভালো!' প্রতিবেশীদের উৎসাহে এই সব কথা আরো কিছু যোগ এবং ব্যাখ্যা সমেত গ্রিগোরি ইভানভিচের কানে উঠতে দেরি

হয় নি। আমাদের সাংবাদিকদের মতোই সমালোচনা সহ্য করার ক্ষমতা এই বিলেত-পাগল ভদ্রলোকটির বিশেষ ছিল না। ক্ষেপে গিয়ে তিনি আমাদের এই গ্রাম্য 'জয়লাস্'-এর* নাম দিয়েছিলেন পাড়াগেঁয়ে, ভালুক।

দুই মাতব্বরের মধ্যে যখন এই রকম একটা সম্পর্ক চলছে তখন বেরেস্তভের ছেলে এল বাড়িতে। ক... বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার পর তার ইচ্ছে ছিল পল্টনে ঢোকে, কিন্তু বাপের মত মিলল না। উল্টোদিকে, পুত্রের এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে সরকারি চাকরি করার পক্ষে সে একেবারেই অযোগ্য। দুজনের কেউই নিজের মত ছাড়তে রাজি হল না, এবং ইতিমধ্যে তরুণ আলেক্সেই বিশিষ্ট এক ভদ্রজনের মতো জীবন-যাপন করতে শুরু করলে, সেই সঙ্গে গোঁফের চর্চা চালিয়ে যেতে লাগল যাতে হঠাৎ পল্টনে যেতে হলে অসুবিধায় না পড়তে হয়।

আলেক্সেই ছিল সত্যিই চমৎকার এক তরুণ। তার সুঠাম দেহখানা যদি সামরিক ইউনিফর্মে সত্যিই শোভিত হতে না পারে, যদি একটা বেপরোয়া ঘোড়সওয়ার হিসেবে নাম কেনার বদলে সরকারি নথি-পত্তরের ওপর ঝুঁকে পড়েই তার যৌবন খরচ করতে হয় তবে সেটা নিশ্চয়ই দুঃখের কথা। শিকার করার সময় সে যখন প্রত্যেকবারই পথের কোনো বাধা না মেনে জোর কদমে সামনে এগিয়ে যেত, তখন পাড়াপড়শীরা একবাক্যে স্বীকার করত যে সরকারি চাকরিতে উন্নতি করা ওর কর্ম নয়। আশেপাশের যুবতী ললনাদের কাছ থেকে যে দৃষ্টিপাত তার ওপর বর্ষিত হত সেটা ঔৎসুক্য থেকে প্রায়ই গিয়ে পেঁছিত একেবারে আকর্ষণে; আলেক্সেই কিন্তু এসব বিশেষ নজরই করত না। তার এই নিরুত্তাপ আচরণের পিছনে নিশ্চয়ই কোনো একটা প্রেমের ব্যাপার আছে — এই রকম ধরে নেওয়া হয়েছিল। তারই প্রমাণস্বরূপ একটুকরো কাগজও একসময় হাতে হাতে ঘুরতে শুরু করেছিল। তাতে তার একটা চিঠি থেকে এই ঠিকানাটা টুকে রাখা ছিল: 'আকুলিনা পেত্রোভনা কুরচ্কিনা, মস্কো। সেণ্ট আলেক্সেই-এর মঠের সামনে কাঁসারি সাভেলিয়েভের বাড়ি। আ. ন. র-এর কাছে এই চিঠিটি পেঁছে দেবার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

আমার পাঠকদের মধ্যে যাঁরা কখনো গ্রামাঞ্চলে থাকেন নি তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না, মফস্বলের বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মধ্যে কী

মাধুর্য লুকোনো। বেড়ে ওঠে তারা তাজা হাওয়ার মধ্যে, ঘরোয়া আপেল বাগানের ছায়ায়। সমাজ-সংসার সম্পর্কে যা কিছু জ্ঞান তা কেবল বই পড়ে শেখা। নিরালা জীবন, স্বাধীনতার অবকাশ আর পাঠাভ্যাসের ফলে তাদের মধ্যে অল্প বয়সেই এমন সব ভাবালুতা আর হৃদয়াবেগের দেখা মেলে যা আমাদের শহরের সুন্দরী বিলাসিনীদের অজানা। আমাদের এই গ্রাম-কন্যাদের কাছে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পাওয়াই একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, পাশের শহরে বেড়িয়ে আসতে পারলে তো সেটা সারা জীবনের একটা স্মরণীয় ঘটনাই হয়ে থাকবে, আর বাড়িতে যারা বেড়াতে এসে কিছু কাল কাটিয়ে যায় তাদের কথা মনে করে রাখা হবে বহুদিন, কখনো কখনো চিরকাল। কিছু কিছু অসাধারণত্ব যা এদের মধ্যে দেখা যায় তা নিয়ে কেউ অবশ্য ঠাট্টা করতে পারেন, কিন্তু ওপর ওপর দেখে যতই টিটকারি দিন, তাতে এদের আসল গুণ কিছু নাকচ হয়ে যাবার নয়। তার মধ্যে প্রধানটাই হল 'চরিত্রের স্বকীয়তা' (individualité), সেই রকমের একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য যা নইলে, জাঁ পল-এর মতে মানবিক মহিমা থাকে না। হতে পারে যে বড়ো-বড়ো শহরে মেয়েরা যা শিক্ষা পায় তা উঁচু দরের। কিন্তু অভিজাত সমাজের অভ্যাসাদির ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মসৃণ হয়ে আসে চরিত্র, প্রাণগুলো হয়ে ওঠে তাদের শিরোভূষণের মতো সবই একরকম। এ কথা বলে আমি রায়ও দিচ্ছি না, নিন্দাও করতে চাইছি না, তবু, অতীতের এক লেখক যা বলেছেন সেইভাবেই বলতে হবে, nota nostra manet**।

যাই হোক, গাঁয়ের এই সব তরুণীদের মনে আলেক্সেই যে কী ভীষণ ছাপ ফেলল তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রথম তারা এমন একজনকে দেখল যে বিষণ্ণ এবং মোহমুক্ত। এই প্রথম তারা কারো কাছ থেকে বিগত আনন্দ আর ব্যর্থ যৌবনের কথা শুনতে পেল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা — আলেক্সেইয়ের হাতে যে আংটি আছে তার রঙটা কালো আর তাতে কঙ্কালের মুণ্ডু খোদাই করা। গ্রামাঞ্চলের পক্ষে এ সবই ভারি নতুন। আলেক্সেইকে নিয়ে সব ক'টি মেয়েই একেবারে পাগল হয়ে উঠল।

** আমাদের মন্তব্য বলবৎই রইল। (লাতিন)

তবে আলেক্সেই সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি করে যে মাথা ঘামিয়েছিল, সে আর কেউ না, ঐ বিলেত-পাগলের মেয়ে লিজা, অর্থাৎ বেট্‌সি (বাপ তাকে এই নামেই সাধারণত ডাকে)। কর্তাদের মধ্যে পরস্পরের বাড়ি যাতায়াত ছিল না। তাই পাড়ার সব ক'টি তরুণীর মুখে যখন আলেক্সেই ছাড়া কথা নেই, তখনো লিজা তাকে দেখেই নি। লিজার বয়স তখন সতেরো। শ্যামল রঙের মুখখানায় ভারি একটা আকর্ষণ, কালো একজোড়া চোখে তা উদ্ভাসিত। একমাত্র সন্তান বলে সে স্বভাবতই একটু আদুরে এবং একটু দুষ্টু। ছটফটানি আর দুষ্টুমিতে তার বিরাম ছিল না, এবং তাতে বাপ খুশি হলেও একজন কিন্তু বড়োই হতাশ হয়ে পড়তেন। তিনি হলেন গৃহশিক্ষিকা মিস্ জ্যাক্‌সন — বয়স তাঁর চল্লিশ, আইবুড়ি, এনামেল-করা গাল, রঙ-করা ভুরু, প্রত্যেক ছয়মাস অন্তর আদ্যন্ত 'পামেলা' বইটি পড়িয়ে শেষ করতেন। এ সবের জন্যে বছরে পেতেন দুই হাজার রুব্‌ল, এবং এই 'বর্বর রুশ দেশের' একঘেয়েমিতে মরে থাকতেন বললেই হয়।

লিজার পরিচর্যার ভার ছিল তার দাসী নাস্‌তিয়ার ওপর, বয়সে সে তার তরুণী প্রভুকন্যার চেয়ে কিছু বড়ো, কিন্তু স্বভাবে সমান চঞ্চল। লিজার সঙ্গে তার ভাবও খুব, নিজের সব কিছু গোপন খবর লিজা তাকে জানাত, দুষ্টুমির চক্রান্তে তার কাছ থেকেও সাহায্য নিত। মোট কথা, প্রিলুচিনো গ্রামের পক্ষে নাস্‌তিয়ার যা গুরুত্ব তা বিয়োগান্ত ফরাসী উপন্যাসের যে কোনো 'সখি' চরিত্রের চেয়েই ঢের বেশি।

সেই নাস্‌তিয়া একদিন সকালে তার দিদিমণির সাজগোজ ঠিক করে দিয়ে বললে, 'আজ একটু বেড়াতে যাব দিদিমণি।'

'যা না, কিন্তু কোথায়?'

'বেরেস্তভ-বাড়িতে তুগিলভোর কাছে। আজ ওদের রাঁধুনি বউয়ের জন্মতিথি। গতকাল রাঁধুনি বউ এসে আমাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে গেছে।'

'যাবি বৈকি! মনিবে মনিবে ঝগড়া, কিন্তু চাকর-বাকরদের মধ্যে যে বড়ো নেমন্তন্নের চল!'

নাস্‌তিয়াও সমানে জবাব দিল, 'মনিবদের ঝগড়া তো আমাদের কী? তা ছাড়া আমি তোমার চাকরানি, তোমার বাবার তো নই। তোমার সঙ্গে

তো এখনো বেরেস্তভ-পুতের ঝগড়া বাধে নি! কর্তাদের লড়াই কর্তারা নিজেরা লড়ে শেষ করুন! আমরা কেন?'

'শোন নাস্তিয়া, দেখিস তো আলেক্সেই বেরেস্তভকে দেখতে পাস কিনা। ফিরে এসে বলতে হবে কিন্তু কেমন দেখতে, কী রকম লোক।'

নাস্তিয়া সায় দিয়ে চলে গেল। আর সারা দিন অস্থির হয়ে লিজা অপেক্ষা করে রইল কখন সে ফিরে। নাস্তিয়া ফিরল একেবারে সন্ধের সময়।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বললে, 'বেরেস্তভ-পুতকে দেখে এলাম গো লিজাভেতা গ্রিগোরিয়েভ্না, ভালো মতো নজর করে দেখেছি। সারা দিন তো ওর সঙ্গেই ছিলাম।'

'তাই নাকি? কী দেখলি বল, বল শিগ্গির আগাগোড়া সব।'

'বলছি দাঁড়াও। আমরা সবাই তো ওখানে গেলাম — আমি, আনিসিয়া ইয়েগোরভ্না, নেনিলা, দুনিয়া...'

'ও সব কথা ছাড় বাপু, তারপর কী হল বল!'

'একেবারে প্রথম থেকে বলি শোনো। তা আমরা তো গিয়ে পেঁছলাম ঠিক সেই খাবার সময়। ঘর ভর্তি লোক। কোলবিনো, জাখারিয়েভো চাকরেরা এসেছে আর মেয়েদের নিয়ে মহালের গোমস্তার বৌ এসেছে, খ্লুপিনো মহালের চাকরেরাও...'

'বেরেস্তভের কী দেখলি বল!'

'এই তো বলছি, দাঁড়াও খানিক। তারপরে তো আমরা টেবিলে খেতে বসলাম। গোমস্তার বউ বসল গিন্নির পাশে, আমি বসলাম গোমস্তা বউয়ের পাশে। গোমস্তার মেয়েগুলো ঠোঁট বাঁকাচ্ছিল, কিন্তু আমি তার থোড়াই পরোয়া করি...'

'আ মোলো যা, নাস্তিয়া, তোর এই সাত সতেরো ফিরিস্তি রাখ তো বাপু!'

'অত অধৈর্য কেন গো! তা টেবিল ছেড়ে আমরা তো উঠলাম... খাওয়া চলেছিল তিন ঘণ্টা ধরে... বেশ ভালো খাইয়েছে... নীল লাল ডোরা-কাটা ব্লাঁ মঁজে কেক... তা আমরা তো উঠে বাগানের মধ্যে গেলাম চোর-চোর খেলতে। সেইখানে দাদাবাবু এসে হাজির।'

'তাই বুঝি? দেখতে সত্যিই খুব সুন্দর নাকি রে?'

'ভারি সুন্দর দেখতে, সত্যিকারের সুপুরুষ। সুঠাম, লম্বা চেহারা, লালচে গাল...'

'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই ফ্যাকাশে মতো হবে। তারপর দেখে মনে হল কী রকম? — মনমরা গোছের? সব সময় কিছু একটা ভাবে?'

'একেবারে না। এমন খেপা লোক আমি সারা জীবনে দেখি নি বাপু। খেয়াল হল আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে।'

'ও খেলবে তোদের সঙ্গে! হতে পারে না!'

'কিন্তু হল যে গো! আর শুধুই কি তাই — ওর কাছে কেউ ধরা পড়লেই হল, অমনি তাকে একটা করে চুমু না দিয়ে ছাড়ে নি।'

'যাঃ, বানিয়ে বানিয়ে বলছিস!'

'না গো না — ওর কবল ছাড়িয়ে আমি পালাতে পারলে তো! সারা দিনের মধ্যে ও একবারও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নি।'

'কিন্তু সকলেই যে বলে ও প্রেমে পড়েছে, অন্য কারো দিকে চোখ তুলে তাকায় না।'

'তা কী জানি বাপু, আমার পানে তো বড়ো বেশি তাকিয়েছিল, আর ঐ গোমস্তার মেয়ে তানিয়ার পানে। কোল্‌বিনোর পাশাকেও তো বাদ দেয় নি — বুঝে দেখো বাপু, পাজিটা আমাদের কাউকেই ছাড়ে নি!'

'আশ্চর্য তো! আচ্ছা, বাড়ির লোকেরা ওর সম্পর্কে কী ভাবে বল তো?'

'ওরা তো বলে নাকি ভারি চমৎকার ভদ্রলোক — ভারি দয়ামায়া, ফুর্তিবাজ। বদ স্বভাবের মধ্যে ওই মেয়ের পেছনে ঘোরা। তা আমার কথা যদি বলো, এতে তেমন দোষ আর কি? ও সব পরে কেটে যাবে।'

লিজার নিঃশ্বাস পড়ল, 'যদি একবার ওকে দেখতে পেতাম!'

'বা, তাতে এত ভাবনা কিসের। আমাদের এখান থেকে তুগিলভো খুব দূর হবে না — মাত্র তিন ভার্স্ট। হাঁটতে হাঁটতে নয়ত ঘোড়ায় চেপেই চলে যাও — নিশ্চয় দেখা পাবে। প্রত্যেকদিন খুব সকালে বন্দুক নিয়ে শিকার করতে সে ওই দিকে যায়।'

'উঁহু — ওতে হবে না! যদি ভাবে আমি তার পেছনে ধাওয়া করছি!

তা ছাড়া, আমাদের বাপেদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয় — না, কোনো রকমেই ওর সঙ্গে আলাপ করা সম্ভব নয়... নাস্তিয়া শোন, আচ্ছা, চাষী মেয়ের মতো সাজ করে যদি যাই?'

'সেই ভালো! ঘরে-বোনা ব্লাউজ পরো একটা, আর একটা সারাফান*, তারপর সোজা হেঁটে চলে যাও তুগিলভো। আমি বাজি রেখে বলছি, বেরেস্তভ তোমাকে নজর না করে পারবেই না।'

'গেঁয়ো টানে কথাও আমি চালাতে পারব খুব। উঃ, নাস্তিয়া, নাস্তিয়া রে! কী চমৎকার বুদ্ধি এসে গেছে মাথায়!' অতঃপর এই চমৎকার বুদ্ধিটি হাসিল করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে লিজা শুতে গেল।

পরদিন সকাল থেকেই তার কাজ শুরু হয়ে গেল — বাজারে কিনতে পাঠালে ঘরে-বোনা মোটা কাপড়, নীল রঙা ছিট, আর পেতলের বোতাম। নাস্তিয়ার সাহায্যে একটি ব্লাউজ আর একটি সারাফান কেটে ফেলা গেল, সব ক'টা চাকরানিকে সে লাগালে সেলাইয়ের কাজে আর সন্ধ্যের মধ্যে সব কিছু তৈরি হয়ে গেল। নতুন পোশাকখানা লিজা পরখ করে দেখলে। আয়নায় নিজের মূর্তির দিকে তাকিয়ে লিজা স্বীকার না করে পারল না যে এত সুশ্রী তাকে আর কিছুতে দেখায় নি। নিজের পার্টটুকু তৈরি করে রাখার জন্যে লিজা নিচু হয়ে মাথা নোয়ালে, মাটির খেলনা-বেড়ালগুলো যেমন করে মাথা নাড়ে তেমনিভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা দুলিয়ে চলা-ফেরা করলে, স্থানীয় গ্রাম্য টান দিয়ে কথা কইলে, হাসতে গিয়ে ব্লাউজের আস্তিন দিয়ে মুখ চাপা দিয়ে হাসলে এবং নাস্তিয়াকে দিয়ে তার সব কিছু হাবভাব মঞ্জুর করিয়ে নিল। মুশকিল হল শুধু তার খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে। নরম পায়ের নিচে ঘাসের চাপড়াগুলো বিঁধছিল আর কাঁকর বালি পায়ে ফুটছিল অসহ্য রকম। এ ব্যাপারেও নাস্তিয়া তাকে বাঁচালে। লিজার পায়ের মাপ নিয়ে সে ছুটে গেল মাঠের দিকে। সেখানে রাখাল ত্রফিম্‌কে পাকড়ে একজোড়া লাপ্তি* বানাবার হুকুম দিলে। পরদিন ভোর হবার আগেই লিজা জেগে উঠল। বাড়ির সকলে তখনো ঘুমিয়ে। ওদিকে নাস্তিয়া গিয়ে ফটকে অপেক্ষা করতে লাগল, ফটকের সামনে দিয়ে কখন রাখাল যায়। শিঙার ধ্বনি শোনা গেল — গাঁয়ের পশুপাল চলল জমিদার বাড়ির সামনে দিয়ে। যাওয়ার পথে ত্রফিম্ পঞ্চাশ কোপেক

দামে নিয়ে নাস্তিয়ার হাতে দিয়ে গেল একজোড়া ছোট্ট রঙচঙে লাপ্তি। তারপর নিঃশব্দে লিজা তার চাষী মেয়ের সাজে সেজে নিলে। মিস্ জ্যাক্সন সম্পর্কে কী করতে হবে তা নাস্তিয়ার কানে কানে জানিয়ে দিয়ে পিছ-বারান্দা দিয়ে নেমে সবজী-বাগানের মধ্যে দিয়ে সে সোজা দৌড়ল খোলা মাঠের দিকে।

পূবদিকের আকাশ তখন ফরসা হয়ে আসছে। মনে হল, সারি সারি সোনালী মেঘের স্তর সূর্যের জন্যে অপেক্ষা করছে, ঠিক যেন একদল সভাসদ্ দাঁড়িয়ে আছে কখন জার আসে। স্বচ্ছ আকাশ, ভোর বেলাকার তাজা আবহাওয়া, শিশির, বাতাস আর পাখির কাকলী মিলে লিজার মন ভরে উঠল ছেলেমানুষী খুশিতে। পাছে চেনা কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায় বলে সে যেন উড়ে যেতে চাইছিল। তার বাপের সম্পত্তির শেষ সীমানার বনভূমিটার কাছে এসে সে হাঁটায় ঢিল দিলে। এইখানেই আলেক্সেইয়ের আশায় অপেক্ষা করার কথা। বুকের মধ্যে তার ভয়ানক ঢিপঢিপ করতে শুরু করল, কেন কে জানে। কিন্তু তারুণ্যের অভিযানের মধ্যে এই বুক দুরদুরানিটুকু আছে বলেই তো তার এত আকর্ষণ। ছায়াচ্ছন্ন বনভূমির ভেতরে লিজা পা বাড়ালে। বনের ভেতর থেকে নানা রকম যে সব চাপা শব্দ উঠছিল তা কানে যেতেই অবশ্য তার খুশির ভাবটুকু উড়ে গিয়েছিল। পরে একটু একটু করে তার মন ভরে উঠল সুখের নানা চিন্তায়। লিজা ভাবছিল... কিন্তু এক বসন্তের দিনে ভোর পাঁচটা ছটার সময় সতেরো বছরের একটি মেয়ে বনের মধ্যে ঠিক কী যে ভাবছে তা কে-ই বা বলতে পারে। নিজের ভাবনায় বিভোর হয়ে লিজা যে পথ ধরে হাঁটছিল তার দুপাশ লম্বা লম্বা গাছে ঢাকা। হঠাৎ একটা চমৎকার শিকারী কুকুর ওর দিকে ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল। লিজা আঁতকে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন হাঁক দিলে: 'Tout beau, Sbogar, ici!'** তারপর ঝোপঝাড়গুলোর পেছন থেকে বেরিয়ে এল একটি শিকারী যুবক। লিজাকে সে বললে, 'ভয় নেই সুন্দরী, কুকুরটা আমার কামড়াবে না।' ইতিমধ্যে কিন্তু লিজার ভয় কেটে গিয়েছিল, আধা-ভয়, আধা-লজ্জার

** 'এই ফাজিল, স্বোগার, আয় এদিকে।' (ফরাসী)

ভান করে সুযোগ বুঝে সে জবাব দিলে, 'না গো বাবু ডরাইছি যে! দ্যাখো ক্যানে কেমন করছে, আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে যি।' চাষী মেয়েটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আলেক্সেই তাকিয়ে রইল (আগন্তুক লোকটি যে কে তা নিশ্চয়ই পাঠকেরা আন্দাজ করতে পেরেছেন)। তারপর বললে, 'ভয় পাচ্ছ যখন, তখন চলো তোমাকে এগিয়ে দিই। পাশাপাশি হাঁটলে আপত্তি নেই তো?' লিজা বললে, 'হাঁটলেই বা ঠেকাইছে কে বলো। রাস্তা তো আমার একলার নয়।' 'ঘর কোথা তোমার?' 'আসছি সেই প্রিলুচিনো গাঁ হতে। ভাসিলি কর্মকারের মেয়ে বটি, ব্যাঙের ছাতো তুলতে যেছি।' (লিজা তার চাঁচে-বোনা ঝুড়িটা দুলিয়ে দিল)। 'তা তুমি কে বটো গো? তুগিলভো গাঁয়ের লয়?' 'ঠিক ধরেছ। আমি হলুম ওই গাঁয়ের বাবুর বেটার পোশাক-বরদার।' আলেক্সেই ভেবেছিল মেয়েটির সমপর্যায়ে নেমে কথা বলাই ভালো। কিন্তু লিজা তার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। বললে, 'আজ্ঞা, তা লয় গো। আমাকে বুঝ দিবে সি হবে না। তুমি বাবুরই ছেলে বটো যি!' 'কিসে বুঝলে?' 'সব কুছুতেই বুঝা যাচ্ছে গো।' 'কিন্তু কি সে?' 'কেনে, কে মনিব কে চাকর তাই কি বলতে না পারা হয়? তোমার সাজ পোশাক ভিন্ন, কথাবার্তা ভিন্ন, আমরা যেমুনভাবে কুকুরকে ডাক দিই তো কই, তেমন করে তো তুমি ডাকলে নাকো।' লিজার রূপ আলেক্সেইকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছিল। সুন্দরী চাষী মেয়েদের সঙ্গে সৌজন্য রক্ষা করে চলার অভ্যেস আলেক্সেইকে রাখতে হয় নি। তাই সে অনায়াসে লিজার কোমর জড়িয়ে ধরতে গেল। কিন্তু ছিটকে পেছিয়ে এসে লিজা তার মুখের মধ্যে হঠাৎ এমন একটা গম্ভীর শাসানির ভাব ফুটিয়ে তুলল যে মজা লাগলেও আলেক্সেই আর বেশি এগুতে সাহস করলে না। লিজা কড়া করে বললে, 'আপনি যদি ভবিষ্যতে আমার বন্ধু থাকতে চান তাহলে আত্মবিস্মৃত হবেন না।' 'এমন ভাষায় কথা কওয়া কার কাছে শিখলে?' প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে, 'এ কি তোমাদের মনিব কন্যার ঝি আমার সই নাস্তিয়ার কাছ থেকে শেখা? শিক্ষা-দীক্ষা তাহলে আজকাল চারদিকেই বেশ ছড়িয়েছে।' লিজা টের পেল তার ভাষাটা ঠিক চরিত্রানুযায়ী হয় নি। তাই তাড়াতাড়ি করে তার অভিনীত ভূমিকায় ফিরে আসতে চেষ্টা করলে। বললে, 'হেই বাবু, কী

বলছ গো! বাবুর বাড়িতে আমরা যেতে পাই না ভাবছ? কত কী দেখি, কত কী শুনি। কিন্তু হেথাকে তোমার সাথে ডাঁড়িয়ে ডাঁড়িয়ে বকবক করলে ব্যাঙের ছাতা আমার তুল্য হবে না। তুমি তোমার পথ দেখো বাবু, আমিও আমার কাজে যাই। দন্ডবৎ!' লিজা যাবার উপক্রম করতেই আলেক্সেই তার হাত চেপে ধরে আটকালে। 'তোমার নামটা কী সুন্দরী?' 'আমার নাম বটে আকুলিনা।' আলেক্সেইয়ের মুঠো থেকে আঙুলগুলো খসিয়ে আনার চেষ্টা করতে করতে লিজা বললে, 'ছেড়ে দাও বাবু, বাড়ি যাবার সময় হয়ে গেল যি!' 'তাহলে সই আকুলিনা, অবশ্য-অবশ্যই তোমার বাবা ভাসিলি কর্মকারের বাড়ি যাব।' লিজা চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই বাবা গো! দোহাই তোমার, উ কাজটি করো নাকো। বাড়ির লুকে যদি জানতে পারে, ই বনের মধ্যে একলা একলা বাবুর সঙ্গে কথা কয়েছি তাইলে আমার হ'য়েছে, বাপ আমার পিটিয়ে হাড়মাস কালি করে ছাড়বে।' 'কিন্তু তোমার সঙ্গে যে দেখা করতেই হবে।' 'ব্যাঙের ছাতা তুলতে আমি ফের কখনো আসব হেথাকে।' 'কিন্তু কবে?' 'তা কি বলা যায় কখুনো? কালও হতে পারে।' 'মিষ্টি আকুলিনা, সাহস পাচ্ছি না নইলে তোমায় একটু চুমু খেতাম। কালই এসো, ঠিক এই সময়, এসো কিন্তু!' 'বেশ, আসব তাইলে।' 'ঠকাবে নাতো?' 'না, ঠকাব না।' 'দিব্যি করে বলো।' 'এই লাও — ধরমের দিব্যি, আসব।'

পরস্পরের কাছ থেকে ওরা বিদায় নিলে। বন থেকে বেরিয়ে এল লিজা। মাঠ পেরিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকেই সোজা ছুটল খামারবাড়ির দিকে — নাস্তিয়া সেখানে অপেক্ষা করছে। এখানে সে তার পোশাক বদলাতে বদলাতে 'সখির' উৎসুক প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে গেল অন্যমনস্কের মতো, তারপর হাজিরা দিতে গেল ড্রয়িং-রুমে। টেবিল সাজানো হয়ে গিয়েছিল, প্রাতরাশ প্রস্তুত, মিস্ জ্যাক্সন ইতিমধ্যেই পাউডারে শোভিত এবং ক্ষীণকটি পোশাকে সজ্জিত হয়ে পাঁউরুটির পাতলা চাকা কাটছিলেন। অত ভোরে লিজা বেড়াতে বেরিয়েছিল বলে লিজার বাবা তার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, 'ভোরে ওঠার মতো স্বাস্থ্যকর আর কিছু নেই।' তারপর বিলাতী পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, যারা একশ বছরেরও বেশি

বেঁচেছে তারা কেউ ভদ্‌কা ছোঁয় নি আর কি শীত, কি গ্রীষ্ম ভোরে উঠেছে। লিজার কানে কিন্তু এ সব বিশেষ ঢুকছিল না। মনে মনে সে তখন তার ভোর বেলাকার অভিসারের গোটা ঘটনাটা খতিয়ে খতিয়ে দেখছিল --- আকুলিনা আর শিকারী যুবকের মধ্যে যা কিছু কথা হয়েছে সব। ভাবতে গিয়ে বিবেকের একটা দংশন অনুভব করতে শুরু করেছিল সে। নিজেকে সে বোঝাবার চেষ্টা করছিল তাদের কথাবার্তা নিশ্চয়ই শোভনতার সীমা লঙ্ঘন করে নি, তার এই তামাসা থেকে কোনো রকম বিশ্রী পরিণতি দেখা দেবে না। কিন্তু যতই যুক্তি পাওয়া যাক বিবেক কিছুতেই মানছিল না। বিশেষ করে পরদিন দেখা করবে বলে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেইটেই তাকে খোঁচাচ্ছিল সবচেয়ে বেশি। ধর্মের নামে দেওয়া তার পবিত্র প্রতিশ্রুতিটা লিজা শেষ পর্যন্ত ভেঙেই বসত — হঠাৎ মনে হল আলেক্সেই হয়ত অপেক্ষা করে ওকে না পেয়ে আসল আকুলিনার সন্ধানে গাঁয়ের মধ্যে চলে যাবে, কর্মকারের মোটামতো ফুটকি-মুখী মেয়েটাকে দেখে লিজার চালাকি টের পেয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় ভয় পেয়ে সে ঠিক করলে, পরদিন আবার সে আকুলিনার বেশে বনভূমিতেই যাবে।

ওদিকে, আলেক্সেইয়ের মনের খুশিতে কিন্তু কোনো ছায়া ঘনায় নি। নতুন সখিটির কথা ছাড়া সারা দিন আর কোনো ভাবনা ছিল না তার। রাত্রে বারবার তার স্বপ্নে হানা দিয়ে গেল এক শ্যামলা রঙের রূপসীর মূর্তি। ভোর হতে না হতেই সে বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক পরে নিলে। বন্দুকে গুলি ভরে নেবারও তর সইল না, অনুগত কুকুর স্‌বোগারকে নিয়ে সে দ্রুত পা চালালে তার প্রতিশ্রুত সাক্ষাৎ-স্থলের দিকে। আধ ঘণ্টা কাটল তার অসহ্য এক প্রতীক্ষায়। অবশেষে ঝোপঝাড়ের আড়ালে একটি নীল সারাফান ভেসে উঠতেই সে ছুটে এগিয়ে গেল তার প্রিয়তমা আকুলিনার দিকে। লিজা তার সকৃতজ্ঞ সম্ভাষণের জবাবে হাসল বটে, কিন্তু মুখের ওপর যে বিমর্ষ উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তা আলেক্সেইয়ের দৃষ্টি এড়াল না। আলেক্সেই তার কারণ জিজ্ঞেস করলে। লিজা স্বীকার করে বললে, যে এখন তার মনে হচ্ছে তার আচরণ শোভন হয় নি, সে জন্যে তার অনুতাপ হচ্ছে। এবারেতেও সে কথার খেলাপ করতে চায় নি বটে, কিন্তু এই তাদের শেষ দেখা, লিজা মিনতি করলে যেন তাদের

এ পরিচয়ের অবসান হয় — এ থেকে কোনো মঙ্গল হবার নয়। বলাই বাহুল্য এ সব কথাই সে বলেছিল গেঁয়ো টানে কিন্তু সরল একটি গ্রাম্য মেয়ের পক্ষে ভারি অস্বাভাবিক এই সব ভাবনা দেখে আলেক্সেই খুব অবাক হয়ে গেল। ভাষার সব কিছু উচ্ছ্বাস দিয়ে সে আকুলিনাকে বোঝাতে শুরু করল যাতে সে তার মত বদলায়। আলেক্সেইয়ের অভিসন্ধির মধ্যে যে কোনো মালিন্য নেই তা নিশ্চয় করে সে জানালে, প্রতিজ্ঞা করলে এমন কিছুই সে করবে না যাতে আকুলিনাকে অনুতাপ করতে হয়, যে কোনো বিষয়ে তার প্রত্যেকটি কথাই সে মেনে চলবে, শুধু আকুলিনার সঙ্গে একলা দেখা হওয়ার আনন্দ থেকে সে যেন বঞ্চিত না হয়। বেশি না হলেও অন্তত একদিন বাদে একদিন, নয়ত সপ্তাহে মাত্র দুই দিন। আলেক্সেইয়ের কথার মধ্যে সত্যিকার হৃদয়াবেগ ছিল এবং সেই মুহূর্তে সত্যিই যেন সে আকুলিনার প্রেমে পড়েছে। লিজা চুপ করে তার কথা শুনলে। কথা শেষ হলে বললে, 'তেবে কথা দাও, গাঁয়ের মধ্যে কখনো আমাকে খুঁজতে যাবে না, আমার লেগে কাউকে কিছু শুধোইবে না? কথা দাও, আমি নিজে যা ঠিক করে দুব, উর বেশি আমার সাথে দেখা করতে চাইবে নাকো।' আলেক্সেই বলতে গিয়েছিল, 'পবিত্র ক্রুশের দিব্যি দিয়ে বলছি,' কিন্তু লিজা হেসে তাকে থামালে, 'দিব্যি দিতে হবে না গো — মুখের কথাটোই যথেষ্ট।' অতঃপর তাদের আলাপ চলল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঘুরে বেড়াল বনের মধ্যে। অবশেষে লিজা বললে, 'ইবার যেতে হবে যি।' বিদায়ের পর নিঃসঙ্গ আলেক্সেই ভেবে পেল না মাত্র দুবার দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই একটি সরল পল্লীবালা তার ওপর অমন নিঃসন্দেহ প্রভাব বিস্তার করতে পারে কী করে। আকুলিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে একটা অভিনবত্বের আকর্ষণ ছিল। আর এই বিচিত্র কৃষক-কন্যার অনুশাসনগুলো যদিও তার কাছে বেশ দুর্বিষহ বলে ঠেকছিল তবু যে কথা সে দিয়েছে তা খেলাপ করার চিন্তা তার মনে এল না একেবারেই। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ অশুভ আংটি, রহস্যময় চিঠি আর মোহমুক্তির ভান সত্ত্বেও আলেক্সেই হল নেহাৎই একটি সহৃদয় আবেগপ্রবণ তরুণ, অন্তঃকরণে তার এখনো কোনো বিকার স্পর্শ করে নি; নির্মল আনন্দের উপলক্ষ পেলে মেতে উঠতেও তার দেরি লাগে না।

শুধু নিজের ইচ্ছেটা পূরণ করতে হলে আমি এবার এই তরুণ-তরুণীদের অভিসার, তাদের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক অনুরাগ আর বিশ্বাস, তাদের ক্রিয়াকলাপ, কথাবার্তার বিশদ বিবরণ দিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু জানি, অধিকাংশ পাঠকই আমার এ ইচ্ছাপূরণ উপভোগ করতে প্রস্তুত নন। এই খুঁটিনাটিগুলো তাদের কাছে বড়ো বেশি মধুমাখা বলেই মনে হতে বাধ্য। তাই তা বাদ দিয়ে শুধু এইটুকু বলে রাখি যে দুমাস না পেরতেই আমাদের আলেক্সেই প্রেমে একেবারে পাগল, আর কথায় অতটা প্রকাশ না করলেও লিজার অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। বর্তমান তাই নিয়েই তাদের আনন্দ, ভবিষ্যতের কথা ভাবল সামান্যই।

অচ্ছেদ্য বন্ধনের কথাটা বারবারই মনে হয়েছে তাদের কিন্তু সেটা তারা কেউ কারো কাছে প্রকাশ করে নি। কেন, তা সহজেই অনুমেয়। প্রিয়তমা আকুলিনার প্রতি আলেক্সেইয়ের যত অনুরাগই থাক, একটি গরিব কৃষক মেয়ের সঙ্গে তার দূরত্ব যে কতখানি সে কথা আলেক্সেই ভালোই বুঝতে পারছিল, আর বাপেদের মধ্যে যে রকম বৈরিতা তা জানা থাকায় লিজারও ভরসা ছিল না ভবিষ্যতে এ কলহ আদৌ মিটবে কিনা। তা ছাড়া, ভেতরে ভেতরে একটা অস্পষ্ট রোমাণ্টিক কল্পনায় লিজার এই অহঙ্কার দানা বেঁধে উঠেছিল যে সে দেখবে তুগিলভোর উত্তরাধিকারী শেষ পর্যন্ত প্রিলুচিনো গাঁয়ের কর্মকার কন্যার পদতলে এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, ইতিমধ্যে কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল যাতে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় বদলাতে শুরু করল।

একদিন ঝকঝকে এক সকালের ঠাণ্ডায় (আমাদের রুশ শরৎকালে যা প্রায়ই দেখা যায়) ইভান পেত্রোভিচ বেরেস্তভ ঘোড়ায় চেপে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। যদি কিছু শিকার মিলে যায় এই ভেবে সঙ্গে নিয়েছিলেন পাঁচ-ছ'টি গ্রে হাউণ্ড, একজন সহিস আর আওয়াজ করার জন্যে কিছু ভূমিদাস ছোঁড়া। একই সময়ে চমৎকার আবহাওয়া দেখে গ্রিগোরি ইভানভিচ মুরম্স্কিও তাঁর ঘুড়ীটার ওপর জিন লাগাতে হুকুম দেন, এবং তাঁর বিলাতি কায়দার সম্পত্তির ওপর দিয়ে দুলকি-চালে চালিয়ে যেতে থাকেন। এইভাবে বনভূমিটার কাছে পেঁছতেই নজরে পড়ল তাঁর পড়শী জিনের ওপর সগর্বে খাড়া হয়ে বসে খরগোসের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গায়ে

তাঁর একটা শেয়াল-লোমের লাইনিং-দেওয়া জ্যাকেট। ছোঁড়াগুলো আওয়াজ করতে করতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খরগোস তাড়া দিয়ে আনছে। এ রকম একটা সাক্ষাৎ ঘটে যাবে টের পেলে গ্রিগোরি ইভানভিচ যে অন্য দিকে ঘোড়া চালাতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেরেস্তভের সামনাসামনি এসে পড়লেন তিনি একেবারে আচমকা — দেখা গেল বেরেস্তভের কাছ থেকে একেবারে সামান্য দূরে তিনি এসে পড়েছেন। আর কোনো উপায়ই নেই। সুতরাং শিক্ষিত এক ইউরোপীয়ের মতো মুরম্স্কি তাঁর শত্রুর কাছ পর্যন্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রতা করে অভিবাদন জানালেন। বেরেস্তভও অমায়িকভাবে এমন একটা প্রত্যভিবাদন দিলেন যেন একটা শেকল বাঁধা ভালুক তার মনিবের হুকুম শুনে 'বাবুদের' সেলাম জানাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তেই খরগোসটা বন থেকে লাফিয়ে পড়ে খোলা মাঠের দিকে ছুট দিল। বেরেস্তভ আর তার সহিস আপ্রাণ চিৎকারে হৈ-হৈ করে উঠে কুকুরগুলোকে লেলিয়ে দিলে এবং পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে খরগোসের পেছু নিল। মুরম্স্কির ঘোড়াটা কখনো শিকারে আসে নি। এ ব্যাপারে হঠাৎ চমকে গিয়ে সে ছুটতে শুরু করল। পাকা সওয়ারী বলে মুরম্স্কি নিজেকে জাহির করতেন। এই আকস্মিক ঘটনাটার ফলে একটি অপ্রীতিকর সাক্ষাৎকার থেকে রেহাই পাওয়া গেল ভেবে ভেতরে ভেতরে তিনি খুশি হয়ে ঘোড়াটাকে ছুটতে দিলেন তার আপন খেয়াল মতো। এদিকে সামনে ছিল একটা খাল — ঘোড়াটা তা আগে দেখতে পায় নি। ছুটতে ছুটতে খালটার সামনে এসে ঘোড়াটা হঠাৎ থমকে গেল। মুরম্স্কি টাল সামলাতে পারলেন না। শীতে জমাট মাটির ওপর মুরম্স্কি বেশ সজোরে আছাড় খেয়ে চিৎপাত দিয়ে পড়লেন আর ঘুড়ীটাকে শাপান্ত করতে লাগলেন। ঘুড়ীটা ইতিমধ্যে সওয়ারী নেই টের পাওয়া মাত্রই যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ইভান পেত্রোভিচ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, গ্রিগোরি ইভানভিচের লেগেছে কিনা। সহিসটিও ওদিকে অপরাধীকে পাকড়াও করে এনে লাগাম ধরে দাঁড়াল। সহিসের সাহায্যে মুরম্স্কি ঘোড়ায় উঠে বসলেন আবার। বেরেস্তভ তাঁকে বাড়ি আসার জন্যে নিমন্ত্রণ জানালেন — মুরম্স্কি গ্রহণ না করে পারলেন না, কৃতজ্ঞতা আছে তো। বেরেস্তভ এবার ফিরলেন বিজয়

গর্বে — একটি খরগোস ধরেছেন এবং তাঁর আহত শত্রুকে প্রায় এক যুদ্ধবন্দীর মতো করে নিয়ে চলেছেন বাড়িতে।

প্রাতরাশের টেবিলে দুই পড়শীর মধ্যে কথাবার্তা হল চমৎকার বন্ধুর মতো। মুরম্স্কি বেরেস্তভের কাছে স্বীকার করলেন যে আছাড় খাওয়ার ফলে ঘুড়ীটার ওপর চেপে বাড়ি ফেরা তার কুলোবে না। বেরেস্তভ যেন একখানা গাড়ি দেন। বেরেস্তভ তাঁকে বার-বারান্দা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলেন। মুরম্স্কিও বেরেস্তভের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি না নিয়ে ছাড়লেন না যে পরদিন আলেক্সেই ইভানভিচকে সঙ্গে নিয়ে উনি মুরম্স্কির ওখানে গিয়ে খানা খাবেন। দেখা গেল লেজ-বেঁড়ে এক মাদী ঘোড়া ভড়কে যাওয়ার ফলে দীর্ঘকালের এক সুগভীর শত্রুতা অবসানের লক্ষণ দেখাতে শুরু করেছে।

গ্রিগোরি ইভানভিচকে দেখে লিজা ছুটে এল। অবাক হয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে বাবা? খোঁড়াচ্ছ কেন? তোমার ঘোড়াটা কই? এটা কার গাড়ি?' গ্রিগোরি ইভানভিচ বললেন, 'My dear, যা হয়েছে তা ভাবতেও পারবে না।' বলে তিনি যা বললেন লিজা তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। বিস্ময়ের একটা ঘোর কাটতে না কাটতেই তিনি জানালেন বেরেস্তভেরা বাপ বেটায় পরদিন আসছে ডিনারের নিমন্ত্রণে। বিবর্ণ মুখে লিজা চেঁচিয়ে উঠল, 'সেকি! বেরেস্তভেরা বাপ বেটা ডিনারে আসছে কালকে? তুমি যা খুশি করবে করো, আমি কিন্তু ওদের সামনে যাচ্ছি না!' লিজার বাপ বললেন, 'পাগল হয়েছিস নাকি? হঠাৎ এত লজ্জা কেন বাপু? নাকি নভেলে-পড়া নায়িকাদের মতো বংশগত একটা ঘেন্না দেখাবার শখ হয়েছে? ও সব ছেলেমানুষি রাখ্...' 'না বাবা, বেরেস্তভদের সামনে আমি কিছুতেই বেরুতে পারব না, দুনিয়া দিলেও, না!' গ্রিগোরি ইভানভিচ ভালো করেই জানতেন, মেয়ের কথায় আপত্তি করে কিছুই লাভ হবে না। তর্ক করা ছেড়ে তিনি কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে এবম্বিধ এক স্মরণীয় অশ্বারোহণের পরে চলে গেলেন বিশ্রাম নিতে।

লিজাভেতা গ্রিগোরিয়েভনা নিজের ঘরে এসে নাস্তিয়াকে ডেকে আনলে। পরদিনকার নিমন্ত্রণ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা চলল দুজনের মধ্যে। সযত্ন-লালিত এক তরুণী মহিলার মধ্যে তার আকুলিনাকে আবিষ্কার

করে কী ভাববে আলেক্সেই? লিজার স্বভাব চরিত্র, নীতিজ্ঞান এবং বুদ্ধি বিবেচনা সম্পর্কে কী ধারণা হবে তার? অথচ এমনভাবে আকস্মিক দেখা হয়ে গেলে ওই-বা কী করে তা দেখার জন্যেও লিজার লোভ কম ছিল না... হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তৎক্ষণাৎ সেটি নাস্তিয়াকে জ্ঞাপন করে দেওয়া হল। দুজনেই উৎফুল্ল হয়ে যেমন করে হোক তা কাজে পরিণত করবে বলে স্থির করে ফেললে।

পরদিন প্রাতরাশের সময় গ্রিগোরি ইভানভিচ মেয়ের কাছে জানতে চাইলেন, বেরেস্তভদের কাছ থেকে পালিয়ে থাকার কথা সে তখনো ভাবছে কিনা। লিজা বললে, 'তোমার যখন এত ইচ্ছে তখন না হয় ওঁদের অভ্যর্থনাই করব, কিন্তু একটি শর্ত আছে বাবা। ওদের সামনে আমি যে পোশাক পরেই আসি না কেন আর যাই করি না কেন তুমি বকতে পাবে না, অসন্তুষ্ট হতে পাবে না, অবাক হতে পাবে না।' গ্রিগোরি ইভানভিচ হাসতে হাসতে বললেন, 'আবার কোনো একটা দুষ্টুমির মতলবে আছো বুঝি? বেশ রাজি। কাজল-চোখী দুষ্টুটা আমার, করো যা খেয়াল হচ্ছে!' গ্রিগোরি ইভানভিচ এই বলে তার কপালে একটি চুমু এঁকে দিলেন। লিজাও ছুটল তার যোগাড়-যন্ত্র করতে।

কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় ছয়-ঘোড়ায় টানা এক ঘরে-বানানো গাড়ি এসে ঢুকল উঠোনে, ঝকঝকে সবুজ ঘাসের চক্করটুকুর কাছে। মুরম্স্কির দুজন সাজগোজ-করা বরকন্দাজের সাহায্যে বেরেস্তভ-কর্তা সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন বারান্দায়। ছেলে এল পেছনে পেছনে ঘোড়ায় চেপে, তারপর বাপের সঙ্গে খাবার ঘরে গেল একত্রে। টেবিল তৈরিই ছিল। মুরম্স্কি তাঁর অতিথিদের অভ্যর্থনা করলেন আন্তরিকতার সঙ্গে, ডিনারের আগে তাঁর আবাদী বাগান আর ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত সব পরিদর্শনের জন্যে নেমন্তন্ন করলেন, এবং সবাইকে নিয়ে হেঁটে গেলেন তাঁর কাঁকর-বিছানো ঝাড়ু-দেওয়া পথের ওপর দিয়ে। অকেজো খেয়ালের পেছনে সময় আর মেহনত খরচ করতে হয়েছে দেখে বেরেস্তভ-কর্তা ভেতরে ভেতরে বিরক্ত বোধ করছিলেন বটে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললেন না। তাঁর পুত্রের মন অবশ্য এ দুয়ের কোনোটাতেই ছিল না — কৃপণ জমিদারটির মতো সে না হচ্ছিল ব্যাজার, না অনুভব করছিল আত্মতুষ্ট বিলেত-নবীশের মতো

উৎসাহ। মন তার ছিল শুধু কখন গৃহস্বামীর কন্যার আবির্ভাব ঘটে সেই দিকে। মেয়েটি সম্পর্কে অনেক কথা সে আগেই শুনেছে এবং যদিও আমরা জানি যে তার হৃদয়াবেগ অন্যত্র নিবদ্ধ তবু একটি সুন্দরী তরুণী নারী যে তার কল্পনাকে নাড়া দিতে বাধ্য তাতে সন্দেহ কি।

ফিরে এসে তিনজন বসলেন ড্রইং-রুমে। বৃদ্ধ দুজন সেকালের কথাবার্তা শুরু করলেন, সামরিক জীবনের গল্প শোনালেন পরস্পরকে। আর আলেক্সেই ভাবতে লাগল, লিজা এলে সে কী ভূমিকা নেবে। ঠিক করল একটা উগ্র নিস্পৃহতার চাল বজায় রাখাই সবচেয়ে ভালো হবে এবং সেইভাবে নিজেকে তৈরি করতে লাগল। তারপর খুলে গেল দরজা। এমন একটা ঔদাসীন্য আর গর্বিত তাচ্ছিল্যে আলেক্সেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল যাতে সবচেয়ে ঝানু রঙ্গিণীর বুকও দুরদুর করে ওঠে। দুর্ভাগ্যবশত যে এল সে লিজা নয়, সর্বাঙ্গ পাউডারে আচ্ছন্ন, করসেট-আঁটা মিস্ জ্যাক্সন। নিচের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন করে সে ঘরে ঢুকল, ফলে আলেক্সেইয়ের মহতী সামরিক মহড়াটা একেবারে মাঠে মারা গেল। ধাক্কা থেকে সামলে ওঠার সময় পেতে না পেতেই আবার দরজা খুলে গেল এবং এবার ঘরে ঢুকল লিজা। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। মুরম্স্কি তাঁর অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ থমকে ঠোঁট কামড়ালেন... লিজা, তাঁরই শ্যামলা রঙের মেয়ে লিজা একেবারে আকর্ণ প্রলেপে পাউডার আর পেণ্ট মেখে যেন মিস্ জ্যাক্সনকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে, তার চুলের রঙের তুলনায় ভয়ানক হালকা রঙের নকল চিকুর যা দুলছে তা একেবারে ফরাসী লুই কোয়াতোর্জ-এর পরচুলার মতো কোঁকড়ানো। Madame de Pompadour**-এর কুঁচিদার পেটিকোটের মতো আস্তিন ঝুলছে á l'imbécile*** ফ্যাশনের। সর্বাঙ্গে লেসের বাঁধন পড়েছে এমনভাবে যে, তার দেহখানা হয়েছে ইংরেজী এক্স্-এর মতো এবং তার মায়ের যে সব হীরের গয়না এখনো বাঁধা পড়ে নি তা ঝিলিক দিচ্ছে লিজার আঙুলে, গলায়, কানে। ঝকমকে এবং হাস্যকর

** মাদাম দা পম্পাদুর। (টীকা দ্রঃ)

*** বোকার মতো। (ফরাসী)

এই নারীমূর্তির মধ্যে তার আকুলিনাকে চিনতে পারা আলেক্সেইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না। লিজার হস্ত-চুম্বনের জন্যে আলেক্সেইয়ের বাপ উঠে দাঁড়ালেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলেক্সেইকে তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হল। লিজার সুচারু আঙুলের ওপর ঠোঁট ছোঁয়াবার সময় আলেক্সেইয়ের মনে হল আঙুলগুলো বুঝি একটু কেঁপে উঠল। সেই মুহূর্তেই তার চোখ পড়ল ছোট একটি পায়ের ওপর, অতিরিক্ত রকমের বিলাসী জুতোজোড়া দেখাবার জন্যেই তা একটু এগিয়ে এসেছে বোঝা যায়। অতঃপর তার বাদবাকি সাজ পোশাকটুকু আলেক্সেইয়ের চোখে খানিকটা সয়ে এল। পাউডার আর পেন্টের ব্যাপারটা তো সে প্রথম দিকে সরলতাবশে নজরই করে নি, আর পরেও ওগুলো যে পাউডার আর পেণ্ট সে রকম সন্দেহই হয় নি তার। গ্রিগোরি ইভানভিচ তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখে চেষ্টা করলেন যাতে তিনি অবাক হয়েছেন তা না বোঝা যায়। মেয়ের এই খেয়ালে তাঁর এত মজা লেগেছিল যে হাসি চেপে রাখা তাঁর দায় হয়েছিল। কিন্তু দাম্ভিক ইংরেজ মহিলাটির পক্ষে ব্যাপারটা আদৌ হাসির বলে মনে হয় নি। মিস্ জ্যাক্সনের বুঝতে একটুও দেরি হল না যে ঐ পেণ্ট আর পাউডার তারই ড্রেসিং-টেবিল থেকে মেরে দেওয়া হয়েছে। মিস্ জ্যাক্সনের মুখের কৃত্রিম বিবর্ণতা ভেদ করে গাল দুটো লাল হয়ে উঠল বিরক্তিতে। তরুণী অপরাধিনীর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও কিন্তু অপরাধিনীটি সে সব নজরেই আনলে না। কৈফিয়তের যা কিছু ভাবনা সব মুলতুবী রেখে দিলে ভবিষ্যতের জন্যে।

টেবিল ঘিরে সকলে বসল। অন্যমনস্ক বিষণ্ণ একটি মানুষের ভূমিকা চালিয়ে গেল আলেক্সেই। লিজা নেকীর মতো ভাব করলে, কথা কইলে দাঁত চেপে এবং সুরেলা গলায় কেবলমাত্র ফরাসী ভাষায়। লিজার উদ্দেশ্য কী না বুঝলেও লিজার বাপের কাছে ব্যাপারটা খুব মজার মনে হল। বারবার করে তিনি লিজার দিকে চাইতে লাগলেন। ইংরেজ মহিলাটি ক্রোধে নির্বাক হয়ে রইলেন। আর স্বচ্ছন্দ বোধ করলেন শুধু ইভান পেত্রোভিচ, একাই তিনি দুজনের খাওয়া খেলেন, যথারীতি মদ টানলেন পেটপুরে, নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন হা-হা করে এবং উত্তরোত্তর প্রীতিভরে আলাপে জমলেন।

অবশেষে টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় এল। অতিথিরা বিদায় নিয়ে গেলেন। আর এতক্ষণ পরে প্রাণখুলে হাসার সময় পেলেন গ্রিগোরি ইভানভিচ। লিজাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁদের এমন বোকা বানালি কেন বল তো? তা যাই বলিস, পেন্ট দিলে তোকে মানায় কিন্তু। মেয়েদের প্রসাধনের ব্যাপারটা আমি অবিশ্যি ভালো বুঝি না, তবে আমি হলে পেন্ট দেওয়া শুরু করতাম। খুব গাদা খানিক করে নয় বটে, অল্প অল্প।' মতলব তার এমন হাসিল হল দেখে লিজার খুশির সীমা ছিল না। বাপের গলা জড়িয়ে ধরে সে বললে, এ পরামর্শটা সে ভেবে দেখবে। তারপর ছুটে গেল ক্রুদ্ধ মিস্ জ্যাক্সনকে শান্ত করতে। অতিকষ্টে মিস্ জ্যাক্সনকে দরজা খুলিয়ে লিজার কথা শুনতে রাজি করানো গেল। লিজা বললে, আগন্তুকদের সামনে নিজের ময়লা রঙ নিয়ে যেতে ওর ভারি লজ্জা করছিল। চেয়ে নেবার সাহস হয় নি তার... ভেবেছিল মিস্ জ্যাক্সন যে রকম ভালোমানুষ নিশ্চয়ই তাকে ক্ষমা করবে... ইত্যাদি ইত্যাদি। মিস্ জ্যাক্সন যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে তাকে ব্যঙ্গ করা লিজার উদ্দেশ্য ছিল না, তখন শান্ত হয়ে চুমু খেলেন এবং ভাব হয়ে যাওয়ার চিহ্ন হিসেবে উপহার দিলেন মুখে মাখার বিলাতি শাদা পেন্টের একটা কৌটো। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার পরিপূর্ণ ভাব ফুটিয়ে লিজা তা গ্রহণ করলে।

পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারছেন, যে পরদিন অভিসার স্থলটিতে দর্শন দিতে লিজা ভোলে নি। আলেক্সেইকে দেখা মাত্র সে বললে, 'তোমরা কাল আমাদের বাবুর বাড়িতে নেমন্তন্ন গেইছিলে, লয়? তা বাবুর মেয়েকে দেখে কি রকম লাগল?' আলেক্সেই বললে সে তার দিকে বিশেষ নজর করে নি। লিজা অবাক হয়ে বললে, 'হেই মাগো!' আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে, 'কেন?' 'ভেবেছিলাম তুমাকে শুধাইব, লুকে যা বলে তা সত্যি কিনা...' 'কী বলে লোকে?' 'এইটো সত্যি কিনা... লুকে যে বলে আমাকে দেখতে অনেকটা বাবুর মেয়ের পারা?' 'দূর দূর! তোমার তুলনায় ও একটা পেত্নী!' 'না গো বাবু, উ কথাটি বলো না। আমাদের বাবুর মেয়েটি কত গোরা, কত সুন্দরী! তার সাথে আমার তুলনা!' আলেক্সেই দিব্যি দিয়ে জানাল যে দুনিয়ার সমস্ত যুবতী ভদ্রমহিলার চেয়েও সে দেখতে ভালো এবং এ বিষয়ে তার আশঙ্কা একেবারে নিরসনের জন্যে বাবুর বাড়ির

মেয়ের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিতে শুরু করলে যে লিজা হাসলে প্রাণ খুলে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তা যাই বলো কেনে, আমাদের বাবুর মেয়েকে দেখে হাসি লাগুক কি যাই হোক, উর কাছে আমি একটা গোমুখ্খু তো বটি — লেখাপড়া শিখি নিকো'। আলেক্সেই বললে, 'ওহো এই জন্যে ভাবনা? বেশ, তুমি যদি চাও তো এই মুহূর্ত থেকেই আমি তোমাকে পড়াতে শুরু করব।' লিজা বললে, 'তা মন্দ লয়, চেষ্টা করে দেখতে কি? এ্যাঁ?' 'চেষ্টা করে দ্যাখোই না। এখন থেকেই শুরু করি।' ওরা তক্ষুনি বসে গেল। আলেক্সেই তার পকেট থেকে একটা পেনসিল আর নোটবই বার করলে। এবং অতি চটপট আকুলিনা তার বর্ণমালা শিখে ফেললে। এ রকম ত্বরিৎ-বুদ্ধি দেখে আলেক্সেই একেবারে অবাক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আকুলিনা বললে সে এবার হস্তাক্ষর শুরু করবে। প্রথম প্রথম পেনসিলটা ঠিক বাগ মানেছিল না। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল, সে তোফা লিখতে শিখে গেছে। আলেক্সেই বললে, 'আশ্চর্য তো! ল্যাঙ্কাস্টার প্রথা মতো যত তাড়াতাড়ি শেখা যায়, আমরা তার চেয়েও বেশি এগিয়ে যাচ্ছি!' বলতে কি, তৃতীয় দিনেই আকুলিনা বানান করে করে 'বয়ার-কন্যা নাতালিয়া'* নামক উপন্যাসটি পড়তে শুরু করে দিলে এবং পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে এমন সব মন্তব্য করলে যাতে আলেক্সেই একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেল, আর মাঝে মাঝে থেমে উপন্যাসটি থেকে সংগ্রহ করা অলঙ্কার বাক্য লিখে লিখে কাগজ ভরে ফেললে।

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ওরা চিঠি বিনিময় শুরু করলে। পোস্ট আপিস হল প্রাচীন ওক গাছের একটা ফোকর। ডাকপিয়নের কাজটা নাস্তিয়াই চালাতে লাগল লুকিয়ে লুকিয়ে। ওক গাছটার কাছে আলেক্সেই পৌঁছে দিত গোটা গোটা অক্ষরে লেখা চিঠি, আর নিয়ে আসত শস্তা নীল কাগজের ওপর আঁকাবাঁকা করে লেখা প্রিয়তমার লিপি। আকুলিনার স্টাইল প্রতি-চিঠিতেই ধাপে ধাপে উন্নত হতে শুরু করল এবং স্পষ্ট বোঝা যেতে লাগল তার মনটা গড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে।

ইতিমধ্যে ইভান পেত্রোভিচ বেরেস্তভ আর গ্রিগোরি ইভানভিচ মুরম্স্কির মধ্যে দীর্ঘদিন বাদে যে সম্পর্কের সূত্রপাত হয়েছিল তা

উত্তরোত্তর বাড়তে বাড়তে অচিরেই বন্ধুত্বে পর্যবসিত হল। তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় এই পরিস্থিতিটিকে: মুরম্‌স্কি প্রায়ই ভাবতেন যে ইভান পেত্রোভিচের মৃত্যুর পর তার সব কিছু সম্পত্তি পাবে আলেক্সেই ইভানভিচ, ফলে প্রদেশের মধ্যে সবচেয়ে ধনী সম্পত্তি মালিকদের একজন বলে সে গণ্য হবে। অতএব লিজাকে বিয়ে না করার কোনো কারণ তার থাকতে পারে না। অন্যদিকে বুড়ো বেরেস্তভও একথা স্বীকার না করে পারলেন না যে যদিও তার পড়শীর মধ্যে কিছু কিছু খেয়ালীপনা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন (বেরেস্তভের কথা অনুসারে, যা কিছু বিলাতি তার জন্যে পাগল হয়ে ওঠা), তবু, তাঁর মধ্যে চমৎকার নানা গুণও রয়েছে, যেমন মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বার করার অসাধারণ ক্ষমতা। তা ছাড়া গ্রিগোরি ইভানভিচ হলেন প্রতিপত্তিশালী খ্যাতনামা কাউন্ট প্রন্‌স্কির এক নিকট আত্মীয়। এই কাউন্টের সাহায্য আলেক্সেইয়ের কাজে লাগতে পারে এবং অন্যদিকে ভালোভাবে মেয়ের একটা বিয়ে দেওয়ার সুযোগ মুরম্‌স্কিও (ইভান পেত্রোভিচ ভাবলেন) খুশি হয়েই নেবেন। দুই বৃদ্ধ কিছুদিন তাদের মনের চিন্তা মনেই চেপে রেখেছিলেন। তারপর একদিন তাঁরা তাঁদের মানসিক ইচ্ছা পরস্পরের কাছে ব্যক্ত করে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন এবং পরস্পরকে কথা দিলেন যে এ নিয়ে তাঁরা গভীরভাবে ভাববেন। দুজনেই এগুতে শুরু করলেন নিজের নিজের পথে। মুরম্‌স্কির পক্ষে একটা মুশকিল দাঁড়াচ্ছিল কী করে তাঁর বেট্‌সি ও আলেক্সেইকে একত্র করা যায়। সেই অবিস্মরণীয় ডিনারের পর থেকে এ মেয়ে আলেক্সেইয়ের সঙ্গে আর দেখাই করে নি। মনে হয় যেন ওদের মধ্যে তেমন কোনো টান নেই। যে কারণেই হোক, আলেক্সেই প্রিলুচিনোতে তারপর আর আসে নি এবং ইভান পেত্রোভিচ যতবার এ বাড়িতে এসেছেন, ততবারই লিজা গিয়ে তার কুঠরিতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গ্রিগোরি ইভানভিচ ভাবলেন, আলেক্সেই যদি এখানে দৈনিক আসা যাওয়া করে তাহলে বেট্‌সি তার সঙ্গে প্রেমে পড়তে বাধ্য, এই-ই নিয়ম — সময়ে সব কিছুই শুধরে যাবে।

ইভান পেত্রোভিচ কিন্তু তাঁর নিজের পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সেইদিন সন্ধ্যাতেই তিনি ছেলেকে তাঁর

পড়ার ঘরে ডেকে পাঠালেন। পাইপ ধরিয়ে কিছুটা থেমে বললেন, 'আলিয়োশা পল্টনে যাবার কথা আজকাল তোমার মুখে বড়ো একটা শুনি না কেন বলো তো? ঘোড়সওয়ার সৈন্যের পোশাকে পরার লোভ তা হলে তোমার আর নেই তো?' সসম্মানে আলেক্সেই জবাব দিলে, 'আজ্ঞে, ঠিক তা নয়। দেখলাম আমি ঘোড়সওয়ার পল্টনে যাব এটা আপনার পছন্দ নয়। সেক্ষেত্রে আপনার ইচ্ছা মেনে চলাই তো আমার কর্তব্য।' 'বেশ, দেখছি তুমি তাহলে কর্তব্যপরায়ণ পুত্র, আমার পক্ষে এ খুব সুখের কথা। তবে তোমার ওপর জোর খাটাবার কোনো ইচ্ছেও আমার নেই। আপাতত সরকারী চাকরিতে জোর করে তোমাকে ঢোকাতে চাই না। তবে ঠিক করেছি তোমার বিয়ে দেব।'

অবাক হয়ে আলেক্সেই জিজ্ঞেস করলে, 'কার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছেন?'

'লিজাভেতা গ্রিগোরিয়েভ্না মুরম্স্কায়া,' ইভান পেত্রোভিচ জানালেন, 'আমার মতে তো কনেটি মন্দ নয়।'

'আজ্ঞে, আমি কিন্তু এখনো বিয়ের কথা ভাবছিলাম না।'

'তুমি ভাবো নি বলেই তো আমাকে ভাবতে হল এবং আমি আমার মত ঠিক করে ফেলেছি।'

'আজ্ঞে, লিজা মুরম্স্কায়াকে ঠিক আমার পছন্দ হচ্ছে না।'

'পরে পছন্দ হবে। অভ্যেস হয়ে গেলেই ভালোবাসা আপনি আসবে।'

'ওকে আমি সুখী করতে পারব এমন মনে হচ্ছে না।'

'ওর সুখ নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। এই কি একটা কথা? পিতৃ-ইচ্ছা মান্য করার এই কি তোমার নমুনা? ছি!'

'আজ্ঞে আপনি যাই ভাবুন, বিয়ে করার আমার ইচ্ছে নেই, বিয়ে আমি করব না।'

'হয় তুমি বিয়ে করবে, নয় তুমি চুলোয় যাবে, ভগবান সাক্ষী, আমি আমার সম্পত্তি বিক্রি করে দাম যা পাব সব উড়িয়ে যাব, একটা কোপেকও তোমায় দিয়ে যাব না। তিনদিন সময় দিলাম ভেবে দেখতে, ততদিন তোমার মুখ দর্শন করতে চাই না।'

আলেক্সেই জানত, বাপের মাথায় যদি একটা কিছু ঢোকে তো তা

নড়চড় করার কোনো উপায় নেই, তারাস স্কতিনিন* যা বলেছিলেন সে রকম 'পেরেকে ঠুকেও' না। কিন্তু আলেক্সেইও বাপের স্বভাবই পেয়েছিল এবং তার মত বদলানোও সমান কঠিন। ঘরে গিয়ে সে পৈতৃক কর্তৃত্বের সীমানা কতটা তাই ভাবলে বসে বসে, লিজাভেতা গ্রিগোরিয়েভ্‌নার মূর্তি কল্পনা করলে, ওকে ভিখিরি করে যাবে বাপের এই হুমকি সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং অবশেষে সব ভাবনা এসে নিবদ্ধ হল আকুলিনার ওপর। এই প্রথম তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে সে আকুলিনাকে ভালোবেসেছে গভীরভাবে। একটা রোমাণ্টিক কল্পনা তাকে পেয়ে বসল: চাষীঘরের একটি মেয়েকে বিয়ে করে নিজের মেহনতে নিজেরা বাঁচা। যতই সে ভাবলে ততই যুক্তিযুক্ত বলে কথাটা তার মনে হতে লাগল। বর্ষার জন্যে কিছুদিন থেকে বনের অভিসার বন্ধ হয়ে ছিল। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে এবং আবেগপূর্ণ স্টাইলে সে একটা চিঠি লিখলে আকুলিনার জন্যে। তাদের সুখের পথে কী আসন্ন বিপদ ঘনিয়েছে তা জানিয়ে সে আকুলিনার পাণি-প্রার্থনা করলে। তারপর কালবিলম্ব না করে ওক গাছের ফোকরে চিঠিটি রেখে এসে শান্ত মনে ঘুমতে গেল আলেক্সেই।

পরদিন দৃঢ়চিত্ত নিয়ে আলেক্সেই ভোরে উঠে চলে গেল মুরম্‌স্কির সঙ্গে দেখা করে সব কিছু খোলাখুলি তাকে জানাতে। আলেক্সেই ভেবেছিল মুরম্‌স্কির মধ্যে সে উদারতা জাগিয়ে তুলতে পারবে এবং তাকে স্বপক্ষে পাবে। প্রিলুচিনো জমিদার-বাড়ির বারান্দার সামনে এসে ঘোড়া থামিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, 'গ্রিগোরি ইভানভিচ বাড়ি আছেন কি?' চাকর জানালে, 'না মশায়, গ্রিগোরি ইভানভিচ সকালেই বেরিয়ে গেছেন।' 'কী মুশকিল!' আলেক্সেই ভাবলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, লিজাভেতা গ্রিগোরিয়েভ্‌না বাড়ি আছেন?' 'হ্যাঁ, আছেন।' আলেক্সেই লাফ দিয়ে নামল ঘোড়া থেকে, লাগামটা চাকরের হাতে দিয়ে খবর পাঠাবার জন্যে অপেক্ষা না করেই ভেতরে ঢুকে গেল।

ড্রয়িং-রুমের দিকে যেতে যেতে সে ভাবলে, 'বাঁচা গেছে, মেয়েটির সঙ্গেই সরাসরি কথা বলে নেওয়া যাবে।' ঘরের মধ্যে ঢুকেই সে বজ্রাহত হয়ে দাঁড়াল। লিজা... না আকুলিনা, শ্যামলা রঙের প্রিয়তমা আকুলিনা জানলার সামনে বসে-বসে তারই চিঠি পড়ছে। পরনে তার সারাফানের

বদলে একটা শাদা রঙের প্রভাতী গাউন। লিজা এতই তন্ময় হয়ে ছিল যে আলেক্সেইয়ের আসা টের পায় নি। উল্লাসের শব্দটা আর আলেক্সেই চেপে রাখতে পারল না। চমকে উঠে লিজা মাথা তুললে তারপর চেঁচিয়ে উঠে ছুটে দিলে। আলেক্সেই জোর করে তাকে আটকালে, 'আকুলিনা! আকুলিনা!' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে ফরাসী ভাষায় লিজা চ্যাঁচাতে লাগল, 'Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?'** আর আলেক্সেই বারবার বলতে লাগল, 'আকুলিনা, আকুলিনা, প্রিয়তমা আমার!' আর লিজার হাত ভরে দিল চুমুতে চুমুতে। ব্যাপারটার সাক্ষী হয়ে ছিলেন শুধু মিস্ জ্যাক্সন — কী হল তা ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি। এমন সময় দরজা খুলে গ্রিগোরি ইভানভিচ ঢুকলেন; বললেন, 'ও হো! দেখছি তোমরা নিজেরাই গুছিয়ে এনেছ...'

এ গল্পের শেষটুকু লেখার অপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব থেকে পাঠকেরা আমায় অব্যাহতি দিন।

ই. প. বেলকিনের গল্পগুলি শেষ হল।

** 'ছেড়ে দিন মঁসিয়ে, আপনার কি মাথা খারাপ হল? ছাড়ুন!' (ফরাসী)

ইস্কাপনের বিবি

ইস্কাপনের বিবিতে
বোঝায় গোপন অপচিকীর্ষা।

নবতম ভাগ্যগণনা গ্রন্থ।

১

যেদিন অলক্ষণে,
জুটত এই ক'জনে
প্রায়শই;
বাড়াতে চাইত বাজি,
পঞ্চাশে নও কো রাজি,
ওঠো একশোয়।
জিতে, হেরে তড়িঘড়ি
লিখে দিত টাকাকড়ি
খড়ি দিয়ে।
যেদিন অলক্ষণে,
ব্যস্ত সব ক'জনে
এই নিয়ে।

একদিন তাসের জুয়াখেলা চলছিল অশ্বারোহী বাহিনীর রক্ষী নারুমভের বাড়িতে। শীতের দীর্ঘ রাত কেটে গেল অলক্ষ্যে। নৈশাহারে বসা হল ভোর পাঁচটায়। যারা জিতেছিল তারা খেতে লাগল হাপুস-হুপুস করে, বাকিরা অন্যমনস্কের মতো বসে রইল তাদের খালি ডিশ-প্লেটের সামনে। তবে শ্যাম্পেন এল, চাঙ্গা হয়ে উঠল কথাবার্তা, সবাই যোগ দিল তাতে।

'কী হল তোমার, সুরিন?' জিজ্ঞেস করলেন গৃহকর্তা।

'বরাবরের মতো হেরেছি। বলতেই হবে যে আমার কপাল খারাপ। কম বাজি রেখে খেলি। কখনো মাথা খারাপ করি না, কিছুতেই নিজের বুদ্ধি থেকে সরি না, অথচ হারি সবসময়!'

'আচ্ছা, কখনো তোমায় নেশায় পায় নি? একবারও বাজি ধরো নি রুতে খেলায়! তোমার সংযমে আমি তাজ্জব।'

'কিন্তু এই হেরমান লোকটা কেমন?' যুবক একজন ইঞ্জিনিয়রকে দেখিয়ে বললে অতিথিদের একজন, 'জীবনে সে তাস হাতে তোলে নি, একবারও আমাদের বাজি বাড়ায় নি দ্বিগুণ, অথচ পাঁচটা পর্যন্ত বসে বসে খেলা দেখেছে আমাদের!'

হেরমান বললে, 'জুয়া আমায় ভয়ানক টানে, কিন্তু বাড়তি পাবার আশায় প্রয়োজনীয়টা জলাঞ্জলি দেওয়ার অবস্থা আমার নয়।'

'হেরমান হোল গে জার্মান, হিসেবী লোক, এই হল আসল কথা!' মন্তব্য করলে তোমস্কি। 'কিন্তু আমার কাছে যিনি দুর্বোধ্য তিনি আমার ঠাকুমা কাউন্টেস আন্না ফেদোতোভনা।'

'সেকি, কী ব্যাপার?' চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'ভেবে পাই না ঠাকুমা কেন আড্ডাধারীর বিরুদ্ধে খেলে না!'

নারুমভ বললে, 'আশি বছরের বৃদ্ধা জুয়ায় খেলছেন না তাতে অবাক হবার কী আছে?'

'তার মানে ওঁর ব্যাপার আপনারা কিছুই জানেন না?'

'না! সত্যি, কিছুই জানি না!'

'বটে, তা হলে শুনুন:

'জেনে রাখুন যে আমার ঠাকুমা ষাট বছর আগে প্যারিসে যান এবং সেখানে একটা হুজুগ হয়ে দাঁড়ান। লোকে ছুটত la Vénus moscovite**কে দেখতে। রিশেল্যু ঘুরঘুর করতেন তাঁর পেছনে, ঠাকুমা বলেন যে তাঁর কঠোরতায় তাঁকে প্রায় আত্মহত্যায় ঠেলে দিয়েছিলেন তিনি।

'সে সময় সম্ভ্রান্ত মহিলারা ফারো জুয়া খেলত। একদিন দরবারে তিনি অরলিয়ান্সের ডিউকের কাছে প্রচণ্ড হারেন। ঘরে ফিরে ঠাকুমা তাঁর তিল মুছে, ঘাগরার ঝালর খুলে ঠাকুর্দাকে বললেন যে তিনি হেরেছেন, টাকাটা শোধ দিতে হবে।

'স্বর্গত ঠাকুর্দাকে আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি ছিলেন ঠাকুমাদের

** মস্কোর ভেনাস বা উর্বশী। (ফরাসী)

বাজার-সরকার বংশের লোক। ঠাকুমাকে তিনি যমের মতো ভয় করতেন। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর হারের কথা শুনে তিনি আত্মহারা হয়ে ওঠেন, হিসাব-পত্তর এনে দেখান যে ছয় মাসে তাঁরা খরচ করেছেন পাঁচ লক্ষ, প্যারিসের কাছে তো তাঁদের মস্কো বা সারাতোভ জমিদারি কিছু নেই, টাকা দিতে তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। ঠাকুমা তাঁকে চড় ঝেরে নিজের রাগ দেখিয়ে শুতে যান একা।

'পরের দিন স্বামীকে ডেকে পাঠান তিনি, ভেবেছিলেন ঘরোয়া এই শাস্তিটায় কাজ হবে। কিন্তু স্বামী অটল। জীবনে এই প্রথম তিনি স্বামীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় এলেন, ভেবেছিলেন তাঁকে বোঝাবেন, গুরুগম্ভীর চালে দেখালেন যে ধার-দেনা সব একরকম হয় না, তফাৎ আছে প্রিন্সে আর কোচওয়ানে। — কোথায়! ঠাকুর্দা ক্ষেপে উঠলেন। না, তার আর নড়চড় নেই! ঠাকুমা ভেবে পেলেন না কী করবেন।

'চমৎকার একটি লোকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কাউণ্ট সাঁ-জেরমেঁর নাম শুনেছেন? কত তাজ্জব গল্প আছে তাঁর সম্পর্কে। নিজেকে তিনি চিরপর্যটক, জীয়ন জল আর পরশমণির উদ্ভাবক ইত্যাদি বলে জাহির করতেন। বুজরুক বলে লোকে হাসাহাসি করত তাঁকে নিয়ে, আর কাজানোভা তাঁর কড়চায় বলেছেন যে উনি গুপ্তচর; তবে তাঁর রহস্যগুলো সত্ত্বেও সাঁ-জেরমেঁর বাহ্যিক চেহারা ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত, লোকসমাজে খুবই সৌজন্যশীল। ঠাকুমা আজো পর্যন্ত তাঁকে পাগলের মতো ভালোবাসেন, কেউ তাঁর সম্পর্কে অশ্রদ্ধাভরে কিছু বললে ভয়ানক রেগে যান। ঠাকুমা জানতেন যে সাঁ-জেরমেঁর টাকা আছে অঢেল। ঠিক করলেন, তিনিই তাঁর ভরসা। একটা চিরকুট লিখে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন অবিলম্বে আসতে।

'বৃদ্ধ অবধূত তখনি এলেন, দেখলেন ঠাকুমা ভয়ানক রকমের শোকার্ত। একান্ত কালো রঙে স্বামীর বর্বরতার বিবরণ দিয়ে তিনি বললেন যে তাঁর বন্ধুত্ব ও সৌজন্যই তাঁর একমাত্র আশা।

'সাঁ-জেরমেঁ খানিকটা ভাবলেন। বললেন, 'আমি আপনাকে এ টাকাটা দিতে পারি কিন্তু জানি যে তা শোধ না দেওয়া পর্যন্ত আপনি শান্ত হতে পারবেন না, অথচ আমি চাই না যে আপনাকে নতুন ঝামেলায় পড়তে হয়।

আর একটা উপায় আছে, আপনি টাকা জিতে নিতে পারেন।' 'কিন্তু সদাশয় কাউণ্ট,' ঠাকুমা জবাব দিলেন, 'আমি যে আপনাকে বলছি যে আমাদের টাকা আদৌ নেই।' 'টাকার কোনো দরকার হবে না,' বললেন সাঁ-জেরমে', 'আমার কথাটা সব শুনুন।' এই বলে তিনি যে গোপন রহস্যের সন্ধান দিলেন তার জন্যে আমাদের যে-কেউ সবকিছু দিতে রাজি থাকবে...'

যুবক জুয়াড়িদের মনোযোগ বেড়ে গেল দ্বিগুণ। তোমস্কি পাইপ ধরিয়ে লম্বা টান মেরে বলে চলল:

'সেই সন্ধেতেই ঠাকুমা দর্শন দিলেন ভের্সাইতে, au jeu de la Reine**। অরলিয়ান্সের ডিউক তাস বাঁটছিলেন। ঠাকুমা সামান্য মাপ চাইলেন যে টাকাটা শোধ দিতে পারেন নি, তার কৈফিয়ৎ হিসেবে কী একটা গল্প বানিয়ে বলে তাঁর বিরুদ্ধে খেলতে শুরু করলেন। তিনটে তাস বেছে নিয়ে তিনি রাখলেন পরপর। তিনটে তাসেই তৎক্ষণাৎ জিতে গেল। পুরোপুরি ঋণমুক্ত হয়ে গেলেন ঠাকুমা।'

'কাণ্ড বটে!' বললে অতিথিদের একজন।

'গাঁজাখুরি!' মন্তব্য করলে হেরমান।

'কারচুপি হয়ত?' খেই ধরলে তৃতীয় জন।

গম্ভীর চালে তোমস্কি বললে, 'আমি তা মনে করি না।'

'সে কী!' বললে নারুমভ, 'তোমার ঠাকুমা পরপর তিনটে তাস গুণে করতে পারে আর তুমি এখনো পর্যন্ত তার কাছ থেকে শিখে নাও নি এই গুপ্ত বিদ্যাটা?'

তোমস্কি জবাব দিলে, 'ধুৎ! ওঁর ছিল চারটি ছেলে, আমার বাবাও তাদের একজন। সকলেই প্রচণ্ড জুয়াড়ী। কিন্তু কাউকেই তিনি তাঁর গুহ্য রহস্য ফাঁস করেন নি, যদিও তাতে ওঁদের পক্ষে, এমনকি আমার পক্ষেও মন্দ হত না। কিন্তু আমার কাকা, কাউণ্ট ইভান ইলিচ হলপ করে আমায় এই কথা বলেছেন: লোকান্তরিত চাপলিৎস্কি, সেই-যে, লাখ লাখ টাকা উড়িয়ে যিনি মারা যান নিঃস্ব অবস্থায়, যৌবনে একবার তিনি তিন লাখ টাকা হারেন—মনে হচ্ছে জোরিচের কাছে। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েন

** রাজবাড়িতে তাস খেলায়। (ফরাসী)

তিনি। যুবকদের বদখেয়ালের প্রতি ঠাকুমা ছিলেন সর্বদাই কড়া, কিন্তু চাপলিৎস্কির ওপর তাঁর কেমন যেন দয়া হল। পরপর রাখার জন্যে তিনটে তাস দিলেন তাঁকে আর শপথ করিয়ে নিলেন যে আর কখনো তিনি জুয়া খেলবেন না। চাপলিৎস্কি যার কাছে হেরেছিলেন তার সঙ্গে তাস খেলতে বসলেন। প্রথম তাসের ওপর পঞ্চাশ হাজার বাজি ধরলেন চাপলিৎস্কি এবং সঙ্গে সঙ্গে জিতলেন। তারপর ডাবল বাজি, রিডাবল — সমস্ত দেনা মিটিয়েও বেশ লাভ থাকল তাঁর...'

'তবে ঘুমোবার সময় হয়েছে এখন: ছ'টা বাজতে পনেরো।'

সত্যিই রাত ফরসা হয়ে উঠেছিল। যুবকেরা তাদের পানপাত্র শেষ করে রওনা দিল যে যার বাড়ির দিকে।

২

– Il paraît que monsieur est décidement pour les suivantes.
– Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraiches.**

জাগতিক কথোপকথন।

বৃদ্ধা কাউণ্টেস... তাঁর প্রসাধন কক্ষে বসে ছিলেন আয়নার সামনে। তিনটি দাসী ঘিরে আছে তাঁকে। একজনের হাতে রুজের বয়াম, অন্যজন ধরে আছে চুলের কাঁটার কৌটো, তৃতীয় জন আগুনে রঙের ফিতে লাগানো উঁচু টুপি। বহুকাল আগে শুকিয়ে যাওয়া সৌন্দর্যের কোনো অভিমান কাউণ্টেসের ছিল না, কিন্তু যৌবনের সমস্ত অভ্যাস তিনি বজায় রেখেছেন, সত্তরের দশকের ফ্যাশন তিনি অনুসরণ করেন কাঁটায় কাঁটায়, বেশভূষা করেন ততটা সময় নিয়ে, ততটা সযত্নে যা করা হত ষাট বছর আগে। জানলার কাছে এম্ব্রয়ডারির ফ্রেম নিয়ে বসে আছে তাঁর পোষ্য কন্যা।

** — আপনি মঁসিয়ে মনে হচ্ছে আন্দরমহলের খাস ঝিদেরই বেশি পছন্দ করেন?

— কী করা যাবে মাদাম? ওরা টাটকা। (ফরাসী)

'নমস্কার grand'maman,'** ঘরে ঢুকে বললে এক তরুণ অফিসার। 'Bonjour, mademoiselle Lise.*** দিদিমা, আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

'কী ব্যাপার Paul?'

'আপনার সঙ্গে আমার এক বন্ধুর পরিচয় করিয়ে দিয়ে শুক্রবারের বলনাচে ওকে আনতে চাই।'

'সরাসরি নাচে নিয়ে আয়, সেখানেই পরিচয় করিয়ে দিবি। কাল ...এর ওখানে গিয়েছিলি?'

'যাব না মানে! খুব জমেছিল, নাচ চলেছিল ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এলেৎস্কায়াকে কী সুন্দর লাগছিল!'

'হ্যারে বাছা, ওর ভেতর সুন্দরের কী আছে? ওর ঠাকুমা, প্রিন্সেস দারিয়া পেত্রোভ্‌না কি ছিলেন ওর মতো দেখতে? ভালো কথা, উনি কি খুব বুড়িয়ে গেছেন, দারিয়া পেত্রভনা?'

'বুড়িয়ে গেছেন মানে?' জবাব দিল অন্যমনস্ক তোমস্কি, 'সাত বছর আগেই তো উনি মারা গেছেন।'

পোষ্যপালিতা মাথা তুলে ইশারা করলে তরুণের দিকে। তার মনে পড়ল যে বৃদ্ধা কাউন্টেসের সখির মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। ঠোঁট কামড়াল তরুণ। কিন্তু কাউন্টেস তাঁর কাছে নতুন এই খবরটা শুনলেন খুবই নির্বিকার চিত্তে। বললেন:

'মারা গেছে! অথচ আমি জানতাম না! ও আর আমি ছিলাম রানীর সহচরী। যখন আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, রানী তখন...'

শতেক বারের বার তিনি নাতিকে শোনালেন সেই কাহিনী।

পরে বললেন, 'নে Paul, আমায় ধরে তোল। লিজা, আমার নস্যির কৌটোটা কোথায় রে?'

কাউন্টেস তাঁর দাসী সমভিব্যাহারে গেলেন পর্দার ওপাশে তাঁর প্রসাধন শেষ করতে। ঘরে রইল তোমস্কি আর পোষ্যপালিতা।

** দিদিমা। (ফরাসী)

*** সুপ্রভাত লিজা। (ফরাসী)

'কাকে আপনি নেমন্তন্ন করতে চাইছেন?' মৃদু স্বরে শুধাল লিজাভেতা ইভানভ্‌না।

'নারুমভকে। আপনি ওকে চেনেন?'

'না। উনি কি সামরিক লোক, না বেসামরিক?'

'সামরিক।'

'ইঞ্জিনিয়র?'

'না, অশ্বারোহী বাহিনীর লোক। কিন্তু কেন ভাবলেন যে সে ইঞ্জিনিয়র?'

লিজা হেসে উঠল, কোনো জবাব দিল না।

'Paul!' পর্দার ওপাশ থেকে কাউণ্টেস চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার জন্যে কোনো একটা নতুন উপন্যাস এনে দিস, শুধু বাপু একালের নয়।'

'কেন grand'maman?'

'মানে এমন উপন্যাস যেখানে মা-বাপকে নায়ক কষ্ট দিচ্ছে না, আর যেখানে ডুবে মরা লাস নেই। ডুবে মরাদের আমি ভারি ভয় করি!'

'তেমন উপন্যাস বর্তমানে নেই। রুশী উপন্যাস চলবে কি?'

'রুশী উপন্যাস আছে নাকি? পাঠাস বাছা, পাঠাস!'

'মাপ করবেন grand'maman আমার তাড়া আছে... মাপ করবেন লিজাভেতা ইভানভ্‌না! কেন আপনি ভেবেছিলেন যে নারুমভ ইঞ্জিনিয়র?'

তোমস্কি বেরিয়ে গেল প্রসাধন কক্ষ থেকে।

লিজাভেতা ইভানভ্‌না রইল একা। কাজ সরিয়ে রেখে সে চেয়ে রইল জানলা দিয়ে। শিগ্‌গিরই বাড়ির কোণের পেছন থেকে রাস্তার একপাশে দেখা দিল একজন তরুণ অফিসার। আরক্ত হয়ে উঠল তার গাল: একেবারে মাথা নিচু করে সে ফের কাজ নিয়ে বসল। এই সময় সাজ-পোশাক সেরে এলেন কাউণ্টেস। বললেন:

'লিজা, গাড়ি তৈরি করতে বল, চল বেড়াতে বেরুই।'

লিজা তার এম্ব্রয়ডারির ফ্রেম রেখে কাজকর্ম গোছাতে লাগল।

'কী রে মেয়ে, কালা নাকি!' চেঁচালেন কাউণ্টেস, 'শিগ্‌গির গাড়ি তৈরি করতে বল।'

'এক্ষুনি,' মৃদু স্বরে বলে লিজা ছুটে গেল বাইরের ঘরে।

চাকর এসে কাউণ্টেসকে দিল প্রিন্স পাভেল আলেক্সান্দ্রভিচের পাঠানো বই।

কাউণ্টেস বললেন, 'বাহ্! ধন্যবাদ জানাস। লিজা, লিজা! কোথায় তুই পালাস।'

'পোশাক পরছি।'

'সে পরে হবে মা। এসে বস এখানে। প্রথম খণ্ডটা খোল, পড়ে শোনা...'

লিজা বই নিয়ে কয়েক পঙক্তি পড়ে শোনাল।

'জোরে!' বললেন কাউণ্টেস, 'কী হল তোর মা? গলা ভেঙে গেল?.. দাঁড়া, তোর বেঞ্চিটা আমার কাছে টেনে আন... নে!'

আরো দুটো পাতা পড়ল লিজাভেতা ইভানভনা। কাউণ্টেস হাই তুললেন। বললেন:

'ধুর, ধুর! কী এসব ছাইপাঁশ। প্রিন্স পাভেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ধন্যবাদ জানাস... হ্যাঁ, গাড়ির কী হল?'

রাস্তার দিকে চেয়ে লিজাভেতা ইভানভনা বললে, 'গাড়ি তৈরি।'

'আর তুই সাজ-পোশাক এখনো করিস নি কেন?' বললেন কাউণ্টেস। 'সর্বদা তোর জন্যে দেরি করতে হবে! এটা, মা, অসহ্য।'

লিজা ছুটল তার ঘরে, দুমিনিট না যেতেই কাউণ্টেস ঘণ্টি দিতে লাগলেন প্রাণপণে। তিন দাসী ছুটে এল এক দরজা দিয়ে, অন্য দরজায় সাজ-বরদার।

'তোমাদের কেন ডাকলাম?' বললেন কাউণ্টেস, 'লিজাভেতা ইভানভ্নাকে বলো যে আমি তার অপেক্ষা করছি।'

লিজাভেতা ইভানভ্না তার ওপর কোট আর টুপি পরে বেরিয়ে এল।

কাউণ্টেস বললেন, 'এলে যা-হোক মা আমার। এ কী সাজ হয়েছে, কীসের জন্যে?.. কার পছন্দ হবে?.. আচ্ছা, বাতাস কেমন?'

'তেমন কিছু নয় রানীমা,' বললে সাজ-বরদার, 'খুব শান্ত।'

'তোমাদের সবারই কেবল এলোমেলো আন্দাজ! জানলার ওপরের পাল্লাটা খোলো তো। ঠিক, যা ভেবেছি, বাতাস বেশ ঠাণ্ডা, গাড়ি সরিয়ে নাও। লিজা, আমরা বেরুব না, সাজ-পোশাক করার কোনো মানে হয় নি।'

'এই আমার জীবন!' ভাবলে লিজাভেতা ইভানভ্‌না।

সত্যিই লিজাভেতা ইভানভ্‌না খুবই অসুখী। দান্তে বলেছেন, 'পরের দেওয়া অন্ন তেতো, পরের অলিন্দে ওঠার পৈঠা গুরুভার', আর বড়োলোক বুড়ির যে দুঃস্থ প্রতিপালিতা, পরাধীনতার জ্বালা তার চেয়ে আর কে-বা জানবে? কাউন্টেস... অবিশ্যি অন্তঃকরণে নিষ্ঠুর নন, তবে উচ্চ সমাজে আহ্লাদ পাওয়া নারীর মতো আত্মম্ভরী, কৃপণা, নিজের যুগের অনুরাগী এবং বর্তমানে বিরূপ সমস্ত বৃদ্ধের মতোই নিষ্প্রাণ অহমিকায় ভরপুর। উঁচু সমাজের সমস্ত আড়ম্বরে যোগ দিতেন তিনি, যেতেন বলনাচে, সেখানে রুজ মেখে, সাবেকী ফ্যাশনের বেশভূষায় এক কোণে বসে থাকতেন নৃত্যকক্ষের কদাকার কিন্তু অপরিহার্য এক শোভার মতো। প্রতিষ্ঠিত রেওয়াজ অনুযায়ী অভ্যাগতরা তাঁকে নিচু হয়ে কুর্নিশ করত তারপর কেউ আর তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হত না। নিজের বাড়িতে তিনি নেমন্তন্ন করতেন গোটা শহর, অক্ষরে অক্ষরে আদবকায়দা মানতেন তবে নিমন্ত্রিতদের মুখ চিনতেন না কারো। তাঁর অজস্র নস্কর বাইরের ঘরে বা অন্তঃপুরে বসে বসে ভুঁরি মুটিয়ে মুমূর্ষু বৃদ্ধার পয়সা লুটে যা খুশি তাই করে যেত। লিজাভেতা ইভানভ্‌না ছিল ঘরের বাঁদী, চা দিত সে আর বকুনি খেত বেশি চিনি খরচ করেছে বলে; উপন্যাস পড়ে শোনাত আর লেখকের সমস্ত ত্রুটির জন্যে সেই হত অপরাধী। কাউন্টেসের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হত তাকে আর খারাপ আবহাওয়া বা রাস্তার জন্যে সে-ই দায়ী। ওর জন্যে একটা মাসোহারা বরাদ্দ হয়েছিল যা কোনোদিন সে পুরো পায় নি; অথচ দাবি করা হত যেন সে সবার মতো, মানে অল্প কয়েকজনের মতো সাজ-পোশাক করে। সমাজে তার ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য, সবাই তাকে চিনত কিন্তু কেউ খেয়াল করত না; বলনাচে তার পালা পড়ত যখন vis-á-vis** জুটত না আর বেশভূষার কিছু একটা ঠিক করে নেবার দরকার পড়লে মহিলারা সর্বদাই তার হাত ধরে নিয়ে যেত প্রসাধন কক্ষে। মেয়েটির আত্মসম্মান ছিল, মর্মে মর্মে বুঝত তার অবস্থা, চেয়ে দেখত চারপাশে, মুক্তির অপেক্ষা করত অধীর হয়ে; কিন্তু নিজেদের ফাঁপা আত্মগরিমায়

** জুড়ি। (ফরাসী)

পটু যুবকেরা নজর দিত না তার দিকে, যদিও যে ভাবী বধূদের পেছনে তারা ঘুর ঘুর করত তাদের চেয়ে লিজাভেতা ইভানভ্না ছিল শতগুণ কম বেহায়া আর প্রাণহীনা। নীরস অথচ ফলাও অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে কতবারই-না সে কাঁদবার জন্যে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছে তার দীনহীন ঘরে যেখানে ছিল ওয়াল-পেপার সাঁটা পর্দা, দেরাজওলা বাক্স, আয়না, রঙ-করা খাট আর পেতলের মোমদানিতে মৃদুমন্দ আলো দিত চর্বির প্রদীপ।

একদিন — সেটা ঘটে এ উপন্যাসের প্রারম্ভে বর্ণিত সন্ধ্যার দুদিন এবং যে দৃশ্যটা এখন আঁকা হল তার এক হপ্তা আগে, — লিজাভেতা ইভানভ্না জানলার কাছে তার এম্ব্রয়ডারি ফ্রেম নিয়ে বসে হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে দেখে এক তরুণ সামরিক ইঞ্জিনিয়র নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার জানলার দিকে। মাথা নিচু করে সে তার কাজে মন দিলে। পাঁচ মিনিট বাদে সে ফের চেয়ে দেখল — তরুণ অফিসার দাঁড়িয়ে আছে সেই একই জায়গায়। উড়ো উড়ো অফিসারদের সঙ্গে রঙ-ঢঙ করার অভ্যেস না থাকায় সে বাইরে আর তাকাল না, মাথা না তুলে সেলাই নিয়ে রইল দুঘণ্টা। খাবার দেওয়া হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে সে তার সূচিকর্ম গোছগাছ করতে লাগল, আচমকা দৃষ্টি পড়ল রাস্তায়, ফের সেই অফিসার। এটা ভারি আশ্চর্য ঠেকল তার কাছে। খাওয়ার পর খানিকটা অস্থিরতা নিয়েই সে এল জানলার কাছে কিন্তু অফিসার তখন আর নেই, তার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল...

দুই দিন পর কাউন্টেসের সঙ্গে গাড়িতে যাবার সময় ফের তাকে সে দেখল। দাঁড়িয়ে ছিল সে একেবারে ফটকের সামনে, বীবর ফারের কলারে মুখটা ঢাকা। টুপির তল থেকে চকচক করছে তার কালো চোখ। ভয় পেয়ে গেল লিজাভেতা ইভানভনা, কিসে তা সে নিজেই জানে না, গাড়িতে উঠল দুর্বোধ্য দুরুদুরু বুকে।

বাড়ি ফিরে সে ছুটে গেল জানলায়, অফিসার সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, দৃষ্টি তার দিকেই নিবদ্ধ। কৌতূহলের পীড়ায় আর তার কাছে একেবারেই নতুন একটা অনুভূতির আন্দোলনে সরে গেল সে।

তারপর থেকে নির্দিষ্ট একটা সময়ে যুবকটি তার জানলার নিচে দেখা দিচ্ছে না, এমন দিন যায় নি কখনো। দুজনের মধ্যে গড়ে উঠল

নিকোলাই গোগল (১৮০৯-১৮৫২) — মহান রুশ লেখক।
লিথোগ্রাফ। ১৮৩৪

দেনিস দাভিদভ (১৭৮৪-১৮৩৯) — কবি ও হুসার।
জলরঙ্গ। ১৮৩৬

পুশকিন। জলরঙ। প. সকোলভের কাজ। ১৮৩৬

নাতালিয়া পুশকিনা, প্রাগ্‌বৈবাহিক উপাধি গন্‌চারোভা (১৮১২-১৮৬৩) — কবিজায়া।
জলরঙ। আ. ব্রিউলভের কাজ। ১৮৩১

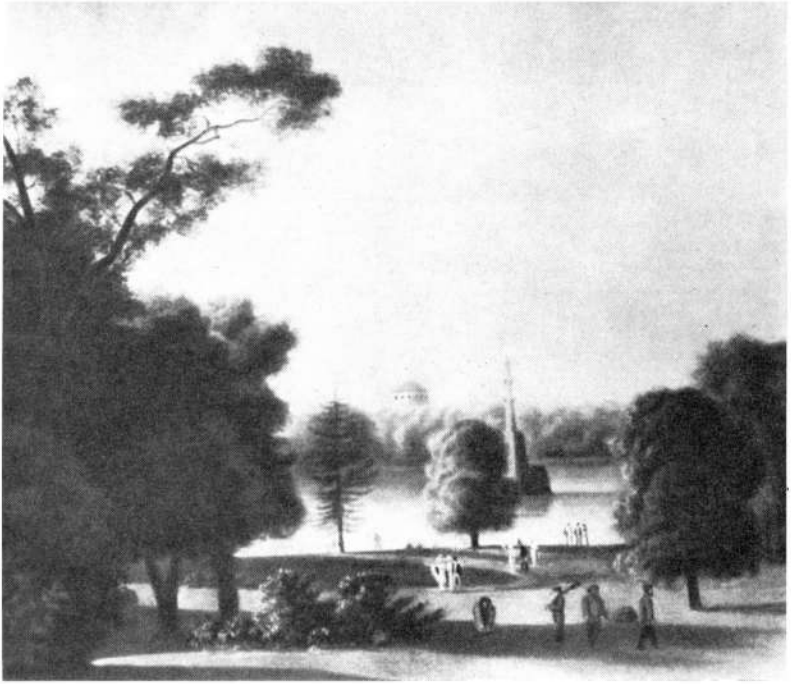

পিটারবর্গের কাছে ত্সারস্কয়ে সেলো। পার্ক। ১৮৩১ সালের গ্রীষ্ম। ছবিটি মার্তিনভের আঁকা। ১৮২০-এর দশক

একটা অলিখিত সম্পর্ক। নিজের জায়গায় সে বসত তার কাজ নিয়ে, টের পেত তার উপস্থিতি, মাথা তুলে তাকাত তার দিকে, দিনে দিনে চাউনিটা হতে থাকল দীর্ঘতর। যুবকটি মনে হল তার জন্যে কৃতার্থ: যৌবনের খরদৃষ্টিতে লিজাভেতা ইভানভ্না দেখেছিল দুজনের চোখাচোখি হতেই প্রতিবারই কেমন রক্তিম হয়ে ওঠে তার বিবর্ণ গাল। এক সপ্তাহ পরে সে হাসল তার দিকে চেয়ে...

তোমস্কি যখন তার বন্ধুকে আমন্ত্রণের অনুমতি চাইছিল কাউণ্টেসের কাছে বেচারি মেয়েটির বুক দুরুদুরু করে উঠেছিল। কিন্তু যখন জানা গেল নারুমভ ইঞ্জিনিয়র নয়, অশ্বারোহী অফিসার, তখন তার অনুতাপ হল এই জন্যে যে তার অসংযত প্রশ্নে সে তার গোপন কথা ফাঁস করে ফেলেছে লঘুচিত্ত তোমস্কির কাছে।

হেরমান হল রুশীভূত জার্মানের ছেলে, কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন বাপ। নিজের স্বাবলম্বন সুদৃঢ় করার প্রয়োজনীয়তায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় সে তার সুদ পর্যন্ত ছোঁয় নি; থাকত শুধু বেতন ভরসা করে, সামান্য কোনো খামখেয়ালেও আমল দিত না। তবে লোকটা ছিল গোপন স্বভাবের, আত্মাভিমানী, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করার উপলক্ষ বন্ধুদের জুটত কমই। কিন্তু তার রিপু ছিল প্রবল, কল্পনা তাকে পেয়ে বসত। তবে যৌবনের সাধারণ বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাত তার দৃঢ়তা। যেমন, মনে মনে জুয়াড়ি হলেও কখনো সে তাস হাতে নেয় নি, কেননা ভাবত তার অবস্থা এমন নয় যে (যা সে বলত) **বাড়তি পাবার আশায় প্রয়োজনীয়টা জলাঞ্জলি দেওয়া সম্ভব** অথচ সারা রাত সে বসে থাকত তাসের টেবিলের কাছে, উত্তেজিত উৎকণ্ঠায় দেখত খেলার বিভিন্ন ভাগ্যচক্র।

তিন তাসের গল্পটা খুবই প্রভাবিত করে তাকে, সারা রাত সেটা তার মাথা থেকে যায় নি। 'আচ্ছা যদি,' পরের দিন সন্ধ্যায় পিটারবুর্গের রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সে ভাবছিল, 'আচ্ছা যদি বৃদ্ধা কাউণ্টেস তার গোপন রহস্য আমাকে জানায়! — কিংবা তিনটে অব্যর্থ তাসের কথা বলে আমাকে! কপাল ঠুকে দেখলে হয় না ?.. ওঁর সঙ্গে পরিচয়, তাঁর কৃপালাভ, তাঁর প্রেমিক হয়ে যাওয়াও চলে — না, এ সবেতেই সময় লাগবে, আর ওঁর সাতাশি বছর বয়স, হপ্তা বাদে, দুদিনের মধ্যেই মারা যেতে পারেন

তিনি... আর গল্পটা... ওকি বিশ্বাস করা যায় ?.. না! হিসেবিয়ানা, মিতাচার আর পরিশ্রম — এই হল আমার তিনটে অব্যর্থ তাস, এতেই আমার পুঁজি হয়ে উঠবে তিনগুণ, সাতগুণ, আমি পাব নিশ্চিন্ততা আর স্বাধীনতা।'

এই সব ভাবতে ভাবতে সে এসে পড়ল পিটারবুর্গের একটা বড়ো রাস্তায় সাবেকী স্থাপত্যের একটা বাড়ির সামনে। রাস্তায় গাড়ির ভিড়, একটার পর একটা গাড়ি চলেছে আলোকিত প্রবেশপথের দিকে। গাড়ি থেকে মিনিটে মিনিটে বেরিয়ে আসছে কখনো সুন্দরী যুবতীর সুঠাম পা, কখনো অশ্বারোহীর ঝমঝমে বুট, কখনো ডোরা-কাটা মোজা আর কূটনৈতিক জুতো। ফার কোট আর ওভার কোট ঝলক দিচ্ছে দরোয়ানের কাছে। হেরমান থেমে গেল।

মোড়ের পাহারাওলার কাছে সে জিজ্ঞেস করলে, 'কার বাড়ি এটা ?'

'কাউন্টেস ... এর,' বললে পাহারাওলা।

কেঁপে উঠল হেরমান। অদ্ভুত কাহিনীটা ফের আচ্ছন্ন করল তার কল্পনাকে। বাড়ির কাছে পায়চারি করতে লাগল সে, ভাবতে লাগল তার কর্ত্রী এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা। নিজের সামান্য গৃহকোণটিতে ফিরল বেশ রাত করে। বহুক্ষণ ঘুম এল না, যখন এল তখন সে স্বপ্নে দেখতে লাগল তাস, সবুজ টেবিল, হুন্ডির তাড়া, মোহরের ঢিপ। তাসের পর তাস রাখছে সে, দ্বিগুণ, চতুর্গুণ বাজি ধরছে, অনায়াসে জিতে যাচ্ছে, সোনার মোহর গুটিয়ে হুন্ডি পুরছে পকেটে। দেরি করে যখন ঘুম ভাঙল, নিজের কাল্পনিক সম্পদ হারাবার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেললে সে, ফের ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরে, ফের দেখা দিল কাউন্টেস ... এর বাড়ির সামনে। অজানা কী একটা শক্তি যেন তাকে টেনে আনল এখানে। দাঁড়িয়ে গিয়ে সে চেয়ে দেখতে লাগল জানলায়। একটা জানলায় সে দেখতে গেল কালো চুলের একটা মাথা, নুয়ে আছে, সম্ভবত বইয়ের ওপর অথবা সূচিকর্মে। মাথাটা উঠল। হেরমান দেখল তাজা একখানা মুখ, কালো চোখ। সেই মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেল তার ভাগ্য।

৩

Vous m'écrives, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire.**

পত্রাবলি।

লিজাভেতা ইভানভ্‌না সবে তার কোট আর টুপি খুলেছে, এমন সময় কাউন্টেস তলব করলেন, বললেন ফের কোচ গাড়ি তৈরি রাখতে। গাড়িতে তারা উঠতে যাবে, দুই চাপরাশি বুড়িকে তুলে দিচ্ছে, এমন সময় একেবারে চাকার কাছে লিজাভেতা ইভানভ্‌না দেখতে পেল তার ইঞ্জিনিয়রকে। সে হাতে টেনে নিল তার। আতঙ্কের ঘোর কাটতে না কাটতেই যুবক অদৃশ্য, শুধু হাতে রয়ে গেল তার চিঠিটা। সেটা সে তার দস্তানার মধ্যে লুকিয়ে রাখল, সারাটা রাস্তা কিছুই তার চোখে পড়ল না, কানে গেল না কিছুই। গাড়িতে কাউন্টেসের অভ্যাস মিনিটে মিনিটে প্রশ্ন করা: আমাদের সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছিল। — এ সাঁকোটার নাম কী? — কী লেখা আছে সাইন-বোর্ডটায়। আর প্রতিবার লিজাভেতা ইভানভ্‌না জবাব দিচ্ছিল আনমনার মতো, না ভেবে-চিন্তে। এতে রুষ্ট হল কাউন্টেস।

'কী হল তোর মা, বল তো? আমার কথা তুই শুনছিস না, নাকি বুঝতে পারছিস না... ভগবানের দয়ায় আমার কথায় এখনো জড়তা আসে নি, মাথাও খারাপ হয় নি আমার!'

লিজাভেতা ইভানভ্‌না কিছুই শুনছিল না। বাড়ি ফিরে সে ছুটে গেল তার ঘরে, দস্তানা থেকে বার করল চিঠিটা। তাতে কোনো সীল-মোহর ছিল না। লিজাভেতা ইভানভ্‌না পড়লে সেটা। আছে তাতে প্রেমের নিবেদন, কোমল, সশ্রদ্ধ, প্রতিটি শব্দ জার্মান উপন্যাস থেকে নেওয়া। কিন্তু লিজাভেতা ইভানভ্‌না জার্মান জানত না, তাই খুব খুশি হয়ে উঠল সে।

** দেবী আমার, আমি পড়ে উঠতে পারার চেয়ে আরো দ্রুত চার পাতা করে চিঠি লিখবেন। (ফরাসী)

তবে চিঠিটা গ্রহণ করায় ভারি অস্থির বোধ হতে লাগল তার। নবীন যুবকের সঙ্গে এই তার প্রথম গোপন ঘনিষ্ঠতা। তার স্পর্ধায় ভয় পাচ্ছিল সে। অসাবধান আচরণের জন্যে নিজেকে সে ভর্ৎসনা করছিল, ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে: জানলার কাছে বসা ছেড়ে দেবে, যুবক অফিসারটির পক্ষ থেকে আরো এগুবার বাসনা সে শীতল করে দেবে কোনো মনোযোগ না দেখিয়ে? — চিঠিটা ফেরত পাঠাবে তার কাছে? — নিষ্প্রাণ দৃঢ়চিত্ত জবাব দেবে? কারো কাছে পরামর্শ নেবার মতো কেউ তার ছিল না, না ছিল বান্ধবী, না উপদেষ্টা। লিজাভেতা ইভানভ্না ঠিক করলে জবাব দেবে।

লেখার টেবিলের সামনে কাগজ কলম নিয়ে বসে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। বার কয়েক চিঠি শুরু করে তা ছিঁড়ে ফেলল আবার: কথাগুলো কখনো মনে হল বড়ো বেশি প্রশ্রয় দানের মতো, কখনো বড়ো বেশি কঠোর। শেষ পর্যন্ত কয়েকটা পঙক্তি সে লিখে উঠতে পারল যাতে তুষ্ট বোধ করল সে। লিখলে, 'আমি বিশ্বাস করি যে আপনার সংকল্প অসাধু নয়, অবিবেচিত আচরণে আমায় অপমানিত করতে আপনি চান নি: কিন্তু আমাদের পরিচয় ওভাবে শুরু হওয়া উচিত নয়। আপনার চিঠি আপনাকে ফেরত পাঠাচ্ছি এবং আশা করি ভবিষ্যতে অনুচিত অশ্রদ্ধার অভিযোগ আমায় করতে হবে না।'

পরের দিন হেরমানকে যেতে দেখে লিজাভেতা ইভানভ্না তার সেলাই রেখে বেরিয়ে এল হলে, ওপর জানলাটা খুলে চটপটে অফিসারের ভরসায় চিঠিটা ছুড়ে দিলে রাস্তায়। হেরমান ছুটে এসে সেটা তুলে নিলে এবং ঢুকল মিষ্টির দোকানে। সীল-মোহর ছিঁড়ে সে পেল তার নিজের চিঠি আর লিজাভেতা ইভানভ্নার জবাব। এটাই সে আশা করেছিল, বাড়ি ফিরল নিজের মতলবে নিবিষ্ট হয়ে।

এর তিন দিন পরে ফ্যাশন বিপণির ক্ষিপ্রনয়না তরুণী মাদমুয়াজেল লিজাভেতা ইভানভনাকে এনে দিল একটা চিরকুট।

লিজাভেতা ইভানভ্না সেটা খুলল অস্থিরচিত্তে, ভেবেছিল টাকার কোনো দাবি আছে, হঠাৎ চিনতে পারল হেরমানের হস্তাক্ষর।

বললে, 'আপনার ভাই ভুল হয়েছে, এ চিরকুট আমার জন্যে নয়।'

'না, খোদ আপনার জন্যেই,' ধূর্ত হাসিটুকু না চেপেই জবাব দিলে অসংকুচিতা মেয়েটি, 'পড়ে দেখুন-না।'

লিজাভেতা ইভানভ্‌না দ্রুত চোখ বুলাল চিরকুটটায়। হেরমান তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'হতে পারে না!' অচিরাৎ এই দাবি এবং তা পেশ করার পদ্ধতিতে ভয় পেয়ে বললে লিজাভেতা ইভানভ্‌না, 'এ চিঠি সত্যিই আমাকে নয়,' চিঠিটা সে কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে।

'চিঠিটা যদি আপনার জন্যে না হয়ে থাকে, তা হলে ছিঁড়লেন কেন?' বললে মাদমুয়াজেল, 'যে পাঠিয়েছে তাকে ফেরত দিতাম আমি।'

'দয়া করে আমার জন্যে আর চিরকুট আনবেন না,' লাল হয়ে উঠে বললে লিজাভেতা ইভানভ্‌না, 'আর যে আপনাকে পাঠিয়েছে তাকে বলবেন যে তার লজ্জা হওয়া উচিত।'

হেরমান কিন্তু মানা মানল না। কোনো না কোনো ভাবে লিজাভেতা ইভানভ্‌না চিঠি পেতে লাগল রোজই। সে চিঠি আর জার্মান থেকে অনুবাদ নয়। হেরমান লিখত হৃদয়াবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে, কথা বলত তার নিজের ভাষায়; তাতে প্রকাশ পেত তার কামনার উদগ্রতা আর বল্গাহীন কল্পনার উচ্ছৃংখলতা। লিজাভেতা ইভানভ্‌না সেগুলো ফেরত পাঠাবার কথা আর ভাবত না, বরং মাতাল হয়ে উঠত তাতে। উত্তর দিতে বসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তার চিঠি হয়ে উঠত দীর্ঘ আর কোমল। অবশেষে জানলা দিয়ে সে ছুড়ে দিল এই চিঠিখানা:

'আজ ...এর দূতের বাড়িতে বলনাচ। কাউণ্টেস থাকবেন সেখানে। আমরা থাকব রাত দুটো পর্যন্ত। একলা দেখা করার এই আপনার সুযোগ। কাউণ্টেস বেরিয়ে যেতেই তাঁর লোকজন নিশ্চয় চলে যাবে। বারান্দায় থাকবে কেবল দরোয়ান তবে সেও সাধারণত চলে যায় নিজের কুঠরিতে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ আসুন। সোজা সিঁড়ির কাছে। বাইরের ঘরে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, জিজ্ঞেস করবেন, কাউণ্টেস বাড়ি আছেন কি? আপনাকে বলবে, নেই, তখন আর করার কিছু থাকবে না, আপনাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু খুবই সম্ভব যে কারো সঙ্গে দেখা হবে না আপনার। ঝিয়েরা সবাই বসে থাকে নিজেদের কামরায়, একই ঘরে। বাইরের ঘর থেকে

বাঁয়ের দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে যাবেন কাউণ্টেসের শোবার ঘর অবধি। সেখানে পর্দার পেছনে দেখবেন ছোটো ছোটো দুটো দরজা। ডাইনেরটা স্টাডিতে, কদাচ সেখানে ঢোকেন না কাউণ্টেস। বাঁয়ের দরজাটা করিডরে যাবার জন্যে... সেখানেই সরু পাক-দেওয়া সিঁড়ি, সেটা গেছে সোজা আমার কামরায়।'

নির্ধারিত মুহূর্তটায় হেরমান ছটফট করছিল বাঘের মতো। রাত দশটাতেই সে কাউণ্টেসের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আবহাওয়াটা ছিল কদর্য, বাতাস গোঙাচ্ছে, ভেজা ভেজা বরফ পড়ছে, বাড়িতে মিটমিটে আলো, রাস্তা জনশূন্য। মাঝে মাঝে বিলম্বিত যাত্রীর খোঁজে রোগা বেতো ঘোড়ার ছ্যাকড়া গাড়িতে টু' মারছিল গাড়োয়ান। হেরমান দাঁড়িয়ে ছিল শুধু ফ্রক কোট পরে। অবশেষে কোচ গাড়ি এল কাউণ্টেসের জন্যে। হেরমান দেখল নকুল ফারের কোটে জড়ানো কুব্জা বৃদ্ধাকে ধরে ধরে আনছে চাকরেরা, তাঁর পেছনে হালকা কোট পরে ঝলক দিল তাঁর পোষ্যের মূর্তি, মাথায় টাটকা ফুল গোঁজা। দরজা বন্ধ হল। শিথিল তুষারের ওপর দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল কষ্টে। দরোয়ান ফটক বন্ধ করলে। অন্ধকার হয়ে এল জানলাগুলো। শূন্য বাড়িটার কাছে পায়চারি করতে লাগল হেরমান; ল্যাম্পপস্টে এসে সে ঘড়ি দেখল: এগারোটা বেজে বিশ। সেখানেই দাঁড়িয়ে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল ঘড়ির কাঁটার দিকে, অপেক্ষা করতে লাগল বাকি মুহূর্তগুলোর। ঠিক সাড়ে এগারোটায় সে উঠল কাউণ্টেস ভবনের অলিন্দে, ঢুকল আলোকোজ্জ্বল প্যাসেজে। কোনো দারোয়ান ছিল না। হেরমান সিঁড়ি দিয়ে উঠল, বাইরের দরজা খুলে দেখল বাতির নীচে পুরনো তেলচিটে কেদারায় ঘুমিয়ে আছে একটা চাকর। লঘু, দৃঢ়চিত্ত পায়ে হেরমান গেল তার পাশ দিয়ে। হল আর ড্রয়িং-রুম অন্ধকার। বাইরের ঘর থেকে সেখানে আলো আসছিল সামান্য। শোয়ার ঘরে ঢুকল হেরমান। সাবেকী দেবপটের সামনে জ্বলছে সোনার প্রদীপ। চীনা ওয়াল-পেপার সাঁটা দেয়াল বরাবর বুটিদার বিবর্ণ আরাম-কেদারা আর তাকিয়া বিছানো, গিল্টি উঠে যাওয়া সোফাগুলো রয়েছে এক করুণ সমন্বয়ে। দেয়ালে প্যারিস থেকে মাদাম লেব্রেঁর আঁকা দুটি প্রতিকৃতি। একটিতে বছর চল্লিশের এক পুরুষ, হৃষ্টপুষ্ট, লালচে রঙ, পরনে তারকা আঁটা উজ্জ্বল-

সবুজ উর্দি, দ্বিতীয়টিতে শুকনাসা এক তরুণী সুন্দরীর ছবি, মাথার দুপাশ সযত্নে আঁচড়ানো, পাউডার ছিটানো চুলে গোলাপ। প্রতি কোণ থেকে উঁকি দিচ্ছে চিনেমাটির রাখালিনী, বিখ্যাত লেরুয়ার বানানো ভোজনকক্ষের ঘড়ি, কৌটো, রুলেত, পাখা এবং মঙ্গোলফিয়ে বেলুন আর মেসমেরের সম্মোহনী বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গত শতকের শেষ দিকে আবিষ্কৃত নানান মেয়েলী খেলনা। পর্দার পেছনে গেল হেরমান। সেখানে ছোটো একটা লোহার খাট। ডাইনে পাওয়া গেল স্টাডিতে যাবার দরজা, বাঁয়েরটা করিডরের জন্যে। হেরমান সেটা খুলে দেখতে পেল সরু পাকদণ্ডি সিঁড়ি যা গেছে গরিব প্রতিপালিতার কুঠরিতে... কিন্তু দরজাটা বন্ধ করে হেরমান ঢুকল অন্ধকার স্টাডিতে।

সময় কাটতে লাগল ধীরে ধীরে। সব চুপচাপ। ড্রয়িং-রুমে বারোটা বাজতে শোনা গেল। সব কটা ঘরেই একের পর এক বারোটা বাজার ঘণ্টা দিয়ে চুপ করে গেল ঘড়িগুলো। ঠাণ্ডা চুল্লিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেরমান। অস্থিরতা নেই তার; বিপজ্জনক কিন্তু প্রয়োজনীয় কিছু একটা করার সংকল্প করেছে যে লোক, তার মতোই বুক তার স্পন্দিত হচ্ছিল সমতালে। একটা বাজল, তারপর ভোর দুটো — তার কানে এল কোচ গাড়ির সুদূর ঘর্ঘর। অজ্ঞাতসারে একটা উত্তেজনা পেয়ে বসল তাকে। গাড়ি এসে থামল। পাদানি নামাবার শব্দ শুনল সে। সোরগোল পড়ে গেল বাড়িতে। শুরু হল ছুটোছুটি, চেঁচামেচি, আলো জ্বলে উঠল। শোবার ঘরে ছুটে এল তিনজন বুড়ি দাসী, প্রায় অর্ধমৃত অবস্থায় কাউণ্টেস বসে পড়লেন তাঁর ভলটেয়ারী আরাম কেদারায়। দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাল হেরমান: লিজাভেতা ইভানভ্না, চলে গেল তার কাছ দিয়েই। ঘরে যাবার সিঁড়িতে শোনা গেল তার ব্যস্ত পদশব্দ। বুকে বিবেকদংশনের মতো কিছু একটা অনুভব করল হেরমান, ফের তা থেমে গেল। পাথর হয়ে গেল সে।

আয়নার সামনে সাজ-পোশাক খোলা হতে লাগল কাউণ্টেসের। খসানো হল গোলাপ বসানো টুপি। সমানে ছেঁটে দেওয়া শাদা মাথা থেকে খোলা হল পাউডার ছিটানো পরচুলা। বৃষ্টি ধারায় তাঁর কাছে ঝরে পড়ছে যত রাজ্যের পিন। রুপোলি জরির নকশা তোলা হলুদ গাউন

খসে পড়ল তাঁর ফুলো ফুলো পায়ের কাছে। কাউণ্টেসের প্রসাধনের জঘন্য রহস্যের দর্শক হয়ে রইল হেরমান; অবশেষে কাউণ্টেসের পরনে উঠল শোবার পোশাক আর নাইট ক্যাপ। তাঁর বার্ধক্যের পক্ষে বেশি উপযোগী এই বেশে তাঁকে মনে হল কম বীভৎস ও কদাকার।

সাধারণভাবে সমস্ত বৃদ্ধের মতোই কাউণ্টেস ভুগতেন নিদ্রাহীনতায়। পোশাক ছেড়ে তিনি জানলার কাছে ভলটেয়ারী চেয়ারে বসে দাসীদের পাঠিয়ে দিলেন। মোমবাতিগুলো সরিয়ে নেওয়া হল, ঘরখানায় ফের আলো দিতে লাগল শুধু প্রদীপটা। কাউণ্টেস বসে রইলেন একেবারে হলুদ-রঙা, ঝুলন্ত ঠোঁট নড়ছে, হেলছেন ডাইনে-বাঁয়ে। তাঁর ঘোলাটে চোখে চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই। দেখে মনে হতে পারত যে বীভৎস বৃদ্ধার দোলানিটা ঘটছে তাঁর ইচ্ছাবশে নয়, কী একটা গহণ বিদ্যুৎপ্রবাহে।

হঠাৎ এই নিষ্প্রাণ মুখখানা অবিশ্বাস্য রকমে বদলে গেল। বন্ধ হল ঠোঁট নড়া, ঝকঝক করে উঠল চোখ: কাউণ্টেসের সামনে অচেনা একটা মানুষ।

সুস্পষ্ট মৃদু স্বরে সে বললে, 'ভয় পাবেন না, দোহাই ভগবান, ভয় পাবেন না! আপনার কোনো অনিষ্ট করার ইচ্ছে নেই আমার। আপনার কাছে আমি শুধু একটি কৃপার প্রার্থী।'

বৃদ্ধা নীরবে চাইল তার দিকে, মনে হল তার কথা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। হেরমান অনুমান করল যে উনি কালা, তাঁর কানের কাছে মুখ এনে সে পুনরাবৃত্তি করল একই কথার। আগের মতোই চুপ করে রইল বৃদ্ধা।

হেরমান বলে চলল, 'আপনি আমার জীবনে সৌভাগ্য এনে দিতে পারেন, তাতে কোনোই ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই আপনার। আমি জানি যে আপনি পর পর তিনটে বাজির তাস বলে দিতে পারেন...'

হেরমান থেমে গেল। মনে হল কাউণ্টেস বুঝতে পেরেছেন কী চাওয়া হচ্ছে তাঁর কাছে। মনে হল, জবাব দেবার শব্দ খুঁজছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'ওটা একটা রসিকতা। দিব্যি দিয়ে বলছি আপনাকে! ওটা রসিকতা!'

'এটা রসিকতার ব্যাপার নয়,' রেগে আপত্তি করলে হেরমান,

'চাপলিৎস্কির কথা মনে করুন, যাকে জিততে সাহায্য করেছেন আপনি।'

স্পষ্টতই বিব্রত হয়ে পড়লেন কাউন্টেস। মনের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়ন ফুটে উঠল তাঁর চেহারায়, কিন্তু শিগগিরই তিনি তাঁর পূর্বের নিরুত্তাপ মনোভঙ্গিতে ফিরে এলেন।

'আপনি কি আমায় তিনটে অব্যর্থ তাসের হদিশ দিতে পারেন?' বললে হেরমান।

চুপ করে রইলেন কাউন্টেস। হেরমান বলে চলল:

'কার জন্যে আপনার গোপন রহস্যটা আপনি জমিয়ে রাখছেন? নাতিদের জন্যে? এমনিতেই ওরা ধনী; টাকার মূল্যই তারা জানে না। উড়নচণ্ডেদের কোনো লাভ হবে না আপনার তাস তিনটেয়। পৈতৃক ধন যে বাঁচাতে জানে না, হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও সে মরবে দারিদ্র্যেই। আমি উড়নচণ্ডে নই। টাকার দাম আমি বুঝি। আমার ক্ষেত্রে আপনার তাস তিনটে জলে যাবে না। বলুন!'

থেমে গিয়ে দুরুদুরু বুকে সে অপেক্ষা করতে লাগল জবাবের। কাউন্টেস চুপ করে রইলেন; নতজানু হয়ে বসল হেরমান।

বললে, 'আপনার হৃদয়ে যদি কখনো ভালোবাসার আবেগ জেগে থাকে, যদি তার উল্লাস মনে করতে পারেন আপনি, নবজাত পুত্রের কান্নায় যদি অন্তত একবারও হাসি ফোটে আপনার মুখে, আপনার বুকের মধ্যে কখনো যদি মানবিক কিছু স্পন্দিত হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী, প্রেমাস্পদা, মা — জীবনে পবিত্র যা কিছু আছে, সবের দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করবেন না। আপনার গোপন রহস্যটা আমায় জানান! — ওতে আপনার কী এসে যায়? হয়ত কোনো ভয়াবহ পাপের সঙ্গে, স্বর্গসুখ হারানোর সঙ্গে, কোনো নারকীয় ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তার যোগ আছে, ভেবে দেখুন, আপনি বৃদ্ধা, বেশি দিন বাঁচবেন না। আপনার সমস্ত পাপ আমি নিজের কাঁধে নিতে রাজী। শুধু আপনার গোপন রহস্যটা বলুন। ভেবে দেখুন, একটা লোকের সৌভাগ্য আপনার হাতে; শুধু আমি নয়, আমার ছেলেপিলেরা, পৌত্র-প্রপৌত্ররা আপনার স্মৃতির জয়জয়কার করবে, পবিত্র বলে সম্মান জানাবে।'

বৃদ্ধা কোনো জবাব দিলেন না।

হেরমান উঠে দাঁড়াল।

দাঁত কড়মড় করে বললে, 'বুড়ি ডাইনী! তোমার মুখ খোলাব এই উপায়ে।'

এই বলে সে পিস্তল বার করল পকেট থেকে।

পিস্তল দেখে দ্বিতীয় বার চঞ্চল হয়ে উঠলেন কাউণ্টেস। মাথা নাড়লেন তিনি, হাত তুললেন যেন গুলি ঠেকাবার জন্যে। তারপর চিৎপাত হয়ে গড়িয়ে পড়ে নিথর হয়ে গেলেন।

তার হাত ধরে হেরমান বললে, 'ছেলেমানুষি করা থামান। শেষ বারের মতো জিজ্ঞেস করছি, আপনার তিনটে তাসের হদিশ আমায় দেবেন, নাকি না?'

কাউণ্টেস জবাব দিলেন না। হেরমান দেখল তিনি মারা গেছেন।

৪

7 Mai 18...
Homme sans moeurs et sans religion!**

পত্রাবলি।

লিজাভেতা ইভানভ্‌না তার বলনাচের পোশাক না ছেড়েই বসেছিল তার ঘরে, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। অনিচ্ছায় যে নিদ্রাতুর দাসীটি তার সেবায় এসেছিল, তাকে সে বললে যে পোশাক ছাড়বে সে নিজেই, দুরুদুরু বুকে ঢুকল নিজের ঘরে, একদিকে আশা হেরমানকে দেখতে পাবে, অন্যদিকে অনিচ্ছা, না দেখাই ভালো। প্রথম দৃষ্টিতেই সে নিশ্চিত হল যে ও নেই, অভিসারে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্যে ধন্যবাদ দিল ভাগ্যকে।

** ৭ মে ১৮...। এমন লোক যার কোনো নৈতিকতা ও পবিত্রতার বালাই নেই। (ফরাসী)

পোশাক না ছেড়ে সে বসল, অত অল্প সময়ে তাকে আচ্ছন্ন করেছিল যে ঘটনাচক্র, ভাবতে লাগল তার কথা। জানলায় তরুণকে প্রথম দেখার পর তিন সপ্তাহ না যেতেই শুরু হল চিঠি লেখালেখি, নৈশ অভিসারের দাবি করে বসল লোকটা! তার নামটা সে জেনেছে শুধু এইজন্যে যে কয়েকটা চিঠিতে তার স্বাক্ষর ছিল; কখনো তার সঙ্গে কথা কয় নি, কখনো তার কথা শোনে নি, জানে নি তার খবর... শুধু আজকের সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত। আশ্চর্য ব্যাপার। এই সন্ধ্যায় বলনাচে যুবতী প্রিন্সেস পলিনা বরাবরের মতো ছেনালিও করে নি তোমস্কির সঙ্গে, তাতে প্রতিশোধ নেবার জন্যে তোমস্কি উদাসীনতা অবলম্বন করল তার প্রতি, লিজাভেতা ইভানভনাকে ডেকে অবিরাম মাজুরকা নাচল। আর সব সময়ে ঠাট্টা করলে ইঞ্জিনিয়র অফিসারদের জন্যে তার দুর্বলতা নিয়ে, বললে তার পক্ষে যা অনুমান করা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি সে জানে। গোটাকত তার রসিকতা এমন মোক্ষম হয়েছিল যে মাঝে মাঝে লিজাভেতা ইভানভ্নার মনে হচ্ছিল যে তার গোপন কথা তোমস্কি জেনে গেছে।

হেসে সে জিগ্যেস করলে, 'কোত্থেকে এসব শুনলেন?'

'বন্ধুর কাছ থেকে, আপনার পরিচিত একজন কেউ-কেটা,' জবাব দিলে তোমস্কি, 'অতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি!'

'তা এই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি কে?'

'তার নাম হেরমান।'

কোনো উত্তর দিলে না লিজাভেতা ইভানভ্না কিন্তু হাত-পা তার হিম হয়ে এল।

তোমস্কি বলে গেল, 'এই হেরমানটা অসাধারণ রোম্যাণ্টিক এক লোক। মুখের আদলে নেপলিয়ন, আত্মাটা মেফিস্টোফিলেস। আমার ধারণা, অন্তত তিনটে দুষ্কর্ম ওর বিবেকে বি'ধে আছে। কী ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন আপনি!'

'মাথা ধরেছে আমার... কী বলেছে আপনাকে হেরমান... মানে কী যেন ওর নাম?'

'বন্ধুর ওপর হেরমান খুবই অসন্তুষ্ট: সে বলে যে ও হলে সে একেবারেই অন্যরকম ব্যবহার করত... আমার এমনকি এও মনে হয় যে

সে আপনার পরিণয়-প্রার্থী। অন্তত বন্ধুর প্রেমোচ্ছ্বাস সে শোনে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে।'

'কিন্তু কোথায় সে দেখল আমায়?'

'গির্জায়, হয়ত-বা বেড়াবার সময়! ভগবান জানেন! কিংবা আপনার কামরায়, আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন: ওর পক্ষে সবই সম্ভব...'

'Oubli ou regret?'** এই প্রশ্নে তিনজন মহিলা তাদের দিকে এগিয়ে আসায় থেমে গেল কথোপকথন, যা লিজাভেতা ইভানভ্নার কাছে হয়ে উঠেছিল যন্ত্রণাকর রকমের আগ্রহজনক।

যে মহিলাটিকে তোমস্কি নির্বাচন করল তিনি সেই প্রিন্সেস। বাড়তি একটা পাক খেয়ে এবং নিজের টেবিলের কাছে বাড়তি আরেক বার ঘুরে তিনি বোঝাবুঝি করে নিতে পেরেছেন তোমস্কির সঙ্গে। নিজের স্বস্থানে ফিরে তোমস্কি হেরমান বা লিজাভেতা ইভানভ্না কারো কথাই আর ভাবছিল না। ছিন্ন আলাপটা আবার শুরু করার দারুণ ইচ্ছা হয়েছিল লিজাভেতা ইভানভ্নার; কিন্তু মাজুরকা শেষ হয়ে গেল, শিগ্‌গিরই চলে গেলেন বৃদ্ধা কাউণ্টেস।

তোমস্কির কথাগুলো নৃত্যকালীন বকবকানি ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু কল্পনাপ্রবণ তরুণীর মনে তা গেঁথে গেল গভীরভাবে। তোমস্কি যে ছবিটা দিল, তার সঙ্গে ওর নিজেরই কল্পনার মিল ছিল এবং আধুনিক উপন্যাসগুলির দৌলতে এই মামুলী চেহারাটা তাকে ভয় পাওয়াল, আচ্ছন্ন করল তার কল্পনা। নগ্ন দুহাত আড়াআড়ি রেখে সে বসে রইল খোলা বুকের ওপর মাথা নুইয়ে, তাতে তখনো ফুল গোঁজা... হঠাৎ দরজা খুলে ঢুকল হেরমান। লিজাভেতা ইভানভ্নায় থরথর করে উঠল...

'কোথায় ছিলেন আপনি?' সভয়ে জিগ্যেস করল সে ফিসফিসিয়ে।

'বৃদ্ধা কাউণ্টেসের শোবার ঘরে,' হেরমান জবাব দিলে, 'সেখান থেকেই আসছি। কাউণ্টেস মারা গেছেন।'

'মাগো!.. কী বলছেন আপনি?'

'আর মনে হয়,' বলে চলল হেরমান, 'আমিই তার মৃত্যুর কারণ।'

** বিস্মরণ নাকি আফসোস। (ফরাসী)

লিজাভেতা ইভানভ্না তাকাল তার দিকে, মনের মধ্যে তার বেজে উঠল তোমস্কির কথাগুলো: **অন্তত তিনটে দুষ্কর্ম বিঁধে আছে লোকটার বিবেকে!** জানলার কাছে তার পাশাপাশি বসে হেরমান তাকে সবই বললে।

লিজাভেতা ইভানভ্না তার কথা শুনলে আতঙ্কিত হয়ে। তার মানে, হৃদয়াবেগে ভরা এইসব চিঠি, উদগ্র এইসব দাবি, উদ্ধত একাগ্র পশ্চাদ্ধাবন — এসব তা হলে প্রেম নয়! টাকা! তার প্রাণ ছিল তারই জন্যে আকুল! সে তার বাসনা মিটিয়ে তাকে সুখী করতে পারত না! বেচারি পোষ্যা এক দস্যুর, তার বৃদ্ধা হিতৈষিণীর হত্যাকারীর অন্ধ সহায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়! বিলম্বিত অনুশোচনায় সে কাঁদতে লাগল যন্ত্রণায়। হেরমান নীরবে চেয়ে দেখল তার দিকে: তারও বুক ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিল কিন্তু বেচারি মেয়েটির কান্না, তার শোকের আশ্চর্য রমণীয়তা, কিছুই উৎকণ্ঠিত করে তুলল না তার কঠোর হৃদয়। বৃদ্ধার মৃত্যুর কথা ভেবে কোনো বিবেকদংশন বোধ করল না সে। শুধু একটা জিনিসেই তার ত্রাস: যে গুপ্ত রহস্য থেকে সে ধনলাভের আশা করছিল, তা খোয়া গেছে, সে আর ফেরবার নয়।

'আপনি পিশাচ!' শেষ পর্যন্ত বললে লিজাভেতা ইভানভ্না।

'আমি ওঁর মৃত্যু চাই নি,' জবাব দিলে হেরমান, 'পিস্তলে আমার গুলি ছিল না।'

চুপ করে রইল দুজনে।

সকাল হয়ে আসছে। পুড়ে আসা বাতি নিবিয়ে দিল লিজাভেতা ইভানভ্না: ফিকে আভায় আলো হয়ে উঠল তার ঘর। কান্নাভেজা চোখ মুছে সে চাইল হেরমানের দিকে। হাত গুটিয়ে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে সে বসে আছে জানলার কাছে। এই অবস্থায় সে আশ্চর্য রকম মনে করিয়ে দিচ্ছে নেপলিয়নের প্রতিকৃতির কথা। এই সাদৃশ্য এমনকি লিজাভেতা ইভানভ্নাকেও চমকিত করল।

'আপনি বাড়ি থেকে বেরুবেন কেমন করে?' অবশেষে জিগ্যেস করলে লিজাভেতা ইভানভ্না, 'ভেবেছিলাম আপনাকে গুপ্ত সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে যাব, কিন্তু তাতে শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, আমার ভয় করছে...'

'গুপ্ত সিঁড়িটা পাওয়া যাবে কী করে বলুন; আমি চলে যাই।'

উঠে দাঁড়াল লিজাভেতা ইভানভ্না, দেরাজ থেকে চাবি বার করে হেরমানকে দিল, বুঝিয়েও বললে বিশদ করে। হেরমান তার ঠাণ্ডা, নিঃসাড় হাতে চাপ দিলে, তার আনত মাথায় চুমু খেয়ে বেরিয়ে গেল।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে সে ফের এল কাউণ্টেসের শোবার ঘরে। মৃত বৃদ্ধা বসে আছে পাথর হয়ে; মুখে ওর গভীর প্রশান্তি। হেরমান তার সামনে থেমে অনেকখন চেয়ে রইল তার দিকে, যেন ভয়াবহ সত্যটায় সুনিশ্চিত হতে চায়। শেষ পর্যন্ত গেল কেবিনেটে, ওয়াল-পেপারের ওপর হাতড়ে হাতড়ে পেল দরজা, বিচিত্র অনুভূতিতে আলোড়িত হয়ে নামতে লাগল অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে। তার মনে হল, সম্ভবত ষাট বছর আগে ঠিক এই সময়েই, ঠিক এই সিঁড়ি বেয়েই ঠিক এই শোবার ঘরেই নকশা-তোলা কাফতান পরে, á l'oiseau royal** কেশবিন্যাস করে বুকের কাছে তেকোণা টুপিটি চেপে ধরে এসেছে সৌভাগ্যবান যুবক, যে বহুকাল আগেই ক্ষয়ে গেছে কবরে আর আজ বন্ধ হল বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ তার প্রণয়িনীর হৃৎস্পন্দন...

সিঁড়ির নিচে হেরমান দরজা পেল, একই চাবি দিয়ে তা খুলে পেঁছিল যাতায়াতের করিডরে, সেখান থেকে রাস্তায়।

৫

> এ রাতে আমায় দেখা দিলেন
> লোকান্তরিতা ব্যারনেস ফন ভ...।
> সর্বাঙ্গে তাঁর শাদা পোশাক, আমায়
> বললেন, 'নমস্কার হের কাউনসেলার!'
>
> শ্ভেডেনবর্গ।

করাল সেই রাত্রির তিনদিন পর হেরমান সকাল ন'টায় রওনা দিল ...মঠে, এখানেই মৃতা কাউণ্টেসের অন্ত্যোষ্টি ক্রিয়া হবার কথা। অনুশোচনা বোধ না করলেও সে বিবেকের এই পুনঃপুনঃ কণ্ঠস্বর চাপা দিতে পারছিল না: তুই বুড়িকে খুন করেছিস! সত্যকার ঈশ্বরভক্তি তার বিশেষ

** 'রাজার পাখি'। (ফরাসী)

না থাকলেও কুসংস্কার ছিল অনেক। তার বিশ্বাস হয়েছিল, মৃতা কাউণ্টেস তার জীবনের ওপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন — তাই স্থির করলে, ক্ষমালাভের জন্যে তাঁর সৎকারে যাবে।

গির্জা লোকে লোকারণ্য। হেরমানকে জোরজার করে ঢুকতে হল ভিড় ঠেলে। মখমলের চাঁদোয়ার নিচে জমকালো শবাধারের ওপর কফিন, তাতে বুকের ওপর হাত জোড় করে শাদা রেশমের পোশাকে শুয়ে আছেন মৃতা, মাথায় লেসের টুপি। চারপাশে তাঁর ঘরের লোকজন: কাঁধে তকমা আঁটা ফিতে আর হাতে মোমবাতি নিয়ে কালো কাফতান পরা চাকর-বাকর; গভীর শোকাচ্ছন্ন আত্মীয়স্বজন — পৌত্র আর প্রপৌত্রেরা। কেউ কাঁদছিল না; চোখের জল হত une affectation**। কাউণ্টেস এতই বৃদ্ধা ছিলেন যে তাঁর মৃত্যুতে কারো বিস্মিত হওয়া সম্ভব নয়; তাঁর আত্মীয়রা বহুদিন থেকেই ভাবেন উনি অতিক্রান্ত-আয়ু। অন্ত্যেষ্টি বাণী উচ্চারণ করলেন যুবক বিশপ, সহজ মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি সাধ্বীর শান্ত স্বর্গারোহণের কথা বললেন, খ্রিষ্টীয় অন্তিমের জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে তিনি তৈরি হচ্ছিলেন শান্তভাবে। 'মৃত্যুর দেবদূত নিয়েছেন ওঁকে,' বললেন বক্তা, 'যিনি কল্যাণের ভাবনায় আর উত্তরী পাণিপ্রার্থীর অপেক্ষায় উৎফুল্ল।' অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হল বিষণ্ণ ঔচিত্যে। মৃত দেহের কাছ থেকে বিদায় নিতে প্রথম গেল আত্মীয়রা। তারপর এগুল অসংখ্য অতিথি, তাদের অসার ফুর্তিতে যিনি এতকাল ধরে যোগ দিয়ে এসেছেন তাঁকে সম্ভ্রম জানাবার জন্যে এসেছে তারা। তারপর বাড়ির চাকর-বাকর। অতঃপর কাছে গেলেন কাউণ্টেসের অধীনস্থ বৃদ্ধা জমিদারনী, মৃতার সমবয়সী। দু'জন তরুণী তাঁকে ধরে ধরে নিয়ে গেল। আভূমি আনত হবার শক্তি ছিল না তাঁর — হাতে চুম্বন করে শুধু তিনি একা কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললেন। তাঁর পর হেরমান ঠিক করল কফিনের কাছে যাবে। আভূমি কুর্নিশ করে সে কয়েক মিনিট পড়ে রইল ফার গাছের ডাল ছড়ানো ঠাণ্ডা মেঝের ওপর; তারপর শববেদীর সিঁড়িতে উঠে অভিবাদন করল... সেই মুহূর্তে তার মনে হল যেন মৃতা উপহাসের ভঙ্গিতে এক

** ভান। (ফরাসী)

চোখ কুঁচকে তাকাল তার দিকে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে যেতে গিয়ে হেরমান চিতপাত হয়ে পড়ল মাটিতে। ধরে তোলা হল তাকে। ঠিক সেই সময় মূর্ছিত লিজাভেতা ইভানভ্‌নাকে নিয়ে আসা হল গির্জার গাড়ি-বারান্দায়। এ ঘটনায় কয়েক মিনিটের জন্যে ক্ষুণ্ণ হয়ে গেল বিষণ্ণ অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য। চাপা গুঞ্জন উঠল সমাগতদের মধ্যে আর মৃতার নিকট আত্মীয়, রোগাটে এক দরবারী ভদ্রলোক তার পাশে দণ্ডায়মান এক ইংরেজের কানে কানে বলাল যে যুবক অফিসারটি মৃতার জারজ পুত্র, জবাবে ইংরেজটি নিরুত্তাপ গলায় বললে: বটে?

সারা দিন অসাধারণ বিচলিত হয়ে রইল হেরমান। নির্জন একটা ভোজনালয়ে আহার সারতে গিয়ে তার যা কীর্তি নয়, ভেতরকার চাঞ্চল্য চাপা দেবার জন্যে মদ টানল প্রচুর। কিন্তু মদে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল তার কল্পনা। বাড়ি ফিরে সে পোশাক না ছেড়েই বিছানায় কাত হল এবং ঘুমিয়ে পড়ল অঘোরে।

ঘুম ভাঙল রাত্রে, জ্যোৎস্নায় আলো হয়ে উঠেছে তার ঘরখানা। ঘড়ি দেখল সে: তিনটে বাজতে পনেরো। ঘুম ওর চলে গিয়েছিল, বসে বসে ভাবতে লাগল বৃদ্ধা কাউণ্টেসের সৎকারের কথা।

এই সময় বাইরে থেকে জানলা দিয়ে কে যেন উঁকি দিল তার দিকে এবং সঙ্গেই সরে গেল। সেদিকে কোনো মন দিল না হেরমান। কয়েক মিনিট বাদে বাইরের ঘরে দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল তার। ভাবল তার আর্দালি বরাবরের মতো মাতাল হয়ে নৈশ আড্ডা থেকে ফিরছে। কিন্তু অপরিচিত চলনের শব্দ শুনতে পেল সে। কে যেন হাঁটছে মৃদু মৃদু জুতো ঘষে ঘষে। দরজা খুলে গেল, ঢুকল শাদা পোশাকে এক নারী। হেরমান মনে করল সে তার বুড়ি ধাই-মা, এমন অসময়ে এল কেন ভেবে অবাক লাগল তার। কিন্তু শাদা পোশাকের নারী দরজা দিয়ে গলে হঠাৎ এসে দাঁড়াল তার সামনে — হেরমান চিনতে পারল সে কাউণ্টেস!

দৃঢ় স্বরে তিনি বললেন, 'আমি তোমার কাছে এলাম নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূরণ করার আদেশ পেয়েছি আমি। তিরি, সাত আর টেক্কা পর পর জিতিয়ে দেবে তোমায়, কিন্তু এই শর্তে যে দিনে একবারের বেশি তাস ধরবে না, তারপর আর কোনো দিন জুয়া

খেলবে না জীবনে। আমার মৃত্যুর জন্যে তোমায় ক্ষমা করছি এই উদ্দেশ্যে যাতে তুমি বিয়ে করো আমার প্রতিপালিতা লিজাভেতা ইভানভ্নাকে...'

এই বলে তিনি আস্তে করে ঘুরে জুতো ঘষে এগুলেন দরজার দিকে। প্যাসেজে দরজা বন্ধ হতে শুনল হেরমান এবং দেখল, সে যেন আবার জানলা দিয়ে উঁকি দিল তার দিকে...

অনেকখন সুস্থির হতে পারল না হেরমান। অন্য কামরাটায় গেল হেরমান। আর্দালি ঘুমচ্ছে মেঝের ওপর; জোর করে হেরমান জাগাল তাকে। সচরাচরের মতোই আর্দালি মাতাল: বুদ্ধিমন্ত কিছুই জানা যাবে না ওর কাছ থেকে। বাইরের দরজা বন্ধ ছিল। নিজের ঘরে ফিরে এল হেরমান, বাতি জ্বালিয়ে যা দেখেছে তার নোট রাখতে লাগল।

৬

— Attendez!**

— আমায় 'attendez' বলার সাহস আপনার হল কোত্থেকে?

— হুজুর, আমি বলেছি —

attendez, মশায়!

প্রাকৃতিক জগতে যেমন দু'টি বস্তু থাকতে পারে না একই জায়গায়, নৈতিক প্রকৃতিতেও তেমনি দু'টি নিশ্চল ভাবনা একত্রে অবস্থান করতে পারে না। তিরি, সাত, টেক্কাতে অচিরেই হেরমানের কল্পনায় মৃতা বৃদ্ধার মূর্তি চাপা পড়ে গেল। তিরি, সাত, টেক্কা তার মাথা থেকে যাচ্ছিল না, নড়া-চড়া করছিল তার ঠোঁটে। কোনো তরুণীকে দেখে সে বলত: 'কী সুঠাম মেয়েটি! একেবারে হরতনের তিরি।' কেউ তাকে কটা বেজেছে জিগ্যেস করলে সে জবাব দিত, 'সাতটা বাজতে পাঁচ।' ভুঁড়িওয়ালা প্রতিটি পুরুষকে দেখেই তার মনে পড়ত টেক্কার কথা। তিরি, সাত, টেক্কা তাকে তাড়া করত স্বপ্নে, যতরকম সম্ভব রূপ নিত তারা। তিরি তার সামনে ফুটে উঠত ফুলেল গ্র্যাণ্ডিফ্লোর হয়ে, সাত নিত গথিক ফটকের

** বাজি থামুক। (ফরাসী)

চেহারা, ঢেক্কা বিশাল এক মাকড়শা। তার সমস্ত ভাবনা এসে মিলত একটিতে: যে গুপ্ত রহস্যের জন্যে তাকে দাম দিতে হয়েছে সেটা কাজে লাগাতে হবে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবতে লাগল সে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল প্যারিসের অবারিতদ্বার জুয়ার আড্ডায় মোহিনী ভাগ্যদেবীর কাছ থেকে ধনভান্ডার ছিনিয়ে নেবে। ঘটনাচক্র তাকে মুক্তি দিল ওসব ঝামেলা থেকে।

ধনী জুয়াড়িদের একটা সমাজ ছিল মস্কোয়, বিখ্যাত চেকালিনস্কি যিনি সারা জীবন তাস খেলেছেন, হুন্ডি জিতে আর নগদে হেরে যিনি একদা লক্ষ লক্ষ টাকা করেছিলেন, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। বহু কালের অভিজ্ঞ বলে তিনি আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন বন্ধুদের কাছে, আর অবারিতদ্বার গৃহ, নামকরা বাবুর্চি, আদর-আপ্যায়ন আর ফুর্তিবাজির জন্যে অর্জন করেন জনসমাজের শ্রদ্ধা। পিটরবুর্গে তিনি এলেন। যুবকেরা ধেয়ে গেল তাঁর কাছে, বলনাচ ছেড়ে তাস ধরল, রমণী তোষণের মোহসুখের চেয়ে পছন্দ করল ফারাওঁর প্রলোভন। হেরমানকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল নারুমভ।

চমৎকার কতকগুলো ঘর দিয়ে গেল তারা, সবই সৌজন্যশীল ওয়েটারে ভরা। কয়েকজন জেনারেল আর প্রিভি-কাউনসেলার হুইস্ট খেলছিল, দামাস্কে বাঁধাই সোফায় গা এলিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছিল আর পাইপ টানছিল যুবকেরা। ড্রইং-রুমে লম্বা এক টেবিল, সেখানে ভিড় করে আছে জনা বিশেষ জুয়াড়ি, গৃহকর্তাও সেখানে, তাস বাঁটছিলেন। বয়স ওঁর বছর ষাটেক, অতি মর্যাদামণ্ডিত চেহারা, রুপোলি পাকা চুলে ছাওয়া মাথা; ভরাট তাজা মুখে সদাশয়তার ছাপ; অনুক্ষণ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে চকচক করছে চোখ। তাঁর কাছে হেরমানের পরিচয় দিল নারুমভ। বন্ধুর মতো করমর্দন করলেন চেকালিনস্কি, বললেন, ভদ্রতার কোনো প্রয়োজন নেই এখানে, এবং তাস বেঁটে চললেন।

খেলা চলল অনেকখন ধরে। টেবিলে তিরিশখানারও বেশি তাস।

প্রত্যেক পসলার পরে খেলুড়েদের ঠিকঠাক হয়ে নেবার সময় দেবার জন্যে চেকালিনস্কি থামছিলেন, হারের পরিমাণ টুকে রাখছিলেন, সৌজন্যভরে খেলুড়েদের দাবি শুনছিলেন এবং আরো সৌজন্যভরে বাজি

বাড়িয়ে দেবার চিহ্ন হিশেবে অন্যমনস্ক হাতে বেঁকিয়ে দিচ্ছিলেন তাসের কোণ। অবশেষে সব তাস ফুরুল। চেকালিনস্কি তাদের উলটুল করে তৈরি হতে লাগলেন দ্বিতীয় সেট তাস বাঁটার জন্যে।

'আমায় তাস রাখতে দিন।' স্থূলকায় এক ভদ্রলোকের পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে হেরমান। ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেল। চেকালিনস্কি স্মিতমুখে বিনীত সম্মতির চিহ্ন হিশেবে মাথা নোয়ালেন নীরবে। হেসে উঠল নারুমভ, বহুকালের ব্রহ্মচর্য ভঙ্গের জন্যে অভিনন্দন জানাল হেরমানকে, কামনা করল তার শুভ প্রারম্ভ।

'চলুক!' নিজের তাসের ওপর খড়ি দিয়ে মোটা টাক্যর একটা বাজি লিখে বললে হেরমান।

'কত?' চোখ কুঁচকে জিগ্যেস করলেন ব্যাঙ্কার, 'মাপ করবেন, আমি ঠিক ধরতে পারছি না।'

হেরমান বললে, 'সাতচল্লিশ হাজার।'

কথাটা শোনা মাত্র মুহূর্তে মুখ ঘুরে গেল সবার, দৃষ্টি নিবদ্ধ হল হেরমানের দিকে। 'পাগল হয়ে গেছে!' ভাবল নারুমভ।

তাঁর সেই অপরিবর্তিত হাসিমুখে চেকালিনস্কি বললেন, 'মাপ করবেন, আপনাকে জানাতে হচ্ছে যে আপনার বাজিটা বড়ো বেশি। সাধারণ বাজি আমাদের এখানে দু'শ' পঁচাত্তরের বেশি কেউ রাখে নি।'

'তাতে কী?' আপত্তি করল হেরমান, 'আমার তাস মারবেন কি মারবেন না?'

সেই একই বিনীত সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে চেকালিনস্কি বললেন:

'আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই যে বন্ধুদের আস্থাভাজন হওয়ায় আমি নগদ ছাড়া তাস বাঁটতে পারি না। আমার দিক থেকে অবশ্য কোনো সন্দেহই নেই যে আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট, কিন্তু খেলা আর হিসেব নিকেশের জন্যে তাসের উপর টাকা ধরুন তাহলে।'

হেরমান পকেট থেকে ব্যাঙ্কনোট বার করে চেকালিনস্কিকে দিলে, দ্রুত তার ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি সেটা রাখলেন হেরমানের তাসের ওপর।

তাস বাঁটতে লাগলেন তিনি। ডাইনে নহলা, বাঁয়ে তিরি।

'তিরি জিতেছে!' নিজের তাস দেখিয়ে বললে হেরমান। গুঞ্জন উঠল খেলুড়েদের মধ্যে। ভুরু কোঁচকালেন চেকালিনস্কি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসিটি ফিরে এল তাঁর মুখে।

হেরমানকে জিগ্যেস করলেন, 'নেবেন কি?'

'তা পেলে মন্দ হয় না।'

পকেট থেকে কয়েকটা ব্যাঙ্কনোট বার করে চেকালিনস্কি তক্ষুনি হিসাব মিটিয়ে দিলেন। হেরমান তার টাকাটা নিয়ে চলে গেল টেবিল ছেড়ে। নারুমভ সুস্থির হতে পারছিল না। এক গ্লাস লেমনেড খেয়ে বাড়ি ফিরল হেরমান।

পরের দিন সন্ধ্যায় ফের সে দেখা দিল চেকালিনস্কির ওখানে। গৃহস্বামী তাস বাঁটছিলেন। হেরমান টেবিলের কাছে আসতে জুয়াড়িরা জায়গা করে দিল তাকে। চেকালিনস্কি সাদরে মাথা নোয়ালেন তার উদ্দেশে।

নতুন পালা শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে রইল হেরমান। তারপর তাস রেখে ধরল নিজের সাতচাল্লিশ হাজার আর গতকালকার জিতের টাকার বাজি।

তাস বাঁটতে শুরু করলেন চেকালিনস্কি। ডাইনে পড়ল গোলাম, বাঁয়ে সাত।

হেরমান তার সাত দেখাল।

হো-হো করে উঠল সবাই। স্পষ্টতই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন চেকালিনস্কি। হেরমানকে তিনি চুরানব্বুই হাজার টাকা গুণে দিলেন। হেরমান সেটা নির্বিকার চিত্তে নিয়ে চলে গেল তৎক্ষণাৎ।

পরের সন্ধ্যায় ফের টেবিলের কাছে দেখা দিল হেরমান। সবাই তার প্রতীক্ষায় ছিল। জেনারেল আর প্রিভি-কাউনসেলার তাদের হুইস্ট ফেলে দেখতে এল এমন অসাধারণ খেলা। যুবক অফিসাররা লাফিয়ে উঠল সোফা থেকে; সমস্ত ওয়েটার এসে জুটল ড্রইং-রুমে। সবাই ঘিরে দাঁড়াল হেরমানকে। অন্যান্য জুয়াড়িরা নিজেদের তাস ধরল না, অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল কিসে ব্যাপারটার শেষ হয়। হেরমান টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে তৈরি হতে লাগল একাই বিবর্ণ তবু হাস্যমুখ চেকালিনস্কির

বিরুদ্ধে খেলতে। প্রত্যেকেই এক-এক প্যাকেট তাসের সীল ভাঙল। তাস ভাঁজতে লাগলেন চেকালিনস্কি। হেরমান তার নিজের তাস টেনে রাখল টেবিলে, তার ওপর চাপাল স্তূপাকৃতি ব্যাঙ্কনোট। ব্যাপারটা দ্বৈরথ সমরের মতো। চারিদিকে গভীর নৈঃশব্দ্য।

তাস বাঁটতে লাগলেন চেকালিনস্কি, হাত তাঁর কাঁপছিল। বাঁ দিকে রইল বিবি, ডান দিকে টেক্কা।

'টেক্কা জিতেছে!' এই বলে হেরমান খুলে ধরল তার তাস।

'মারা পড়েছে আপনার বিবি,' আদর-মাখা গলায় বললেন চেকালিনস্কি।

হেরমান চমকে উঠল:সত্যিই টেক্কার জায়গায় তার রয়েছে ইস্কাপনের বিবি। নিজের চোখকে তার বিশ্বাস হচ্ছিল না, বুঝে উঠতে পারছিল না ভুল তাস সে টানল কেমন করে।

সেই মুহূর্তে তার মনে হল যেন ইস্কাপনের বিবি চোখ কুঁচকে মুচকি হাসছে। অসাধারণ সাদৃশ্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে।

'বৃদ্ধা!' আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠল।

জেতা নোটগুলো চেকালিনস্কি টেনে নিল নিজের কাছে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হেরমান। টেবিল ছেড়ে যখন সে চলে গেল, শুরু হল মুখর আলাপ। 'খাশা বাজি ধরেছিল!' বলাবলি করলে খেলুড়েরা। চেকালিনস্কি ফের তাস ভাঁজতে লাগলেন : খেলা চলল তার নিজের ধারায়।

পরিশেষ

হেরমান পাগল হয়ে গেল। ওবুখোভ হাসপাতালের ১৭ নং ঘরে সে বসে থাকে, কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না, আর অসাধারণ দ্রুত বিড়বিড় করে যায়, 'তিরি, সাত, টেক্কা! তিরি, সাত, বিবি!..'

লিজাভেতা ইভানভ্না বিয়ে করেছে অতি সজ্জন একটি যুবককে; কোথায় যেন সে চাকরি করে, টাকা-পয়সাও আছে ভালো : বৃদ্ধা কাউন্টেসের ভূতপূর্ব সরকারের ছেলে সে। লিজাভেতার কাছে মানুষ হচ্ছে তার গরিব এক আত্মীয়া।

তোমস্কি ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হয়েছে, বিয়ে করবে প্রিন্সেস পলিনাকে।

ক্যাপটেনের মেয়ে

বয়েস থাকতেই মান বাঁচিয়ে চলো।

প্রবাদ

প্রথম অধ্যায়

রক্ষী বাহিনীর সার্জেণ্ট

'রক্ষী বাহিনীতে গেলে কালই ও ক্যাপটেন হতে পারত।'
'তার দরকার নেই। ফৌজেই যাক।'
'এটা খাঁটি কথা! একটু কষ্ট করুক...'

. . . .

'আচ্ছা কার ছেলে ও?'

ক্নিয়াজ্নিন।

আমার বাবা আন্দ্রেই পেত্রোভিচ গ্রিনেভ যৌবনে কাউণ্ট মিনিখের বাহিনীতে ছিলেন। ১৭... সালে লেফ্টেন্যাণ্ট-কর্নেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করে তিনি বাস করতে আসেন তাঁর সিম্বির্স্ক তালুকে। বিয়ে করেন স্থানীয় এক গরীব অভিজাত পরিবারের মেয়ে আভ্দোতিয়া ভাসিলিয়েভনা ইউ...কে। আমরা ন' ভাইবোন। ভাইবোনেরা সকলে মারা গেছে শৈশবেই।

মায়ের পেটে থাকতেই আমার নাম সেমেনভস্কি বাহিনীতে সার্জেণ্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল; ব্যাপারটা সম্ভব হয় রক্ষী বাহিনীর মেজর প্রিন্স ব...এর বদান্যতায়; তিনি আমাদের নিকট আত্মীয়। সে সময়ে যদি আমার মা'র ছেলে না হয়ে মেয়ে হত তাহলে আমার বাবা সেক্ষেত্রে দায়িত্বপালনে-অক্ষম সেই সার্জেণ্টের মৃত্যু-সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন এবং ব্যাপারটা সেখানেই চুকে যেত। লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ছুটিতে থাকব, ধরে নেওয়া হল। সে যুগে লেখাপড়া শেখাটা আজকালকার মতো ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে আমার ভার ছেড়ে দেওয়া হল সাভেলিচ নামে এক সহিসের হাতে; মিতাচারী স্বভাবের জন্যে সাভেলিচের এই পদোন্নতি হয়েছিল। তার

শিক্ষাধীনে থেকে বারো বছর বয়সে মাতৃভাষায় আমি লিখতে-পড়তে শিখলাম এবং শিকারী কুকুরের ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ বিচারক হয়ে উঠলাম। তারপর বাবা আমার জন্যে মসিয়ে বোপ্রে নামে একজন ফরাসী শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। মস্কো থেকে তাঁকে আনা হল পুরো বছরের মদ আর অলিভ অয়েলের যোগান নিয়ে। তাঁর আসায় খুবই অসন্তুষ্ট হল সাভেলিচ, গজগজ করতে লাগল, 'ভগবানের দয়ায়, ছেলেকে খাইয়ে পরিয়ে গড়েপিটে এতদিন মানুষ তো করা হয়েছে। এখন আর পয়সা খরচ করে এক মুসিয়ে না রাখলেই নয়? কেন, আমাদের নিজেদের দেশে কি এতই লোকের অভাব?'

নিজেদের দেশে থাকতে বোপ্রে ছিল নাপিত। তারপর প্রুশীয় বাহিনীর সৈনিক, শেষ পর্যন্ত রাশিয়ায় আগমন pour être outchitel** যে শব্দটির অর্থ তাঁর নিকট খুব পরিষ্কার ছিল না। মানুষটি দিলদরিয়া গোছের, কিন্তু খামখেয়ালী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ। তাঁর সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা — রমণী জাতির জন্যে কামনা। এ বিষয়ে অতি উৎসাহের ফলে প্রায়ই তাঁর কপালে মারপিট জোটে আর তখন বেশ কয়েকদিন কাতরাতে হয় তাঁকে। তা ছাড়া, (তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে) তাঁর সঙ্গে **বোতলের কোনো শত্রুতা** নেই, অর্থাৎ (রুশীতে বললে) দু-এক ঢোক বেশি গিল্‌বার দিকেই তাঁর ঝোঁক। এবং যেহেতু আমাদের বাড়িতে সুরা পরিবেশন করা হয় শুধু খাওয়ার সময়ে এবং মাত্র এক পাত্র করে, আবার তাও শিক্ষকমশাইকে সাধারণত বাদ দিয়ে, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই রাশিয়ার দেশী মালে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তিনি এবং কিছুদিন না যেতেই তাঁর নিজের দেশের সুরার চেয়েও বেশি পছন্দ করতে থাকেন এটাকে; তাঁর মতে হজমের পক্ষে এটা নাকি অনেক বেশি উপকারী। তাঁর সঙ্গে আমার চমৎকার মিলমিশ হয়েছিল; আর যদিও তিনি এসেছিলেন আমাকে **ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য সব বিষয়ে** শিক্ষা দেবার জন্যে কিন্তু কাজের বেলায় তিনি দেখলেন যে তার চেয়ে আমার কাছ থেকে রুশ ভাষায় খানিকটা বক্‌বকানি শোনা ঢের সহজ কাজ। এইভাবে

** শিক্ষক হওয়ার জন্যে। (ফরাসী)

আমরা যে যার নিজের ব্যাপার নিয়েই মশ্‌গুল হয়ে রইলাম। ভারি চমৎকার দিন কাটতে লাগল আমাদের। অন্য শিক্ষাদাতা আমিও চাই নি। কিন্তু কপাল দোষে শিগ্‌গিরই আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেল। সেই ঘটনাই বলছি।

মুখে বসন্তের দাগওলা মুট্‌কি ধোবানী পালাশ্যা, আর কানা গয়লানী আকুল্‌কা — দুজনে একদিন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিয়ে আমার মা'র পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ে নিজেদের দুর্বল মুহূর্তের পাপের কথা স্বীকার করে বসে। দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে নালিশ জানায় যে মুসিয়ে তাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে। ব্যাপারটাকে আমার মা মোটেই হেসে উড়িয়ে দিলেন না এবং তিনি গিয়ে নালিশ জানালেন আমার বাবার কাছে। বাবার বিচার ছিল সংক্ষিপ্ত, তৎক্ষণাৎ তিনি ফরাসী বদমায়েশটিকে ডেকে পাঠালেন। খবর এল যে তিনি আমাকে পড়াচ্ছেন। তখন বাবা উঠে এলেন আমার ঘরে। সেখানে দেখলেন যে মসিয়ে বোপ্রে বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পরম নিশ্চিন্ততার সঙ্গে ঘুম দিচ্ছেন আর আমি নিজের কাজ করে চলেছি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমার সুবিধার জন্যে মস্কো থেকে অর্ডার দিয়ে মস্ত একটা মানচিত্র আনানো হয়েছিল। জিনিসটা দেওয়ালে ঝোলানো ছিল, কোনো কাজে লাগছিল না। মানচিত্রটা যে কাগজের উপরে ছাপানো হয়েছে তা যেমনি চওড়া তেমনি চমৎকার; বহুদিন থেকেই কাগজটার ওপরে আমার লোভ ছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে কাগজটা দিয়ে একটা ঘুড়ি বানিয়ে নেব এবং বোপ্রের নিদ্রার সুযোগ নিয়ে এই মহৎ কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। তারপর ঠিক যে সময়ে আমি উত্তমাশা অন্তরীপের সঙ্গে গাছের বাকলের একটা টুকরো লাগিয়ে ঘুড়ির লেজ তৈরি করছি, ঘরে ঢুকলেন আমার বাবা। আমার এই ভৌগোলিক অনুশীলনের পুরস্কার হিসেবে কান মলে দিলেন আমার। সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন বিছানার কাছে, বিন্দুমাত্র মায়ামমতা না দেখিয়ে বোপ্রেকে ঘুম থেকে তুলে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হক্‌চকিয়ে বোপ্রে চেষ্টা করলেন উঠে বসতে কিন্তু পারলেন না — বেচারা ফরাসী ভদ্রলোকটি মদে একেবারে বেসামাল হয়ে ছিলেন। সাতটি পাপের — একটি শাস্তি: বাবা তাঁর কোটের কলার ধরে তাঁকে বিছানা

থেকে টেনে তোলেন, ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যান ঘরের বাইরে এবং সেই দিনই বার করে দেন বাড়ি থেকে। এ ব্যাপারে সাভেলিচ এত খুশি হল যে বলবার নয়। আর এইভাবেই আমার পড়াশোনা শেষ হল।

বড়ো হলাম আস্ত একটি অকর্মণ্য হয়ে। মনের আনন্দে দিন কাটতে লাগল পায়রা উড়িয়ে আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফানো খেলে। ইতিমধ্যে আমার ষোল পেরল। তারপরেই আমার জীবনে একটা পরিবর্তন আসে।

শরৎকালের একটি দিন। আমার মা ড্রয়িং-রুমে বসে মধু দিয়ে বেরিফল সিদ্ধ করছেন আর পাশে দাঁড়িয়ে ফুটন্ত ফেনার দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট চাটছি। আমার বাবা জানলার পাশে বসে রাজ্য-পঞ্জিকা পড়ছেন। এই প্রকাশনটি বছরে একবার পাওয়া যায় এবং বইটি হাতে পেলে আমার বাবার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। একেবারে বাহ্যজ্ঞান-রহিত হয়ে যান তিনি এবং পড়তে পড়তে তাঁর মেজাজ সপ্তমে ওঠে। আমার বাবার চালচলন ও স্বভাবের সঙ্গে আমার মা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। এই আপদ বইখানা হাতে এলেই তিনি এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে দেন যেখানে সহজে কারো নজর যায় না। সুতরাং মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে যে কয়েক মাস এই বইটার ওপরে বাবার চোখ পড়ে নি। তারপর যেদিন চোখে পড়ে যায় সেদিন আর তিনি কিছুতেই বইটাকে হাতছাড়া করেন না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটে বইটা নিয়ে। সেই রকম আজো আমার বাবা রাজ্য-পঞ্জিকা পড়ছেন, মাঝে মাঝে কাঁধ-ঝাঁকুনি দিচ্ছেন আর চাপা স্বরে বিড়বিড় করছেন, 'লেফ্‌টেন্যাণ্ট-জেনারেল!.. ও তো সার্জেণ্ট ছিল আমার কোম্পানিতে!.. আর এখন কিনা রুশদেশের সেরা দুটি খেতাব পেল! মনে হয়, এই তো মাত্র গতকাল ও আর আমি...' শেষকালে রাজ্য-পঞ্জিকাটিকে সোফার ওপরে ছুঁড়ে ফেলে তিনি গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। এই লক্ষণটা ভালো নয়।

হঠাৎ তিনি মা'র দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'পেত্রুশার বয়স কত হল, বলো তো?'

মা জবাব দিলেন, 'এই তো সতেরোয় পা দিয়েছে। ধরো গিয়ে যে

বছর নাস্ত্যাসিয়া গেরাসিমোভনা মাসীর এক চোখ অন্ধ হয়ে যায় সেই বছরে ওর জন্ম এবং যখন...'

বাধা দিয়ে বাবা বললেন, 'বেশ ভাল কথা! আর দেরি নয় — এবার ওকে পল্টনে যেতে হবে। মেয়েদের কাছে ঘুরঘুর করে আর পায়রা উড়িয়ে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে ও।'

আমার সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে আমার মা এত বিচলিত হলেন যে তাঁর হাত থেকে চামচটা পড়ে গেল গামলার মধ্যে। চোখের জল পড়তে লাগল গাল বেয়ে। কিন্তু আমি খুবই উল্লসিত হলাম; আমার সেই উল্লাস ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। পল্টনের জীবন বলতে আমার মনে ধারণা আছে এক স্বাধীন জীবনের, পিটারবুর্গের খুশি-ভরা জীবনের। নিজেকে কল্পনা করি রক্ষী বাহিনীর অফিসার হিসেবে; রক্ষী বাহিনীর অফিসার হতে পারাটাই সুখী জীবনের পরাকাষ্ঠা বলে মনে হয় আমার কাছে।

বাবা কোনো বিষয়ে মতস্থির করলে তাতে যেমন অবিচলিত থাকেন, তেমনি তার বাস্তব রূপায়ণেও গড়িমসি করেন না। আমার যাত্রার দিন ঠিক হয়ে গেল। যাত্রার পূর্বে বাবা আমাদের বললেন যে আমার ভাবী উচ্চতর অফিসারের কাছে তিনি আমার জন্যে একটি চিঠি লিখে দেবেন। এই কথা বলে কালি ও কলম আনবার জন্যে হুকুম দিলেন।

মা বললেন, 'প্রিন্স ব...কে আমার আভূমি কুর্নিশ জানিয়ে দিও — ভুল হয় না যেন। আর এ কথাও লিখে দিতে পারো, আমি আশা করি পেত্রুশার ওপর তাঁর স্নেহ অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

কপাল কুঁচকে বাবা জবাব দিলেন, 'বাজে কথা বন্ধ করো! প্রিন্স ব...কে আমি কেন চিঠি লিখতে যাব?'

'কেন, তুমিই তো বললে যে পেত্রুশার ওপরওলার কাছে তুমি একটা চিঠি লিখে দেবে!'

'বলেছিই তো! লিখব তা কি হয়েছে?'

'তাই তো বলছি। প্রিন্স ব...ই তো ওর ওপরওলা। সেমেনভস্কি বাহিনীতে ওর নাম লেখানো হয়েছে — নয় কি?'

'নাম লেখানো হয়েছে! নাম লেখানো হয়েছে, তাতে আমার কি শুনি?

পেত্রুশা পিটারবুর্গে যাচ্ছে না। পিটারবুর্গের পল্টনে থেকে ওর লাভটা কী? শেখার মধ্যে শিখবে শুধু হুল্লোড় আর বাবুগিরি। তার চেয়ে বরং ও ফৌজে যাক, পল্টনী ঝোলা কাঁধে নিক, গোলাবারুদ ঘাঁটাঘাঁটি করুক — পুরোপুরি সৈনিক হয়ে উঠুক। আস্ত একটা চালিয়াৎ যেন না হয়। হুঁঃ, রক্ষী বাহিনীতে নাম লেখানো হয়েছে! কোথায় ওর পাসপোর্ট? দাও তো দেখি!'

আমার প্যাসপোর্ট আর খ্রীষ্টীয় নামকরণের পোশাকে মা তুলে রেখেছিলেন তাঁর ঝাঁপির মধ্যে। সেখান থেকে পাসপোর্টটাকে খুঁজে বার করে কাঁপা-হাতে এগিয়ে দিলেন বাবার কাছে। কাগজটাকে নিয়ে বাবা ভালো করে পড়লেন, তারপর সামনে টেবিলের ওপরে কাগজটা রেখে শুরু করলেন চিঠি লিখতে।

প্রচণ্ড একটা কৌতূহল পেয়ে বসল আমায়। পিটারবুর্গে যদি না হয় তাহলে আর কোথায় পাঠানো হতে পারে আমাকে? বাবার হাতের কলম কাগজের ওপরে আস্তে আস্তে সরে সরে যাচ্ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম আমি। শেষকালে তাঁর কলম থামল, একটা খামের মধ্যে চিঠি ও পাসপোর্ট পুরে সীলমোহর দিয়ে খামের মুখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ থেকে চশমা খুলে আমাকে কাছে ডেকে যে কথাগুলো বললেন তা হচ্ছে এই, 'এই চিঠিটা নে। চিঠিটা লেখা হয়েছে আন্দ্রেই কার্লোভিচ র...কে। সে আমার পুরনো সাথী আর বন্ধু। ওরেনবুর্গে গিয়ে তাঁরই অধীনে সৈন্যদলে তোকে থাকতে হবে।'

বর্ণোজ্জ্বল যে ভবিষ্যতের কল্পনা আমি করেছিলাম, এ কথা শুনে তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল! কোথায় গেল পিটারবুর্গের আনন্দ! তার বদলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে দূর এক পাণ্ডব-বর্জিত অঞ্চলের নিতান্ত ক্লান্তিকর একঘেয়েমি। এক মুহূর্ত আগেও পল্টনের জীবন সম্পর্কে কত রঙিন স্বপ্নই না ছিল — কিন্তু এখন মনে হতে লাগল সে জীবনটা যেন কঠোর একটা পরীক্ষা। প্রতিবাদ করেও আর কোনো ফল হবে না। পরদিন সকালে দূরযাত্রার উপযোগী স্লেজগাড়ি এনে দাঁড় করানো হল বাড়ির সামনে অলিন্দের কাছে। আমার ট্রাঙ্ক, চুবড়ি ও বোঁচকা বোঝাই করা হল গাড়িতে; চুবড়িটার মধ্যে ছিল চা-তৈরির

আনুষঙ্গিক সমস্ত উপকরণ আর বোঁচকার মধ্যে পারিবারিক আদরযত্নের কয়েকটি বিদায়চিহ্ন — টাটকা পিঠে ও মিষ্টি ইত্যাদির পুঁটলি। গুরুজন হিসেবে আমাকে আশীর্বাদ জানালেন আমার বাবা আর মা। বাবা আমাকে বললেন, 'বিদায়, পিওতর! যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবি তাঁর অধীনে বিশ্বস্তভাবে কাজ করবি; ওপরওলাকে অমান্য করবি না বা ওপরওলাকে মুরুব্বি পাকড়াতে যাবি না; যে কাজ তোকে করতে বলা হয় নি সে কাজ করতে যাবি না। যে কাজ করতে বলা হয়েছে সে কাজ থেকে সরে আসবি না। আর এই প্রবাদবাক্যটি সব সময়ে মনে রাখিস: নতুন থাকতেই পোশাক বাঁচিও বয়েস থাকতেই মান বাঁচিয়ে চলো।' আমার মা চোখের জলে আমাকে কাকুতি-মিনতি করলেন আমি যেন শরীরের দিকে নজর দিই; আর সঙ্গে সঙ্গে সাভেলিচকে বারবার বলে দিলেন যেন এই শিশুটির দিকে সে নজর রাখে। আমায় পরানো হল খরগোসের চামড়ার কুর্তা, তার ওপরে শেয়ালের লোমের ফার দেওয়া ওভারকোট। হু-হু করে কাঁদতে কাঁদতে আমি স্লেজগাড়িতে উঠে সাভেলিচের পাশে বসলাম। শুরু হল যাত্রা।

সেই রাত্রিতেই সিম্‌বির্স্ক শহরে আমরা পৌঁছলাম। সাভেলিচের ওপর কেনাকাটার ভার আছে, সে জন্যে পরদিনও এই শহরে থাকার কথা। একটা সরাইখানায় উঠলাম আমরা। পরদিন খুব ভোরে সাভেলিচ বেরিয়ে গেল দোকান-বাজারের দিকে। আর আমি জানলা দিয়ে বাইরের নোংরা রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। শেষকালে ক্লান্ত হয়ে উঠে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সরাইখানার অন্য সব ঘরে। বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে এসে দেখা হল লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে; বছর পঁয়ত্রিশ বয়স, মুখে লম্বা কালো গোঁফ, পরনে ড্রেসিং গাউন, হাতে বিলিয়ার্ড খেলার লাঠি, দাঁতে এক পাইপ। মার্কারের সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলছেন তিনি। খেলায় মার্কারের জিত হলে একগ্লাস ভদ্‌কা খাচ্ছে সে, হেরে গেলে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে টেবিলের তলায়। আমি দুজনের খেলা দেখতে লাগলাম। খেলা যত চলে তত বেশি বার মার্কারকে ঢুকতে হয় টেবিলের তলায়। শেষকালে একবার সেই যে ঢোকে আর বেরোয় না। তার ব্যপান্ত করে, অন্ত্যেষ্টিবাক্যে যেন খেলা চুকিয়ে দিলেন ভদ্রলোক,

তারপর আমাকে ডাকলেন তাঁর সঙ্গে খেলবার জন্যে। বিলিয়ার্ড খেলা আমার জানা নেই, সুতরাং আমি রাজি হলাম না। আমার অজ্ঞতায় তিনি খুব বিস্মিত হয়েছেন বলে মনে হল। কেমন কৃপার দৃষ্টিতে দেখতে থাকলেন আমাকে। তবুও কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল আমাদের দুজনের মধ্যে। শুনলাম, তাঁর নাম ইভান ইভানভিচ জুরিন, অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপটেন। সিম্‌বির্স্কে এসেছেন নতুন লোককে সৈন্যদলভুক্ত করতে এবং উঠেছেন এই সরাইখানায়। জুরিন আমাকে ভোজে ডাকলেন; অবশ্য পল্টনী কায়দার ভোজ, যা কপালে জোটে তাই। উৎসাহের সঙ্গে আমি রাজি হলাম এবং আমরা বসলাম গিয়ে খাবার টেবিলে। প্রচুর মদ্যপান করলেন জুরিন এবং আমার গ্লাসও খালি থাকতে দিলেন না। গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে বারবার বললেন যে পল্টনে থাকতে হলে আমাকে এই অভ্যেসটা অতি অবশ্যই আয়ত্ত করতে হবে। পল্টনী জীবনের নানা অদ্ভুত সব গল্প শোনালেন আমাকে। শুনে হাসতে হাসতে আমার তো দম বন্ধ হবার যোগাড়। খাওয়া-দেওয়ার পর্ব যখন চুকল তখন আমাদের দুজনের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তারপর তিনি নিজে থেকেই প্রস্তাব করলেন যে আমাকে বিলিয়ার্ড খেলা শেখাবেন। বললেন, 'আমরা যারা সৈনিক হয়েছি, তাদের পক্ষে এই খেলাটা শিখে রাখা নিতান্তই জরুরী। এই ধরুন না কেন, হয়ত মার্চ করতে করতে এসে পৌঁছলেন একটা গঞ্জে। সেখানে সময় কাটানোটাই একটা সমস্যা। সব সময়েই তো আর ইহুদীগুলোকে ধরে ধরে ঠ্যাঙানো যায় না। কাজেই বাধ্য হয়ে কোনো একটা সরাইখানায় গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলায় মাততে হয় আর এই জন্যে বিলিয়ার্ড খেলা জানা দরকার!' তাঁর এই যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না এবং যতটা অভিনিবেশ আমার পক্ষে থাকা সম্ভব সবটুকু প্রয়োগ করে খেলাটা শেখবার কাজে লেগে গেলাম। আমাকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহ দিলেন জুরিন; আর আমি যে এত চটপট খেলাটা শিখে নিতে পারছি তা দেখে যেন অবাক হতে লাগলেন। প্রথম কয়েকবার খেলা চলল আমাকে তালিম দেবার জন্যে; তারপর জুরিন প্রস্তাব করলেন যে যৎসামান্য কিছু একটা বাজি রেখে খেলা যাক; লাভের জন্যে বাজি নয়, একেবারে শূন্য হাতে খেলাটা না

আলেক্সান্দ্রা স্মির্‌নোভা, প্রাগ্‌বৈবাহিক উপাধি রস্‌সেত (১৮০৯-১৮৮২) — সাম্রাজ্ঞীর সহচরী। পুশকিনের বান্ধবী। মিনিয়েচার

পিটারবুর্গ। নেভ্স্কি সড়ক। কাজান ক্যাথিড্রালের দৃশ্য। সেনাপতি মিখাইল কুতুজ
এখানে সমাধিস্থ। লিথোগ্রাফ। ১৮৩০-এর দশক

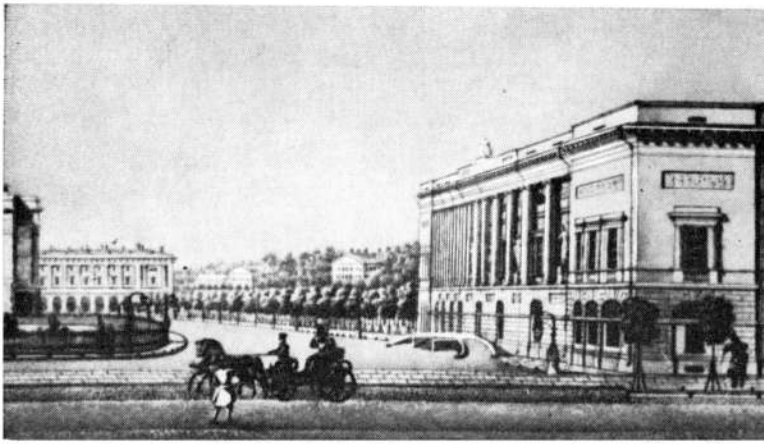

পিটারবুর্গ। নেভ্স্কি সড়ক। রাজকীয় সাধারণ গ্রন্থাগারের দৃশ্য।
লিথোগ্রাক। ১৮৩০-এর দশক

পিটারবুর্গের গ্রীষ্মোদ্যানে রুশ সাহিত্যিকবৃন্দ (বাম থেকে ডাইনে): ক্রিলভ, পুশকিন, জুকোভ্স্কি, গ্নেদিচ। চের্নেৎসভের এই স্কেচটি (১৮৩২) বাস্তব অনুসরণে।

হয় সে জন্যে — কারণ জুরিনের মতে শূন্য হাতে খেলার মতো খারাপ অভ্যেস নাকি আর কিছু নেই। এ প্রস্তাবেও আমি রাজি হলাম। এ দিকে জুরিন পাণ্চ আনবার হুকুম দিয়েছেন, আমাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করালেন পানীয়টা একটু চেখে দেখতে। এ বারেও সেই একই কথা — পল্টনে থাকতে হলে আমাকে অতি অবশ্যই এই অভ্যেসটা আয়ত্ত করতে হবে। পল্টনে এসে যদি পাঞ্চ খেতেই না শিখি তবে আর বাঁচা কি নিয়ে? কথাটা আমি মেনে নিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের খেলাও চলছিল। এক-এক চুমুক পানীয় আমার পেটে যায় আর আমিও বেপরোয়া হয়ে উঠি। আমার মারের বলগুলো অনবরত ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যায় টেবিল থেকে, মার্কারকে গাল দিই গুণতে অপটু বলে, আর ক্রমেই বাজি বাড়িয়ে চলি। এক কথায় আমার ভাবভঙ্গি হয়ে ওঠে ঠিক ঘর-পালানো ছেলের মতো। কয়েক ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে উড়ে গেল টের পেলাম না। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে জুরিন বিলিয়ার্ড খেলার লাঠিটা রেখে দিয়ে ঘোষণা করলেন যে আমি তাঁর কাছে একশ' রুব্‌ল হেরেছি। শুনে আমি একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম। আমার টাকাকড়ি সবই সাভেলিচের কাছে। টাকা দিতে পারার অক্ষমতার জন্যে জুরিনের কাছে আমি মাপ চাইতে শুরু করতেই তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'তাতে আর কি হয়েছে! এ জন্যে কিছুমাত্র চিন্তা করার দরকার নেই! টাকা আমাকে পরে দিলেও চলবে। আচ্ছা, এবার চলুন একটু আরিনুশ্‌কাকে দেখে আসি।'

কি আর করা যায়? দিনটি শুরু হয়েছিল যেমন বোকামির মধ্যে, শেষও হল তাই। আরিনুশ্‌কার বাড়িতে আমরা রাত্রের খাওয়া খেলাম। জুরিন বারবার আমার গ্লাস ভরে দিতে লাগলেন; তাঁর মুখে সেই এক কথা: 'পল্টনে থাকতে হলে এই অভ্যেসটা আপনাকে অতি অবশ্যই আয়ত্ত করে নিতে হবে।' তারপর উঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে টের পেলাম যে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা আমার প্রায় নেই। মাঝরাত্রে জুরিন আমাকে ধরাধরি করে সরাইখানায় নিয়ে এলেন।

অলিন্দের কাছে সাভেলিচের সঙ্গে দেখা। পল্টনী অভ্যেস আয়ত্ত করার চেষ্টা যে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে তার নির্ভুল চিহ্ন দেখতে পেয়ে হাঁ

করে তাকিয়ে রইল সে; তারপর আর্তস্বরে বলে উঠল, 'এ কি কান্ড, দাদাবাবু, এমন মাতাল হয়ে এলে কোত্থেকে? হা ভগবান! এমন শয়তানিও তো আর দেখি নি!' তোতলাতে তোতলাতে আমি বললাম, 'চুপ, বুড়ো ইঁদুর! মদ গিলেছিস নিশ্চয়ই। যা, যা, ঘুমতে যা... আর আমাকে নিয়ে চল্ বিছানায়।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল মাথার যন্ত্রণা নিয়ে। আগের দিনের অস্পষ্ট একটা স্মৃতি রয়েছে শুধু। ঘটনাগুলো তলিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম, কিন্তু সাভেলিচ চা নিয়ে আসাতে বাধা পড়ল। 'বড়ো বেশি তাড়াতাড়ি মদ ধরেছ, দাদাবাবু।' মাথা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'তোমাদের বংশের কেউ এমনটি হয় নি। তোমার বাবা বা ঠাকুর্দাকে কোনোদিন কেউ মাতাল করেছে বলে তো শুনি নি আমি। আর তোমার মা তো ক্ভাস* ছাড়া অন্য কিছু ছুঁয়েও দেখেন নি কখনো। তোমার এমন হাল কে করেছে জানো? সেই বদমায়েশ ফরাসী লোকটা। উঃ, ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে গিন্নি-মাকে অতিষ্ঠ করে ছাড়ত একেবারে। সেই এক কথা: 'মাদাম, জ্য ভু প্রি ভদ্‌কিউ!* এবার দেখে তুমি, সেই জ্য ভু প্রি কেমন ফলে যাচ্ছে! জানোয়ারটা এমনি বিদায় নেয় নি দেখছি, তোমার মাথার মধ্যে দু-একটা বিদ্যেও ঢুকিয়ে গেছে! টাকা খরচ করে তোমার জন্যে এই কুত্তার বাচ্চাকে নিয়ে আসার কী দরকার ছিল জানি না। কর্তার কি চাকর-বাকরের কমতি আছে কিছু?'

আমি লজ্জা পেয়েছিলাম। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, 'তুমি এবার যাও তো, সাভেলিচ। আমাকে চা দিতে হবে না।' কিন্তু সাভেলিচ যদি একবার উপদেশ বর্ষণ করতে শুরু করে তবে তা থেকে আর পরিত্রাণ নেই। সে বলল, 'দাদাবাবু, মদ খাবার ফল হাতে হাতে টের পেলে তো! মাথার যন্ত্রণা হয়, খাওয়ার রুচি থাকে না। মদ খেলে লোকে নিষ্কর্মা হয়ে পড়ে... এক কাজ করো, মধু দিয়ে নোনা শসার জল খেয়ে নাও কিংবা সবচেয়ে ভালো হয় আধ গ্লাস ভদ্‌কা খেলে, নিয়ে আসি?'

এই সময়ে ঘরে ঢুকল একটি ছেলে। আমায় দিলে ই. ই. জুরিনের লেখা একটা চিরকুট। চিঠিটা আমি খুললাম। তাতে লেখা:

'প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়েভিচ, গত রাত্রে আমার কাছে যে একশ' রুব্ল হেরেছ তা এই ছেলেটির হাতে পাঠিয়ে দিও। টাকাটা আমার জরুরী প্রয়োজন।

আপনার অনুগত ভৃত্য
ইভান জুরিন।'

করার আর কিছু নেই। আমার **টাকাকড়ি পোশাক-আশাক সব কিছুরই রক্ষক** — সাভেলিচ। মুখের ওপর একটা তাচ্ছিল্যের ভাব এনে সাভেলিচকে বললাম, ছেলেটির হাতে সে যেন একশ' রুব্ল দিয়ে দেয়। সাভেলিচ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন! কিসের জন্যে!' যতটা সম্ভব নিস্পৃহভাবে আমি জবাব দিলাম, 'ওর কাছে আমার ধার আছে।' 'ধার আছে!' সাভেলিচ কথাটার প্রতিধ্বনি করল, সে আরো বেশি অবাক হয়ে গেছে, 'সে কি? দুটো দিনও যায় নি, এর মধ্যেই তুমি ধারে জড়িয়ে পড়লে কি করে, দাদাবাবু? নিশ্চয়ই একটা কিছু গন্ডগোল আছে। যাই বলো দাদাবাবু, টাকা আমি দিতে পারব না।'

ভাবলাম যে এই সঙ্কট-মুহূর্তে যদি একরোখা বুড়োটাকে দাবড়িয়ে রাখতে না পারি তাহলে ভবিষ্যতেও লোকটির অভিভাবকত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া আমার পক্ষে খুবই কষ্টকর হবে। সুতরাং চড়া মেজাজে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি হচ্ছি তোমার মনিব, তুমি আমার চাকর। টাকার মালিক আমি। আমার খুশি হয়েছে আমি বাজি হেরেছি। তোমাকে বলে রাখছি, সব ব্যাপারে চালাকি করতে এসো না। যেমনটি বলা হয়েছে তেমনটি করে যাও।'

আমার কথায় সাভেলিচ এতই স্তম্ভিত হল, যে হাতের একটা অসহায় ভঙ্গি করে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। 'অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন!' আমি চোটপাট করে উঠলাম। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপা কাঁপা গলায় সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু, অমন করে আমাকে বলো না! তাহলে মনের দুঃখে আমি মরে যাব! মানিক আমার! এই বুড়ো মানুষের একটা কথা শোনো! শয়তানটাকে লিখে দাও যে তুমি ঠাট্টা করেছিলে, তোমার কাছে এত টাকা নেই। একেবারে একশ'টা রুব্ল! চাট্টিখানি কথা নাকি!

লিখে দাও যে জুয়ো খেলা সম্পর্কে তোমার বাবা মার কড়া নিষেধ আছে। তাঁরা বলে দিয়েছেন যে বাজি যদি রাখতেই হয় তা হলে কানাকড়ির বেশি কিছু নয়...' কড়া স্বরে আমি বললাম, 'আচ্ছা তা হবে খন! ওর হাতে টাকাটা দিয়ে দাও, নইলে তোমাকে আমি দূর করে দেব!'

গভীর বিষাদ-ভরা দৃষ্টিতে সাভেলিচ আমার দিকে তাকিয়ে টাকা আনতে চলে গেল। বুড়োর অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমি স্বাধীন হতে চেয়েছিলাম, দেখাতে চেয়েছিলাম যে আমি আর ছোট্ট শিশুটি নই। টাকাটা জুরিনের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তারপর হতচ্ছাড়া এই সরাইখানা থেকে আমাকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাড়াহুড়ো করতে লাগল সাভেলিচ। একেবারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে খবর দিল আমাকে। একটা অস্থির বিবেক ও নিঃশব্দ একটা অনুতাপ অনুভব করতে করতে সিম্‌বির্স্ক ছেড়ে চললাম। বিলিয়ার্ড খেলার শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল না। তাঁর সঙ্গে আবার কোনোদিন দেখা হবে, সে আশাও ছিল না আমার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথপ্রদর্শক

ও আমার দূরের দেশ,
ও আমার অচেনা দেশ।
নিজেই কি আসি নি তোমার কাছে,
আনে নি তাগড়াই ঘোড়া:
সুকান্ত এই আমায় নিয়ে এসেছে
সাহস আর জোয়ানী তাগদ
নেশা আর শুঁড়িখানার মদ।

প্রাচীন গান।

যেতে যেতে আমার মনে যে সব চিন্তা উঠেছিল তা খুব মধুর নয়। সে সময়ের পক্ষে আমার এই অর্থদন্ডকে যথেষ্টই বলতে হবে। আর মনে মনে আমি এ কথাটা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছিলাম না যে সিম্‌বির্স্কে আমার আচরণটা বোকার মতো হয়ে গেছে। সাভেলিচের সঙ্গে আমি ভালো ব্যবহার করি নি। এ সব চিন্তা আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। আমার দিকে পিঠ করে গুম হয়ে বুড়ো বসেছিল কোচোয়ানের আসনে, মাঝে মাঝে দু-একটা গলা খাঁকারি ছাড়া মুখে একটিও কথা নেই। আমি স্থির করলাম, যে করে হোক ওর সঙ্গে মিটমাট করে নেব; কিন্তু কিভাবে যে তা করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। শেষকালে আমি বলে উঠলাম, 'নাও, নাও, হয়েছে সাভেলিচ, মিটমাট করে নেওয়া যাক। এই আমি ঘাট মানছি — আমারই দোষ। আমি একটা আস্ত বোকা বনেছি। তা ছাড়া তোমাকে অমন কড়া কড়া কথা বলা উচিত হয় নি। আমি কথা দিচ্ছি, এবার থেকে ভালো হয়ে চলব। কোনোদিন তোমার কথার অবাধ্য হব না। এবার আর রাগ করে থেকো না। মিটমাট করে ফেলি!'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জবাব দিল, 'তোমাকে আর কি বলব, দাদাবাবু! আমার রাগ হচ্ছে নিজের ওপরে — সবই আমার দোষ। সরাইখানায় তোমাকে একা ফেলে যাওয়াটা কক্ষনো উচিত হয় নি! তা ছাড়া আমিও লোভ সামলাতে পারলাম না — কি যে এক ঝোঁক চাপল,

সেক্সটন গিন্নির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, পুরনো আলাপী। তারপরেই যা হয় আর কি, স্যাঙাতের সঙ্গে মোলাকাত, হাজতবাসের রাস্তা সাফ। কী ভয়ানক কাণ্ড, বাবা গো! এবার কর্তা-গিন্নির কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কী করে! ওনারা যখন শুনবেন যে ওনাদের ছেলে মদ খায় আর জুয়ো খেলে তখন কী বলবেন ওঁরা!'

বেচারী স্যাভেলিচকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে ভবিষ্যতে ওর সম্মতি ছাড়া আমি আর একটি কোপেকও খরচ করব না। আস্তে আস্তে ওর মনটা শান্ত হয়ে এল; যদিও থেকে থেকেই মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের মনে বিড়বিড় করছিল, 'একশ'টা রুব্‌ল! ইস! তামাসার কথা নয়!'

গন্তব্য স্থানের কাছাকাছি এসে গেছি। চারদিকে বিষণ্ণ প্রান্তর। বৈচিত্র্য বলতে মাঝে মাঝে টিলা আর খাদ। সমস্ত বরফে ঢাকা। পশ্চিমে অস্তায়মান সূর্য। সরু একটা রাস্তা ধরে, বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে, চাষীদের স্লেজগাড়ি যাবার ফলে যে চিহ্ন পড়েছে তাই ধরে চলেছে আমাদের স্লেজগাড়ি। হঠাৎ কোচোয়ান বারবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল কোন একটা দিকে, শেষকালে মাথা থেকে টুপিটা খুলে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল:

'হুজুর, ফিরে যাওয়াই ভালো মনে হচ্ছে!'

'কেন, কি হয়েছে?'

'বাতাসের গতিক সুবিধের নয়, হুজুর! ক্রমেই চড়ে যাচ্ছে। আর দেখছেন তো, বরফের গুঁড়োগুলোকে নিয়ে হুটোপাটি লাগিয়ে দিয়েছে কী রকম।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'আর, ওদিকটা দেখছেন না।' (চালক তার চাবুকটা দিয়ে পূর্বদিকে দেখাল।)

'আমি তো শুধু দেখছি বরফ-ঢাকা মাঠ আর পরিষ্কার আকাশ।'

'ওই যে — মেঘ দেখতে পাচ্ছেন না!'

এবারে দেখতে পেলাম। একেবারে দিগন্ত রেখার ওপরে একটুকরো সাদা মেঘ। এতক্ষণ মনে হয়েছিল যেন দূরের টিলা। চালক আমাকে

বুঝিয়ে বলল যে ওই মেঘটা হচ্ছে ঝড়ের পূর্বাভাস।

এ সব অঞ্চলের তুষার-ঝড়ের কথা আমি শুনেছি। এমন ঘটনাও জানি যে স্লেজগাড়ি সমেত গোটা এক-একটা দল বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। কোচোয়ানের কথামতো ফিরে যাওয়া সাভেলিচের ইচ্ছে এবং আমাকেও সেই পরামর্শ দেয়। আমার কিন্তু মনে হয় নি যে বাতাসের খুব একটা জোর আছে এবং আশা করছিলাম যে সময় থাকতেই আমরা পরবর্তী ডেরায় পেঁছে যেতে পারব। সুতরাং কোচোয়ানকে আরো জোরে ঘোড়া ছোটাতে বললাম।

জোরেই ঘোড়া ছোটাল সে, কিন্তু বারবার তাকাতে লাগল পূর্বদিকে। ঘোড়াগুলোও যেন মরিয়া হয়ে ছুটছে। বাতাসের জোর বাড়ছে ক্রমশ। মেঘের টুকরোটা ফুলে ফেঁপে প্রকাণ্ড হয়ে একটু একটু করে সারা আকাশকেই গ্রাস করে ফেলল। গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়তে শুরু করেছে, হঠাৎ বাতাস ভরে গেল বরফের বড়ো বড়ো চিল্‌কায়। গর্জন করে উঠল বাতাস। আমরা পড়ে গেলাম একেবারে তুষার-ঝড়ের মধ্যে। দেখতে দেখতে একাকার হয়ে গেল অন্ধকার আকাশ আর বরফের সমুদ্র। অবলুপ্ত হয়ে গেল মাটির সমস্ত চিহ্ন। 'দেখলেন তো হুজুর! আর রেহাই নেই — তুষার-ঝড় এসে গেছে!'

গাড়ির আচ্ছাদনের তলা থেকে আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম। অন্ধকার আর পাক-খাওয়া ঘূর্ণি — আর কিছু নেই। বাতাসের গোঙানির মধ্যে এমন একটা হিংস্রতা যে বাতাসকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই সাভেলিচ আর আমি তুষারকণায় ছেয়ে গেলাম। পায়ে পায়ে কয়েক কদম এগিয়ে ঘোড়াগুলো থেমে গেল। অধৈর্য হয়ে আমি কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে, গাড়ি চলছে না কেন?' চালকের আসন থেকে নামতে নামতে সে জবাব দিল, 'কি হবে গাড়ি চালিয়ে? রাস্তাই মালুম হচ্ছে না, আলকাতরার মতো অন্ধকার — কোথায় এসে পড়েছি তার কোনো হদিশই পাচ্ছি না!' আমি লোকটিকে ধমকাতে শুরু করলাম, কিন্তু সাভেলিচ তার পক্ষ নিয়ে রাগের সঙ্গেই বলল, 'তখন তো তুমি ওর কথা শোনো নি! আমাদের উচিত ছিল সরাইখানায় ফিরে যাওয়া। সেখানে গরম চা খেয়ে নিয়ে রাত্রিটা কাটানো যেতে পারত,

তারপর ঝড় থামলে আবার বেরিয়ে পড়তে পারতাম। এত তাড়াহুড়ো করার দরকারটা কি শুনি! আমরা তো আর কোনো বিয়ে-বাড়িতে যাচ্ছি না!' সাভেলিচ ঠিক কথাই বলেছে। আমাদের কাহিল অবস্থা। ক্রমেই আরো বেশি বেশি বরফ পড়ছে, বরফের বিরাট এক স্তূপে জমে গেছে স্লেজগাড়িটার চারপাশে। ঘোড়াগুলোর মাথা ঝুলে পড়েছে নিচের দিকে, শিউরে উঠছে মাঝে মাঝে। কোচোয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু একটা করবার জন্যে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে লাগামগুলো। আপন মনে বিড়বিড় করছে সাভেলিচ। আমি চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কোথাও বাড়ির বা রাস্তার ক্ষীণ আভাসটুকুও চোখে পড়ে কিনা। চারদিকে শুধু তুষার-ঝড় পাক খেয়ে খেয়ে আর্তনাদ করে ছুটে চলেছে — আর কিছু নেই... তারপর হঠাৎ এক সময়ে কালো একটা জিনিসের ওপর আমার চোখ পড়ল। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওহে কোচোয়ান, দেখ্, দেখ্! কালো মতো কি একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে না?' আমি যেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখালাম, সেদিকে তাকিয়ে দেখল কোচোয়ান, তারপর আবার চালকের আসনে উঠে বসে বলল, 'ভগবান জানেন, হুজুর, ওটা কি! স্লেজগাড়িও নয়, গাছও নয়, নড়ছে চড়ছে মনে হয়। হয় নেকড়ে, নয় মানুষ।'

জিনিসটা যাই হোক না কেন, আমাদের দিকেই আসছে। আমিও সেদিকেই গাড়ি চালাতে বললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিনিসটার কাছে হাজির হয়ে আমরা দেখলাম, সেটি হচ্ছে মানুষ।

কোচোয়ান চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'ওহে ভালো মানুষের ছেলে, বলতে পারো রাস্তা কোন্‌দিকে?' পথচারী জবাবে দিল, 'এই তো রাস্তা। শক্ত জমির ওপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু তাতে আর লাভটা কি?' আমি বললাম, 'আচ্ছা, বাপু, এ সব অঞ্চল তোমার জানা কি? রাতটা কাটানোর মতো কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারো?'

পথচারী জবাব দিল, 'এই অঞ্চল আমার জানা বটে। ভগবানের দয়ায় এমুড়ো-ওমুড়ো, সব চুঁড়ে বেড়িয়েছি। কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো ঘোড়ায় চেপে। আবহাওয়াটা দেখছ তো? পথঘাট গুলিয়ে যায় একেবারে। তার চেয়ে বরং ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা ভালো। ঝড়

একসময়ে থামবেই আর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে — তখন তারার আলোয় পথ খুঁজে নেওয়া যাবে।'

লোকটির অবিচলিত ভাব দেখে আমার মধ্যে নতুন করে আশা সঞ্চারিত হল। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে এই প্রান্তরের মধ্যেই রাতটা কাটিয়ে দেব। হঠাৎ, পথচারী লোকটি আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কোচোয়ানের আসনে উঠে বসে, তাকে বললে: 'বেশ, হায় ভগবান, বাড়ি তেমন দূরে নয়। ডাইনে ঘুরে সোজা চালাও তো দেখি।'

বিরক্তি-ভরা স্বরে কোচোয়ান জিজ্ঞেস করল, 'কেন শুনি? ডানদিকে ঘুরতে যাব কেন? আমি তো কোনো রাস্তাই দেখতে পাচ্ছি না। চালাও! বলা তো খুবই সহজ! তোমার আর কি, ঘোড়াও নিজের নয়, গাড়িও নিজের নয়, বেমক্কা যেদিকে খুশি গাড়ি চালাও আর কি — তোমার তো আর পয়সা খরচ হচ্ছে না!' আমার মনে হল, কোচোয়ান ঠিক কথাই বলেছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি, কাছাকাছি বাড়ি আছে — এ কথা বলছ কেন?' পথচারী জবাব দিল, 'কেননা বাতাস ওদিক থেকে আসছে আর বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছি। তার মানে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোনো গাঁ আছে।' লোকটির উদ্ভাবনী মেধা ও তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তি দেখে আমি অবাক হলাম। নির্দিষ্ট দিকে গাড়ি চালাতে বললাম কোচোয়ানকে। পুরু বরফের মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলল ঘোড়াগুলো। অতি ধীরে ধীরে চলল স্লেজগাড়ি। কখনো গিয়ে উঠছে তুষারকণার স্তূপে, কখনো খাদের মধ্যে পড়ে যাবার মতো অবস্থা, কাত হয়ে যাচ্ছে এধার-ওধার — ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জাহাজের মতো। সাভেলিচ বারবার এসে ঠোক্কর খাচ্ছে আমার গায়ে আর বিড়বিড় করে মনের বিরক্তি প্রকাশ করছে। খসখসের পর্দাটা টেনে নামিয়ে দিলাম, ফারের কোটটা জড়িয়ে নিলাম আরো ভালো করে। তারপর ঝড়ের ঘুমপাড়ানি গান আর গাড়ির দোলানিতে আমি ঢুলতে লাগলাম।

তারপর আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সারা জীবনেও আমি সেই স্বপ্ন ভুলতে পারি নি। আমার জীবনে যে সব অদ্ভুত ঘটনাবলি ঘটেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এখনো আমার মনে হয়, স্বপ্নটা প্রায় ফলে

গেছে। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন: কারণ এ অভিজ্ঞতা হয়ত পাঠকেরও আছে যে মানুষ যতই কুসংস্কারকে তাচ্ছিল্য করুক না কেন, অত্যন্ত সহজেই সে এই কুসংস্কারের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

শরীরের ও মনের এমন একটা অবস্থায় আমি ছিলাম, যে অবস্থায় বাস্তব ধরা দেয় স্বপ্নের কাছে। বাস্তব আর মায়া মিলেমিশে তৈরি হয় আবছায়া সব মূর্তি — আর এই মূর্তিগুলি ঘুমের প্রথম তন্দ্রার মধ্যে ভর করে। আমার মনে হচ্ছিল, ঝড়ের ফোঁসফোঁসানি তখনো থামে নি আর বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে আমরা তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছি... হঠাৎ দেখি, আমার সামনেই একটা তোরণ; উঠোন পেরিয়ে আমাদের কাছারি বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামল। আমার প্রথম চিন্তা ছিল এই: যদিও বাধ্য হয়ে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে কিন্তু আমার বাবা মনে করতে পারেন যে আমি ইচ্ছে করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তাই আমার ওপরে তিনি রাগ করতে পারেন। উত্তেজনায় লাফিয়ে নেমে এলাম স্লেজগাড়ি থেকে। দেখলাম আমার মা প্রগাঢ় শোকের চিহ্ন মুখে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে তিনি বললেন, 'চুপ! শব্দ করিস নে! তোর বাবার ভয়ানক অসুখ করেছে — বাঁচবার আশা নেই! তোকে শেষ দেখা দেখতে চাইছেন!' আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে আমি মা'র পিছনে গিয়ে শোবার ঘরে পৌঁছলাম। ঘরটিতে অস্পষ্ট আলো, পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা শোকাচ্ছন্ন মুখে চারদিকে দাঁড়িয়ে। পা টিপে টিপে আমি বিছানার কাছে এগিয়ে গেলাম। মশারির একটা কোণ তুলে আমার মা বললেন, 'আন্দ্রেই পেত্রোভিচ, এই দেখো পেত্রুশা এসেছে। তোমার অসুখের খবর শুনেই ফিরে এসেছে। ওকে আশীর্বাদ করো।' হাঁটু মুড়ে বসে আমি রুগীর দিকে তাকালাম। কিন্তু এ কি দেখছি আমি?.. আমার বাবা নয়, বিছানায় শুয়ে আছে একজন চাষী। মুখে কালো দাড়ি, প্রসন্ন মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হতভম্ব হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এর মানে কি! আমার বাবা তো নয়। একজন চাষীর কাছে কেন আমি আশীর্বাদ চাইতে যাব?' আমার মা জবাব দিলেন, 'পেত্রুশা, তাতে কোন ক্ষতি হবে না। তোর বিয়ের সময় তোর বাবার হয়ে এই লোকটি তোকে আশীর্বাদ করবে। ওর হাতে চুমু দে, ও তোকে আশীর্বাদ করুক...' আমি এতে রাজি নই। তখন

সেই চাষীটি লাফিয়ে নেমে এল বিছানা থেকে। পিছন থেকে টাঙ্গিটা নিয়ে মারমুখী হয়ে চারদিকে ঘোরাতে শুরু করে দিল। আমি পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলাম... কিন্তু পারলাম না; মৃতদেহে ঘরটা ভরা, তাতে হোঁচট খেলাম, রক্তের পুকুরে আমার পা হড়কে গেল... তখন সেই ভয়ঙ্করদর্শন চাষীটি আমার দিকে তাকিয়ে আদর করে ডাকল, 'ভয় নেই। এসো আমার কাছে, তোমাকে আশীর্বাদ করব...' আতঙ্ক আর বিহ্বলতা গ্রাস করল আমাকে। ঠিক এই মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল আমার। ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়ে আছে, আর সাভেলিচ আমার জামার আস্তিন ধরে টানছে আর বলছে, 'নামো দাদাবাবু, পৌঁছে গেছি।'

'কোথায় পৌঁছে গেছি?' চোখ কচলাতে কচলাতে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সরাইখানায়। ভগবানের দয়া বলতে হবে, একেবারে সরাইখানার বেড়ার গায়ে এসে আমাদের গাড়ি ধাক্কা খেয়েছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, দাদাবাবু। ভিতরে গিয়ে শরীরটাকে গরম করবে চলো।'

আমি স্লেজগাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। ঝড় তখনো ফুঁশছে কিন্তু বেগ আগের চেয়েও স্তিমিত। চারদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। সরাইখানার মালিক কোটের ঝুলের আড়ে একটা লণ্ঠন নিয়ে এল ফটকের কাছে। বসবার ঘরে মালিক নিয়ে গেল আমাকে। ঘরটা অপরিসর কিন্তু বেশ পরিষ্কার। টিমটিমে একটা বাতি ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই। দেওয়ালে টাঙানো একটা বন্দুক আর উঁচু-চূড়ো একটা কসাক টুপি।

সরাইখানার মালিকটি ইয়াইক কসাক, মনে হয় বছর ষাটেক বয়স কিন্তু বেশ তাজা আর চাঙ্গা। একটু পরেই চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে হাজির হল সাভেলিচ, চা তৈরির জন্যে আগুন চাইল। আর কোনোদিন আমার কাছে চা এত আবশ্যক বলে বোধ হয় নি। সরাইখানার মালিক গেল ব্যবস্থাদি করতে।

সাভেলিচকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাদের পথপ্রদর্শক কোথায়?'

'এই যে হুজুর, এখানে।' জবাব এল মাথার ওপর থেকে। দেওয়ালের গায়ে অনেক উঁচুতে একটা মাচা রয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমার চোখে পড়ল কালো দাড়ি ও একজোড়া চকচকে চোখ। জিজ্ঞেস করলাম, 'শীত

করছে না কি, ভাই?' সে জবাব দিল, 'কি আর করি বলুন, এই পাতলা আর ছেঁড়া জামা গায়ে দিলে শীত আটকাবে কি করে? অবশ্য, ভেড়ার চামড়ার একটা কুর্তা আমার ছিল, কিন্তু লুকিয়ে লাভ কী? গত রাত্রে শুঁড়িখানার মালিকের কাছে সেটা বাঁধা দিয়েছি। ভাবি নি শীতের এত জোর।' এই সময়ে একটা ফুটন্ত সামোভার নিয়ে ঘরে ঢুকল সরাইখানার মালিক। পথপ্রদর্শক লোকটিকে আমি চা খাবার জন্যে ডাকলাম, সে নেমে এল মাচা থেকে। চেহারাটা তার আমার কাছে লাগল অসাধারণ। বয়স চল্লিশের মতো, লম্বায় মাঝারি, পাতলা শরীর, চওড়া কাঁধ। মুখের কালো দাড়িতে দু-একটা সাদা দাগ পড়েছে, বড়ো বড়ো দুটি চোখ সদাচঞ্চল। মুখের ভাবে একই সঙ্গে মাধুর্য আর শয়তানি। কসাক-ধরনে চুলের ছাঁট, পরনে ছোঁড়া কোট আর তাতার শালোয়ার। আমি তার হাতে এক পেয়ালা চা দিলাম। চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে মুখটা বিকৃত করে সে বলল, 'হুজুর, এতই যখন করেছেন, তখন মেহেরবানি করে একগ্লাস ভদ্‌কা দিতে বলুন আমাকে। চা কসাকদের পানীয় নয়।' বিনা বাক্যব্যয়ে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করলাম। সরাইখানার মালিক আলমারি থেকে একটা বোতল ও গ্লাস বার করে লোকটির কাছে নিয়ে গেল, তারপর তাকাল তার মুখের দিকে। বলল, 'আরে! তুমি! আবার এ সব জায়গায় ঘোরাঘুরি! এবারে কোথা থেকে?' পথপ্রদর্শকটি অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে হেঁয়ালির ভাষায় জবাব দিল, 'সব্‌জি ক্ষেতে উড়ে যাই আর শণের বীজ ঠোক্‌রাই, ঠানদি ঢিল ছুঁড়ে মারে — তবে ফসকে যায়। তারপর, তোমাদের খবর কি?'

'আমাদের আর খবর?' সরাইখানার মালিকও তেমনি হেঁয়ালির ভাষায় জবাব দিলে, 'সাঁঝের উপাসনার ঘণ্টা শুরু হল, কিন্তু পাদ্‌রির বৌ যেতে দেয় না। বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর।'

আমার ভবঘুরে সঙ্গীটি বলল, 'চুপ করো খুড়ো। বৃষ্টি হলে ব্যাঙের ছাতাও গজাবে। আর ব্যাঙের ছাতা গজালে ঝুড়িও জুটবে। এবার শুনে রাখো (আবার সে চোখ মটকাল) কুড়ুল সামলাও, বনরক্ষক ঘুরছে। হুজুরের স্বাস্থ্য কামনায়!' এই বলে সে গ্লাসটা নিয়ে ক্রুশচিহ্ন করে গিলে ফেলল এক ঢোকে। তারপর আমার দিকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে ফিরে গেল তার মাচায়।

সে সময়ে এই দুই 'মাসতুতো' ভাইয়ের আলাপ থেকে আমি কোনো অর্থই বার করতে পারি নি। কিন্তু পরে আমি বুঝতে পেরেছি, তারা কথা বলছিল ইয়াইক বাহিনীর হালচাল নিয়ে। ১৭৭২ সালে ইয়াইক বাহিনীর বিদ্রোহ তখন সবেমাত্র দমন করা হয়েছে। দুজনের কথাবার্তা শুনে সাভেলিচ যে আন্তরিক অসন্তুষ্ট হয়েছিল তা বোঝা যাচ্ছিল তার মুখের ভাব দেখে। একবার সরাইখানার মালিক, আর একবার পথপ্রদর্শক লোকটির মুখের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল সে। এই সরাইখানা, বা স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে **উমিওৎ**, বড়ো রাস্তা থেকে খানিকটা দূরে। চারদিকে শুধু জনবসতিহীন শূন্য প্রান্তর। এটা ডাকাতের আড্ডা হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের উপায়ান্তর নেই। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার চিন্তাও করা চলে না। সাভেলিচের অস্বস্তিতে আমার ভারি মজা লেগেছিল। ইতিমধ্যে রাত কাটাবার আয়োজন করে শুয়ে পড়লাম একটা বেঞ্চির ওপরে। সাভেলিচ ঘুমতে গেল চুল্লির তাকের ওপরে। সরাইখানার মালিক শুল মেঝেতে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকতে লাগল সকলের। মরার মতো ঘুমোলাম আমি।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরি করেই। দেখলাম ঝড় থেমে গিয়ে রোদ উঠেছে, বরফের চাদর-ঢাকা সীমাহীন প্রান্তর ঝলসে উঠেছে সেই রোদে, আর যাত্রার জন্যে ঘোড়ার গাড়ি তৈরি। সরাইখানার মালিকের প্রাপ্য চুকিয়ে দিলাম। দেখা গেল, টাকার জন্যে সরাইখানার মালিকের দাবি এত সামান্য, যে সাভেলিচ পর্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ অভ্যেসের বলে প্রতিবাদ বা দরাদরি করল না। তার মন থেকে গত রাত্রের সন্দেহ একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমি আমাদের পথপ্রদর্শককে ডেকে তার সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ জানালাম এবং তাকে পঞ্চাশ কোপেক ভদ্কার জন্যে দিতে বললাম সাভেলিচকে। ভুরু কুঁচকে সাভেলিচ বলল, 'ভদ্কা গিলবার জন্যে পঞ্চাশ কোপেক! কেন শুনি? তুমি দয়া করে তাকে স্লেজগাড়িতে এই সরাইখানায় নিয়ে এসেছ সে জন্যে? দাদাবাবু, তুমি যা চাও তা হোক, কিন্তু আমাদের বাড়তি পঞ্চাশ কোপেক নেই, এভাবে যদি তুমি প্রত্যেককে ভদ্কার জন্যে টাকা দিতে শুরু করো তাহলে শিগ্গিরই এমন দিন আসবে যে তোমার নিজেরই না খেয়ে কাটাতে হবে।' সাভেলিচের সঙ্গে তর্ক করা

চলে না। টাকা পয়সা সবই ওর হেপাজতে, এবং এই ব্যবস্থায় রাজি হয়ে আমি নিজেই কথা দিয়েছি। কিন্তু আমার খারাপ লাগছিল এই কথা ভেবে যে, আমাকে যে বাঁচিয়েছে — বাঁচিয়েছে দুর্বিপাক থেকে না হোক, অত্যন্ত প্রতিকূল একটা অবস্থা থেকে — তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা দেখাতে পারছি না। শান্ত স্বরে আমি বললাম, 'আচ্ছা বেশ, ওকে পঞ্চাশ কোপেক দিতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তাহলে ওকে আমার একটা পোশাক দিতে চাই। ওর জামাকাপড়ের বড়ো দুরবস্থা দেখছি, ওকে আমার খরগোসের চামড়ার কুর্তাটা দিয়ে দাও।'

সাভেলিচ বলল, 'সে কি কথা, দাদাবাবু! কুর্তা ওর কি দরকার? প্রথম যে শুঁড়িখানা সেখানেই বিক্রি করে দেবে মদ গিলবার জন্যে।'

আমার ভবঘুরে লোকটি বলল, 'ওহে বুড়ো, আমি মদ গিলি বা না গিলি সেটা তোমার মাথাব্যথা নয়। হুজুর তাঁর গায়ের কোট আমাকে দিতে চাইছেন, সেটা হুজুরের মর্জি। আর তোমার কাজ তর্ক করা নয়, হুকুম মানা।'

সাভেলিচ ফুঁসে উঠল, 'ভগবানের ভয় নেই ওরে, ডাকাত। ভেবেছ, এই বাচ্ছা ছেলেটা তো কিছু বোঝে না, বুদ্ধিশুদ্ধিও নেই — কাজেই খুশিমতো লুটপাট করে নেওয়া যাবে। কি হবে তোমার ভদ্দরলোকের জামা দিয়ে? ওই হতকুচ্ছিত কাঁধজোড়াকে এই কুর্তার মধ্যে ঢোকাতেই পারবে না!'

আমার খুড়োটিকে বললাম, 'থাক, আর বুদ্ধি ফলাতে হবে না। কুর্তাটা এনে দাও।'

সাভেলিচ আর্তনাদ করে উঠল, 'হায়, হায়, ভগবান! খরগোসের চামড়ার কুর্তাটা এখনো যে প্রায় নতুন গো! শেষকালে কিনা এক হতচ্ছাড়া মাতালের হাতে সেটা খোয়া যাবে।'

তবুও খরগোসের চামড়ার কুর্তাটা নিয়ে আসা হল। কালবিলম্ব না করে ভবঘুরেটি পরখ করবার জন্যে গায়ে চাপাল সেটা। কুর্তাটা আমারই ছোটো হয়ে এসেছে — লোকটির গায়ের মাপে জিনিসটা সত্যি সত্যিই খাটো। টেনেটুনে গায়ে চাপাতে গিয়ে যখন সেলাইয়ের কাছে খানিকটা ছিড়ে গেল, তখনই পরতে পারা পেল সেটাকে। পট্‌পট্‌ শব্দে সেলাই

ছি'ড়ে যেতে শ্নে সাভেলিচের তো গলা ফাটিয়ে চিৎকার জ্বড়ে দেবার মতো অবস্থা। ভবঘ্রে কিন্তু আমার এই উপহার পেয়ে মহাখ্নি। স্লেজগাড়ি পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়ে মাথা ন্ইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'হ্জ্রের অশেষ দাক্ষিণ্য! ভগবান আপনার মঙ্গল কর্ন। আপনার এই দয়া আমি জীবনে ভুলব না।' তারপর লোকটি নিজের পথ ধরল, আমি আমার গন্তব্য পথে চললাম। সাভেলিচের দ্বঃখ আমি গায়ে মাখি নি, কিছ্বক্ষণের মধ্যেই গতকালের তুষার-ঝড়, আমার পথপ্রদর্শক আর খরগোসের চামড়ার কুর্তার কথা ভুলে গেলাম।

ওরেনব্র্গে পেণছে আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম জেনারেলের কাছে। দেখলাম জেনারেলটি বেশ লম্বা এক মান্ষ, কিন্তু বয়সের ভারে ন্য়ে পড়েছেন। লম্বা লম্বা চুলগ্লো একেবারে সাদা। পরনে বিবর্ণ প্রনো ইউনিফরম, তাঁকে দেখাচ্ছিল আন্না ইয়োআন্নোভ্নার* সময়কালের একজন যোদ্ধার মতো। কথায় জার্মান টান বড়ো বেশি। বাবার চিঠিটা তাঁর হাতে দিলাম। বাবার নাম শ্নে তিনি চকিতে তাকিয়ে দেখলেন আমার ম্থের দিকে এবং বললেন, 'ফগবান! আন্দ্রেই পেত্রোভিচকে তোমার মতো ছোকরা দেখেছি সে ভি কেতনা আগে। আর এখন উনহারেই এইসা হওয়ান লেড়কা! ইসকো বোলা যাতা সময়।' তারপর তিনি খামটা ছি'ড়ে ম্দ্ স্বরে চিঠিটা পড়তে এবং সেই সঙ্গে ধারাবাহিক মন্তব্য করে যেতে লাগলেন: 'মান্যবর আন্দ্রেই কার্লোভিচ...' হ্:ঃ, কিসের জন্যে এসব ফদ্রতা! সরম হওয়া উচিত! নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হবে বৈকি, সত্যি কথা — কিন্তু প্রনো সাথীকে কেউ লেখে এই নয়!.. 'মান্যবর ভুলে যান নি...' হ্:ঃ... 'সেই যখন স্বর্গত ফিল্ড্-মার্শাল মিন... অভিযান... আর কারোলিন্কা!..' আহ্ ব্ডার! প্রনো ঠাট্টা-তামাসাগ্লো দেখছি এখনো মনে আছে... 'এবার কাজের কথায় আসি... আমার সর্বকনিষ্ঠ দ্বর্বত্তটিকে আপনার নিকট পাঠাইলাম'... হ্:ঃ... 'উহাকে কাঁটাদস্তানা দিয়া টিট্ করিয়া রাখিবেন।' 'কাঁটাদস্তানা' কী চিজ? র্শ দেশের কোনো একটা প্রবাদ হওয়ার কথা? কাঁটাদস্তানা দিয়ে রাখাটা কী?' দ্বিতীয় বার কথাটার প্নরাবৃত্তি করে জিজ্ঞেস করলেন আমায়।

নিরীহের মতো মুখ করে আমি বললাম, 'এর মানে, আপনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, আমার সম্পর্কে খুব বেশি কড়াকড়ি করবেন না, আমাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেবেন, অর্থাৎ কাঁটাদস্তানা দিয়ে আমাকে টিট্ করে রাখবেন।'

'ও, তাই বুঝি... 'উহাকে স্বাধীনতা দিবেন না...' এই তো... স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কাঁটাদস্তানা দিয়ে টিট্ করার অর্থটা তুমি যা আমাকে বললে তা ঠিক নয়... 'উহার পাসপোর্ট এই সঙ্গে পাঠাইলাম...' কোথায়? ও, এই যে! 'সেমেনভস্কি রেজিমেণ্টকে জানাইবেন যে...' ভালো, ভালো, তাই করা হবে... 'পদ নির্বিশেষে পুরনো কমরেড আর বন্ধু হিসেবে আলিঙ্গন করতে দাও।' ...যাক, শেষ পর্যন্ত খেয়াল হয়েছে... ইত্যাদি, ইত্যাদি...' চিঠিটা পড়া শেষ হলে পাসপোর্টটা সরিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'তাই করা হবে। অমুক রেজিমেণ্টে অফিসার তালিকাভুক্ত হবে তুমি, আর যাতে সময় নষ্ট না হয় সে জন্যে কালই তুমি রওনা হবে বেলোগর্স্ক কেল্লায়। সেখানে ক্যাপটেন মিরোনভ আছেন; অত্যন্ত খাঁটি ও সৎ লোক — তারই অধীনে থাকতে হবে তোমাকে। সত্যিকারের সৈন্যজীবন কাকে বলে সেটা জানতে পারবে ওখানে গিয়ে, শৃঙ্খলা শিখতে পারবে। ওরেনবুর্গে থেকে তোমার কিছু করার নেই আর তরুণদের পক্ষে কুঁড়েমিটাই খারাপ। হ্যাঁ, আজ আমার এখানে খেতে ডাকছি, এসো।'

অবস্থাটা ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে! ভাবলাম: 'মা'য়ের পেটে থাকতেই রক্ষী বাহিনীর সার্জেণ্ট হিসেবে আমার নাম লিখিয়ে লাভটা কী হয়েছে শুনি? শেষকালে কিনা আসতে হল কিরগিজ-কাইসাক স্তেপ অঞ্চলের সীমানায় এক রেজিমেণ্টে, পাণ্ডববর্জিত এক কেল্লায়!..' আন্দ্রেই কার্লোভিচের সঙ্গে খেলাম। মোট তিনজন ছিলাম আমরা — তিনি, তাঁর পুরনো এডিকং এবং আমি। দেখা গেল খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে তাঁর জার্মানসুলভ চূড়ান্ত রকমের মিতব্যয়িতা এবং আমার মনে হয়, আমাকে যে এত তাড়াতাড়ি ছাউনিতে পাঠিয়ে দিলেন তার পিছনে অংশত এই ভয় ছিল যে তাঁর নিঃসঙ্গ ডিনার টেবিলে অতিরিক্ত কেউ আবার না আসে। পরদিন জেনারেলের কাছে বিদায় নিয়ে আমি গন্তব্য অভিমুখে রওনা হলাম।

পাভেল নাশ্চোকিন (১৮০০-১৮৫৪) — মস্কোর অভিজাত। পুশকিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জলরঙ। ১৮৩৬

ভিস্‌সারিওন বেলিন্‌স্কি (১৮১১-১৮৪২) — সাহিত্যসমালোচক ও প্রাবন্ধিক, রুশ বৈজ্ঞানিক সমালোচনার প্রবর্তক। পুশকিনের রচনা নিয়ে একাধিক প্রবন্ধের লেখক। জলরঙ। ১৮২০-এর দশক

নাতালিয়া পুশকিনা। কবিপত্নী। জলরঙ। ভ. গাউ-এর কাজ। ১৮৪৩

পুশকিন। ত. রাইতের এনগ্রেভিঙ। ১৮৩৭

মিখাইল লের্মন্তভ (১৮১৪-১৮৪১) — মহান রুশ কবি। জলরঙ। ১৮৪১

তৃতীয় অধ্যায়

কেল্লা

কেল্লায় থাকি ভাই, রুটি জল খাদ্য
শত্রুর তরে আছে পৃথক বরাদ্দ।
পিঠে পুলি খাবে বলে আসে তারা যবে
ভূরিভোজে সমাদর করি মোরা সবে।
বারুদ বুলেট আর শেল গোলাগুলি
তাদের তরেই ভরে আছে ঝোলাঝুলি।

সৈনিকদের গান।

'পুরনো কালের মানুষ, হুজুর।'

'বয়স্ক নাবালক'।

ওরেনবুর্গ থেকে চল্লিশ ভার্স্ট দূরে বেলোগর্স্ক কেল্লা। ইয়াইক নদীর খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তাটা গেছে। নদীটা তখনো বরফে জমে যায় নি, ধবধবে বরফ-ঢাকা দুই তীরের মাঝখান দিয়ে সীসে রঙের জলের স্রোতকে কালো আর বিষণ্ণ দেখায়। দুদিকে প্রসারিত কিরগিজ স্তেপ অঞ্চল। আমি গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলাম; চিন্তার বেশির ভাগই ছিল বিষণ্ণতা। ছাউনির জীবনে কোনো বৈচিত্র্য আছে বলে আমার মনে হয় নি। মনে মনে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম, আমার ভাবী উচ্চতর অফিসার ক্যাপটেন মিরোনভ মানুষটি কেমন হবেন। কল্পনায় একটা ছবি ভেসে উঠল: বদমেজাজী বুড়ো, সমস্ত ব্যাপারে ভয়ানক কড়াকড়ি, জগৎসংসার বলতে বোঝেন শুধু নিজের কাজকর্ম, তুচ্ছতম ত্রুটির জন্যেই আমাকে তিনি গ্রেপ্তার করে দিনের পর দিন শুকনো রুটি আর জল খাইয়ে রাখবেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। আমাদের গাড়ি বেশ জোরেই চলছিল। কোচোয়ানকে

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেল্লা কি আরো অনেক দূরে?' সে জবাব দিল, 'খুব বেশি দূরে নয়। ওই তো এবার দেখা যাচ্ছে।' আমি চারদিকে তাকাতে লাগলাম। ভেবেছিলাম দেখতে পাব মস্ত গুরুগম্ভীর বুরুজ আর র‍্যাম্পার্ট; কিন্তু কাঠের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে ঘেরা কয়েকটা এলোমেলো কাঠের বাড়ি ছাড়া কিছুই নজরে পড়ল না। রাস্তার এক ধারে তিন চারটে খড়ের গাদা, অনেকটাই বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। অন্য ধারে একটা হুমড়ি খেয়ে পড়া হাওয়াকল, দেখতে খেলনার মতো পাখাগুলো অলসভাবে ঝুলে আছে। অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কেল্লা কোথায়?' সেই মুহূর্তে আমরা যে একটা ছোট গ্রামের মধ্যে ঢুকছিলাম, সেদিকে আঙুল দেখিয়ে কোচোয়ান বলল, 'ওই তো।' দেখলাম প্রবেশপথের একপাশে রয়েছে একটা প্রাচীন যুগের লোহার কামান, রাস্তাগুলো সরু সরু আর আঁকাবাঁকা, বাড়িগুলো নিচু নিচু, আর অধিকাংশ বাড়িতেই খড়ের চাল। অধিনায়কের আপিসের দিকে গাড়ি চালাতে হুকুম দিলাম কোচোয়ানকে। একটু পরেই স্লেজগাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল সেটা উঁচু জমির ওপর ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি আর বাড়িটার পাশেই একটা কাঠের গির্জা।

আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কেউ বাইরে এল না। অলিন্দে ঢুকে আমি প্রবেশপথের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। বাইরের ঘরে একটা টেবিলের ওপরে বসে আছে একজন বুড়ো বিকলাঙ্গ সৈনিক; একটা সবুজ উর্দির কনুইয়ে নীল কাপড়ের তালি লাগাচ্ছে। আমার আসার খবর ঘোষণা করতে বললাম তাকে। সে জবাব দিল, 'বাপু, আপনি ভিতরে চলে যান, ওনারা বাড়িতেই আছেন।' আমি ভিতরে ঢুকলাম। একটা ছোট পরিষ্কার ঘর, পুরনো ধরনের আসবাবে সাজানো। এক কোণে একটা আলমারির মধ্যে আছে পেয়ালা ডিশ ইত্যাদি, দেওয়ালে ঝুলছে ফ্রেম আর কাচ দিয়ে বাঁধানো অফিসারের পরিচয়পত্র। তার পাশেই কয়েকটি স্থূল ধরনের ছবি; ছবিগুলোর নাম — 'কিস্ত্রিন ও ওচাকভ জয়', 'কনে বাছাই', 'বেড়ালের শবযাত্রা'। একজন বৃদ্ধা বসে আছেন জানলার কাছে, পরনে তুলো-ভরা জ্যাকেট, মাথায় রুমাল। বসে বসে তিনি উল জড়াচ্ছেন। দুহাত সামনে বাড়িয়ে উলটা উঁচু করে তুলে ধরে আছেন অফিসারের সাজপোশাক-পরা একজন একচোখওলা বুড়ো লোক। হাতের কাজ না থামিয়ে বৃদ্ধা

জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই বাছা?' আমি জবাব দিলাম যে আমি এসেছি সৈন্যদলে কাজ করবার জন্যে এবং ক্যাপটেনের কাছে আমার উপস্থিতির সংবাদ জানানো কর্তব্য বলে মনে করেছি। এই বলে সেই একচক্ষু বৃদ্ধটির দিকে ফিরে দাঁড়ালাম, আমার ধারণা হয়েছিল যে তিনিই হচ্ছেন অধিনায়ক। আমি কি বলব তা আগেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম কিন্তু গৃহস্বামিনী বাধা দিয়ে বললেন, 'ইভান কুজমিচ বাড়িতে নেই, ফাদার গেরাসিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। তবে ভাবনা নেই বাছা, আমি তার কর্ত্রী। স্বাগত জানাচ্ছি। বসো বাছা।' তারপর তিনি ঝিকে ডাক দিলেন এবং সার্জেন্টকে ডেকে আনবার জন্যে পাঠালেন তাকে। সেই বৃদ্ধ তাঁর একচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়ে তাকাচ্ছিলেন আমার দিকে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, 'জানতে পারি কি, আপনি কোন্ রেজিমেণ্টে ছিলেন?' আমি তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করলাম। তিনি প্রশ্ন করে চললেন, 'জানতে পারি কি, কেন আপনি রক্ষী বাহিনী ছেড়ে ছাউনিতে আসছেন?' আমি জানালাম যে এই হচ্ছে আমার ওপরওলাদের ইচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নকর্তা নাছোড়বান্দা; তাঁর পরবর্তী প্রশ্ন: 'মনে হচ্ছে, আপনি এমন কিছু আচরণ করেছিলেন যা রক্ষী বাহিনীর অফিসারের অনুপযুক্ত — নয় কি?' ক্যাপটেনপত্নী বললেন, 'হয়েছে, বাজে বক্‌বকানি থামাও তো! দেখতে পাচ্ছ না, যুবকটি পথশ্রমে ক্লান্ত — একটু রেহাই দাও ওকে! (সোজা করে হাত রাখো!) আর তোমায় বলছি বাপু, শোনো,' তারপর আমার উদ্দেশে বলতে লাগলেন, 'এই অজ জায়গায় পাঠানো হয়েছে বলে দুঃখ করো না। তুমিই প্রথম নও, আগেও অনেকে এসেছে, পরেও অনেকে আসবে। কিছুদিন পরেই অভ্যেস হয়ে যায়। তখন আর খারাপ লাগে না। এই তো আলেক্সেই ইভানভিচ শ্ভাব্রিন চার বছর হল এখানে এসেছে। মানুষ-খুনের দায়ে আসতে হয়েছিল ওকে, ভগবান জানেন কেন ওর মাথায় এই দুর্বুদ্ধি চাপে। শোনো বলি, একজন লেফ্‌টেনাণ্ট আর ও একদিন তলোয়ার নিয়ে শহরের বাইরে যায়, তারপর খোঁচাখুঁচি করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে ও করে কি, নিজের তলোয়ার দিয়ে লেফ্‌টেনাণ্টের শরীর ফুঁড়ে দেয় একেবারে। দুজন সাক্ষীও ছিল! কী আর করবে বলো। পাপের তো আর ওঝা নেই।'

ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল সার্জেণ্ট, লম্বা-চওড়া চেহারার একজন তরুণ কসাক। ক্যাপটেন-পত্নী বললেন, 'মাক্‌সিমিচ, এই অফিসারটির জন্যে বেশ ভালোমতো একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দাও।' সার্জেণ্ট জবাব দিল, 'জো হুকুম, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা। মান্যবরের থাকবার জায়গা কি ইভান পলেজায়েভের ওখানে করব?' ক্যাপটেন-পত্নী জবাব দিলেন, 'ধুৎ, মাক্‌সিমিচ, ওখানে এমনিতেই বড়ো ঠাসাঠাসি। তা ছাড়া পলেজায়েভ আমার পাতানো মিতা, বোঝে যে আমরা তার উপরওলা। বরং অফিসারটিকে... তা বাছা, তোমার নাম পিতৃনামটা কী? পিওতর আন্দ্রেইচ? .. বেশ, পিওতর আন্দ্রেইচকে নিয়ে যাও সেমেন কুজভের ওখানে। শয়তানটা আমার সব্‌জির বাগানে ওর ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর মাক্‌সিমিচ, কোথাও গণ্ডগোল হয় নি তো?'

কসাকটি জবাব দিল, 'ভগবানের দয়ায় সব শান্ত আছে। একবার শুধু কর্পোরাল প্রখোরোভ স্নানঘরে এক বালতি গরম জল নিয়ে উস্‌তিনিয়া নেগুলিনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল।'

'ইভান ইগ্‌নাতিচ!' ক্যাপটেন-পত্নী এবার সেই একচক্ষু বৃদ্ধকে বলতে লাগলেন, 'প্রখোরোভ ও উস্‌তিনিয়ার ব্যাপারটা যাচাই করে দেখো তো দোষটা কার, তবে শাস্তি দেবে দুজনকেই। ঠিক আছে মাক্‌সিমিচ, এবার তুমি যেতে পারো! পিওতর আন্দ্রেইচ, মাক্‌সিমিচ আপনাকে থাকবার জায়গা দেখিয়ে দেবে।'

নমস্কার জানিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম। সার্জেণ্ট আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল নদীর উঁচু পাড়ের দিকে, কেল্লার অন্তর্ভুক্ত এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে। বাড়ির অর্ধেকটায় থাকে সেমেন কুজভ ও তার পরিবার, বাকি অর্ধেকটা দেওয়া হল আমাকে। একটিমাত্র ঘর, মাঝখানে আড়াল দিয়ে ভাগ করা, বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সাভেলিচ সব ঠিকঠাক করার কাজে লেগে গেল আর আমি সরু জানলাটা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। যতদূর চোখ যায়, বিষণ্ণ স্তেপ অঞ্চল। প্রায় উল্টোদিকেই কয়েকটা কুঁড়েঘর, কয়েকটা মুরগী রাস্তার এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। হাতে গামলা নিয়ে এক বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির দরজার সামনে, শুয়োর-গুলোকে ডাকছে, সেই ডাক শুনে শুয়োরগুলোও সানন্দে সাড়া দিচ্ছে

ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। এমনই নির্মম ভাগ্য আমার যে এই জায়গাতেই আমার যৌবনকাল কাটাতে হবে। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। জানলা থেকে সরে এসে আমি কিছু না খেয়েই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সাভেলিচ অনেক সাধ্যসাধনা করল আর সখেদে বারবার বলতে লাগল, 'হায় ভগবান! না খেয়েই শুয়ে পড়ল! এখন যদি একটা অসুখ-বিসুখ করে তা হলে গিন্নির কাছে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!'

পরদিন সকালে উঠে আমি পোশাক পরতে শুরু করেছি, ঠিক সেই সময়ে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল একজন তরুণ অফিসার। চেহারার দিক থেকে তাকে খাটোই বলা চলে, শামলা রঙ, আর যাই হোক সুপুরুষ কিছুতেই নয়, তবে মুখের হাবভাব খুবই জীবন্ত। ফরাসী ভাষায় সে আমাকে বলল, 'ভদ্রতার অপেক্ষা না রেখেই আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি বলে ক্ষমা করবেন। গতকাল আপনার আসার খবর শুনেছি। শুনে আর থাকতে পারলাম না; কতকাল পরে একটি মানুষের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে। থাকুন এখানে কিছুদিন তখন আমার কথার মর্ম আপনি বুঝবেন।' আমি অনুমান করে নিলাম যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ লড়ার জন্যে এই অফিসারটিকেই রক্ষী বাহিনী থেকে এখানে বদলি করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা হতে কিছুমাত্র বিলম্ব হল না। শ্ভাব্রিনকে দেখে খুবই বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। তা ছাড়া, বাক্‌পটু এবং সদালাপী। অধিনায়ক ও তার পরিবার সম্পর্কে, আমার ভাগ্য যেখানে আমাকে টেনে এনেছে সেই জায়গার সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে মজা করে বর্ণনা দিল সে। মশগুল হয়ে আমি হাসছিলাম, এমন সময় ঘরে ঢুকল সেই সৈন্যটি যাকে আমি আগের দিন অধিনায়কের বাড়িতে ঢোকার মুখের ঘরটায় বসে পোশাকে তালি দিতে দেখেছি। ঘরে ঢুকে সে আমাকে জানাল যে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা আমাকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্ভাব্রিন নিজের থেকেই বলল যে আমাকে সে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

অধিনায়কের বাড়ির কাছাকাছি এসে আমরা দেখলাম যে মাঠের মাঝখানে জনকুড়ি বৃদ্ধ রুগ্‌ণ লোককে এ্যাটেন্‌শন ভঙ্গিতে দাঁড় করানো হয়েছে। লম্বা বিনুনি করে সকলের চুল বাঁধা, মাথায় তিনকোণা টুপি। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন অধিনায়ক। বুড়োর লম্বা চেহারা, ক্ষিপ্র

চালচলন, পরনে রাতটুপি আর ড্রেসিং গাউন। শ্‌ভাব্রিন ও আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে, স্নেহের সঙ্গে দু-চারটে কথা বললেন আমায়, তারপর আবার ড্রিল করাতে লাগলেন সেই লোকগুলোকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার ইচ্ছে ছিল আমাদের। কিন্তু ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার কাছে যেতে বললেন তিনি আমাদের এবং কথা দিলেন যে তিনি নিজেও কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন। 'এখানে তোমরা আর কি দেখবে — কিছু দেখবার নেই,' বললেন কথার শেষে।

সহজ সম্প্রীতির সঙ্গে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা ঘরে নিয়ে বসালেন আমাদের। আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বললেন যেন আমি তাঁর অনেকদিনের পরিচিত। পরিচারিকাটি টেবিল সাজাচ্ছিল, তাকে সাহায্য করছিল সেই বিকলাঙ্গ সৈনিকটা। ক্যাপটেন-পত্নী বললেন, 'ইভান কুজমিচ আজ বড়ো বেশি সময় ধরে ড্রিল করাচ্ছে। পালাশো, যাও কর্তাকে ডেকে নিয়ে এসো। আর মাশা কোথায় গেল?' এই সময় ঢুকল একটি বছর আঠারোর মেয়ে। গোলগাল মুখ, গালে লাল ছোপ, আরক্ত কানের পিছনদিকে বাদামী চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। প্রথম দৃষ্টিতে তাকে আমার তেমন ভালো লাগে নি। শ্‌ভাব্রিন আমাকে বলেছে যে অধিনায়ক-নন্দিনী মাশা অনেকটা হাবা ধরনের। তাই কুসংস্কারমুক্ত চোখ নিয়ে আমি ওর দিকে তাকাতে পারি নি। মেয়েটি এক কোণে বসে সেলাই করতে লাগল। ইতিমধ্যে বাঁধা কপির সুপ আনা হয়েছে। স্বামীকে দেখতে না পেয়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না আবার পালাশাকে পাঠালেন স্বামীর খোঁজে। বললেন, 'কর্তাকে গিয়ে বলো যে অতিথিরা অপেক্ষা করছে, খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ড্রিল করানো তো পরেও চলতে পারে — ভগবানের ইচ্ছেয় লোকজনের ওপর হম্বিতম্বি করার সময় তো যথেষ্টই পড়ে আছে।' একটু পরেই ক্যাপটেন এসে হাজির। সঙ্গে সেই একচক্ষু বৃদ্ধ লোকটি। 'তোমার কি কান্ড গো! সেই কখন খাবার দেওয়া হয়েছে, তোমার আর আসার ফুরসৎ হয় না।' ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'ব্যাপারটা কি জানো, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা। এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম, সৈন্যদের ড্রিল করাচ্ছিলাম একটু।' ক্যাপটেন-পত্নী বললেন, 'দূর, দূর! ওই লোকগুলোকে ড্রিল করিয়ে লাভ কি? ওরা কক্ষনো এ সব শিখতে

পারবে না। আর তোমার নিজেরও জিনিসটা খুব ভালো জানা নেই। বরং তোমার পক্ষে বাড়িতে থেকে ভগবানের নাম করাই ভালো। কই গো অতিথিরা, খেতে বসো।'

আমরা খেতে বসলাম। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা এক মুহূর্তের জন্যেও কথা বন্ধ করলেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করে চললেন আমার ওপরে। কে আমার বাবা-মা? তাঁরা এখনো বেঁচে আছেন কিনা? কোথায় জীবন কাটিয়েছেন তাঁরা? টাকা-পয়সা কী রকম আছে? আমার বাবার তিনশ' ভূমিদাস আছে শুনে অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'দেখো দিকি কান্ড! এমন লোকও আছে যাদের অঢেল টাকা। কিন্তু আমাদের যথাসর্বস্ব এই একটি ঝি — পালাশা। তবে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদের দিন যে খুব খারাপ যাচ্ছে তা নয়। একমাত্র মনস্তাপ মাশাকে নিয়ে। মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে — কিন্তু যৌতুকের ব্যবস্থা কই? যৌতুক বলতে নিজের একটা কাঁকুই, একটা ঝাড়ু আর একটা রুপোর টাকা (দোষ নিও না ভগবান!)। সৎ মানুষ যদি কেউ ওকে বিয়ে করতে চায় — ভালো, নইলে সারা জীবন কুমারী থাকতে হবে ওকে।' মারিয়া ইভানভনার দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম। মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। আর সত্যি সত্যিই চোখ থেকে জল ঝরে পড়ছে প্লেটের ওপরে। ওর জন্যে দুঃখ হল আমার। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করবার জন্যে বেশ অসংলগ্নভাবেই আমি বললাম, 'আমি শুনেছি বাশ্‌কিররা নাকি আপনাদের কেল্লা আক্রমণ করবার মতলব আঁটছে?' 'কার কাছ থেকে একথা শুনলে বাপুহে, বলবে কি?' ইভান কুজমিচ প্রশ্ন করলেন। আমি জবাব দিলাম, 'ওরেনবুর্গে শুনেছি।' অধিনায়ক বললেন, 'বাজে কথা। বহুকাল ধরে এখানকার অবস্থা শান্ত। বাশ্‌কিররা সব ভয় পেয়ে আছে, কিরগিজরাও শিক্ষা পেয়েছে। মনে হয় না ওরা আর কোনো উৎপাত করতে সাহস করবে। আর যদি করে তো এমন উত্তম মধ্যম দিয়ে ছাড়ব যে দশ বছর আর টুঁ শব্দটি করবে না।' ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌নার দিকে ফিরে তাকিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই কেল্লার ওপরে তো যে কোনো মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে, এখানে থাকতে আপনার ভয় করে না?' ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না জবাব দিলেন, 'আমার অভ্যেস হয়ে গেছে, বাপু। কুড়ি বছর আগে যখন

আমরা রেজিমেণ্ট থেকে বদলি হয়ে এখানে আসি, তখন ওই বিধর্মী লোকগুলোর কথা ভেবে কী আতঙ্কই না হয়েছিল! বনবেড়ালের লোমের তৈরি ওদের মাথার টুপি চোখে পড়লে বা ওদের হুঙ্কার কানে গেলে বুকের ধুকপুকুনি বন্ধ হয়ে যেত যেন। কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলছি না। কিন্তু এখন ওদের দেখে দেখে চোখ সওয়া হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ এসে আমাকে বলে যে শয়তানগুলো কেল্লার চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা হলেও আমি এক পা নড়ব না।'

অর্থপূর্ণ স্বরে শ্ভাব্রিন মন্তব্য করল, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না সত্যিকারের বীরাঙ্গনা। ইভান কুজমিচ এ ব্যাপারে সাক্ষী দিতে পারবেন।'

ইভান কুজমিচ বললেন, 'তা বটে। অল্পেতেই মূর্ছা যায় তেমন মেয়েই নয় ও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর মারিয়া ইভানভ্না? তিনিও কি আপনার মতোই সাহসী?'

মাশার মা জবাব দিলেন, 'মাশা সাহসী কিনা জিজ্ঞেস করছ বাপু? না, ভয়ানক ভীতু। এখনো রাইফেলের গুলির আওয়াজ পর্যন্ত সইতে পারে না। শুনলেই একেবারে আঁতকে ওঠে। বছর দু-এক আগে আমার জন্মদিনে ইভান কুজমিচ কামান দাগবার হুকুম দিয়েছিল। মেয়ে আমার তো ভয়েই মারা পড়বার যোগাড়। তারপর থেকে এই হতভাগা কামানটা আর ব্যবহার করা হয় নি!'

খাওয়া শেষ করে আমরা একসঙ্গে উঠলাম। ক্যাপটেন ও ক্যাপটেন-পত্নী একটু ঘুমোবার জন্যে নিজেদের ঘরের দিকে গেলেন। আমি শ্ভাব্রিনের ঘরে গিয়ে সারাটা সন্ধ্যে কাটালাম তার সঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ঠিক্‌সে দাঁড়াও মশায় গো — করে প্রাণপণ চেষ্টা
দেখব যাতে মোর তলোয়ার তোমায় বেঁধে শেষটা।

ক্‌নিয়াজ্‌নিন।*

কয়েক সপ্তাহ কাটল। ইতিমধ্যে বেলোগর্স্ক কেল্লায় আমার জীবন শুধু যে সহনীয় হয়ে উঠেছে তা নয়, ভালোও লাগছে। অধিনায়কের পরিবারে আমি ঘরের ছেলের মতো হয়ে উঠেছি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব চমৎকার মানুষ। এক সাধারণ সৈনিকের ঘর থেকে এসে ইভান কুজমিচ অফিসার হয়েছেন, লেখাপড়া কিছুই জানেন না, সাদাসিধে মানুষ, কিন্তু অতিমাত্রায় সৎ ও উদার। তাঁকে চালনা করেন তাঁর স্ত্রী। মানুষটির স্বভাবই এমন। ফলে স্ত্রীর এই আধিপত্য তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা ফৌজী ব্যাপারটাকেও দেখেন নিজের গৃহস্থালি হিসেবে। কেল্লাটাকে চালান ঠিক নিজের বাড়ির মতো। আমার সম্পর্কে মারিয়া ইভানভনার সঙ্কোচ কিছুদিনের মধ্যেই কেটে গেল। পরস্পর বন্ধু হয়ে উঠলাম আমরা। দেখলাম, মেয়েটি বুদ্ধিমতী, অনুভূতিপ্রবণ। নিজের অগোচরেই এই উদার পরিবারের অনুগত হয়ে উঠলাম আমি। এমন কি ছাউনির লেফ্‌টেনাণ্ট কানা ইভান ইগ্‌নাতিচকেও ভালো লাগতে লাগল। শ্‌ভাব্রিনের কাছে এই লোকটি সম্পর্কে একটা বদনামও শুনেছিলাম; গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে এই লোকটির নাকি অবৈধ সম্পর্ক আছে। এই ধারণার সপক্ষে সামান্যতম কারণ আছে বলেও আমার মনে হয় নি। কিন্তু শ্‌ভাব্রিন এ বিষয়ে নির্বিকার।

যথাসময়ে আমি অফিসার পদভুক্ত হলাম। যে সব দায়িত্ব আমাকে

পালন করতে হত তা কষ্টসাধ্য নয়। ঈশ্বর রক্ষিত এই কেল্লা, এখানে না আছে নিয়মিত পরিদর্শন, না আছে কুচকাওয়াজ বা পাহারার ডিউটি। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একবার অধিনায়কের খেয়াল চাপে যে সৈন্যদের একটু কুচকাওয়াজ করাতে হবে। তা সত্ত্বেও তিনি যে সৈন্যদের সবার মধ্যে বাঁদিক, ডানদিকের জ্ঞানটুকু হুঁশ করাতে পেরেছেন তা নয়। অবশ্যি ভুল না করার জন্যে প্রতিবার ঘোরার সময়ে তারা ক্রুশ করছিল। শ্ভাব্রিনের কাছে কয়েকটি ফরাসী বই ছিল। আমি পড়তে শুরু করি এবং ক্রমে আমার মধ্যে একটা সাহিত্যিক প্রেরণা জেগে ওঠে। সকালবেলাটা কাটে বই পড়ে, অনুবাদ করার চেষ্টা করে এবং এমন কি মাঝে মাঝে কবিতা লিখে। প্রায় রোজই আমি খেতে যাই অধিনায়কের বাড়িতে এবং দিনের বাকি অংশটুকু কাটাই সেখানে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে বেড়াতে আসেন পাদ্রি গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী আকুলিনা পাম্ফিলভনা। গুজব রটনায় ইনি সবার সেরা এই জেলায়। আর বলা বাহুল্য, শ্ভাব্রিনের সঙ্গে রোজই দেখা হয়। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই শ্ভাব্রিনের কথাবার্তা বিরক্তিকর হয়ে উঠছে আমার কাছে। অধিনায়কের বাড়ি নিয়ে তার ঠাট্টা-তামাসা এবং বিশেষ করে মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে তার ব্যঙ্গোক্তি শুনে প্রচণ্ড রাগ হয় আমার। এই কেল্লায় মেলামেশার জায়গা এই একটি। কিন্তু আমি এতেই খুশি, আর বেশি কিছু আমি চাই না।

নানা ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও দেখা গেল যে বাশ্কিরদের মধ্যে কোনো রকম চাঞ্চল্যের চিহ্ন নেই। কেল্লার আশেপাশে অঞ্চলে পরিপূর্ণ শান্তি। কিন্তু শান্তি ক্ষুণ্ণ হল নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বে।

আগেই বলেছি যে এই সময়ে আমি লিখতে শুরু করেছি। সমসাময়িক বিচারে আমার লেখাগুলোকে ভালোই বলা চলে। কয়েক বছর পরে আলেক্সান্দর পেত্রোভিচ সুমারোকভ* খুব প্রশংসা করেছিলেন লেখাগুলোর। একবার চেষ্টাচরিত্র করে আমি একটা কবিতা লিখলাম এবং কবিতাটা আমার নিজের ভালোও লাগল। সকলেই জানেন যে লেখকেরা মতামত জিজ্ঞেস করবার নামে মাঝে মাঝেই এমন একজন শ্রোতাকে চায় যার কাছ থেকে কিছুটা প্রশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। সুতরাং গানটি রচনা করে আমিও গিয়ে হাজির হলাম শ্ভাব্রিনের কাছে। কবিতার সমঝদার বলতে এই কেল্লায় সেই

হচ্ছে একমাত্র লোক। প্রথমে একটু ভণিতা করে নিয়ে পকেট থেকে খাতাটা বার করলাম এবং নিচের এই কবিতাটি পড়ে শোনালাম তাকে:

ইচ্ছা করে নাশ করি প্রেমের ভাবনা,
ভুলে যাই অপূর্বের কথা,
হায়, হায়, মাশাকে এড়িয়ে,
পেতে চাই মুক্তি, স্বাধীনতা!

আঁখি তার বন্দী রাখে আমারে সর্বদা,
প্রতিক্ষণে মোর চোখে ভাসে;
আমার মর্মের মাঝে আনে অন্ধকার,
চিত্তমাঝে শান্তি মোর নাশে।

মাশা, তুমি জানো মোর অন্তরের দশা,
দয়া করো, দয়া করো মোরে;
কেবল তুমিই পারো মোরে মুক্তি দিতে,
চিরবন্দী আমি তব করে।*

'কী রকম মনে হচ্ছে?' শ্‌ভাব্রিনকে জিজ্ঞেস করলাম। আশা ছিল যে শ্‌ভাব্রিন আমাকে প্রশংসা করবে, যা অবধারিতরূপে আমার প্রাপ্য। কিন্তু অপরিসীম ক্ষোভের সঙ্গে শুনতে পেলাম, যে শ্‌ভাব্রিন এমনিতে সব ব্যাপারে আমায় এত বেশি প্রশ্রয় দেয় সে জোর গলায় ঘোষণা করছে যে আমার কবিতাটি ভালো হয় নি।

'কেন?' নিজের ক্ষোভ গোপন করে জিজ্ঞেস করলাম।

সে জবাব দিল, 'কারণ এমন কবিতা আমার গুরু ভাসিলি কিরিলিচ ত্রেদিয়াকোভ্‌স্কির* যোগ্য, তাঁর লেখা প্রেমের শ্লোকগুলো বড়ো বেশি মনে পড়ে যায়।'

এই কথা বলে সে আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে কবিতার প্রতিটি লাইন এবং প্রতিটি শব্দকে সমালোচনা করে ব্যঙ্গবিদ্রূপে অস্থির করে তুলল আমাকে। শেষকালে আর সহ্য করতে না পেরে আমি তার হাত থেকে খাতাটা ছিনিয়ে নিলাম এবং বললাম যে আমি আর কক্ষনো তাকে আমার কোনো রচনা দেখাব না। আমার এই শাসানি শুনে শ্‌ভাব্রিন

হাসতে লাগল। বলল, 'দেখা যাক, তুমি কথা রাখো কিনা। ইভান কুজমিচের যেমন খাওয়ার আগে দ্‌-এক গ্লাস ভদ্‌কা চাই-ই চাই, তেমনি কবিরও চাই একজন শ্রোতা। আর এই মাশাটি কে শ্‌নি? যার জন্যে তোমার এমন পেলব আবেগ আর এমন প্রেমের যন্ত্রণা? মারিয়া ইভানভনা না কি?'

ভুর্‌ পাকিয়ে আমি জবাব দিলাম, 'যে-ই হোক না কেন তাতে তোমার কী? তোমার মতামতও আমি শ্‌নতে চাই না, তোমার অন্‌মান বা আন্দাজ দিয়েও আমার কোনো কাজ নেই।'

'ওরে বাবা রে! এ যে দেখছি একাধারে অভিমানী কবি ও বিনয়ী প্রেমিক!' শ্‌ভাব্রিন বলে চলল, আর ওর কথা শ্‌নে ক্রমেই সপ্তমে চড়তে লাগল আমার মেজাজ — 'বন্ধ্‌ভাবে তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো — যদি সফল হতে চাও তা হলে আমার উপদেশ হচ্ছে এই যে শ্‌ধ্‌ কথার মালা গেঁথেই চুপ করে থেকো না।'

'হ্‌জ্‌র কি বলতে চান, দয়া করে, একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন কি!'

'সাগ্রহে! মানে, — যদি তোমার ইচ্ছে থাকে যে মাশা মিরোনভা গোধ্‌লিবেলায় তোমার ঘরে গিয়ে হাজির হবে তা হলে শ্‌ধ্‌ কোমল কবিতার বদলে একজোড়া দ্‌ল দিলেই হয়।'

আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে উঠল।

মনের জ্‌বালাটা বহ্‌কষ্টে চেপে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাশা মিরোনভা সম্পর্কে কেন তোমার এমন ধারণা?'

পৈশাচিক শ্লেষের সঙ্গে সে জবাব দিল, 'কারণ মেয়েটির স্বভাবচরিত্র যে কী রকম তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি।'

ফ্‌ঁসে উঠে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'সব মিথ্যে কথা, শয়তান! বেহায়ার মতো তুমি মিথ্যে বলছ!'

শ্‌ভাব্রিনের ম্‌খের ভাব বদলে গেল।

আমার হাতটা জোরে চেপে ধরে বলল সে, 'এটি চলবে না। দ্বন্দ্বয্‌দ্ধে এর ফয়সালা হবে।'

'বেশ! যখন তোমার মর্জি।' খ্‌শি হয়ে আমি জবাব দিলাম; তখন আমি ওকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে তৈরি।

তক্ষুনি আমি বেরিয়ে পড়লাম ইভান ইগ্নাতিচকে খুঁজে বার করবারে জন্যে। গিয়ে দেখলাম সে একটা সূঁচ নিয়ে বসেছে। অধিনায়ক-পত্নীর হুকুমে ব্যাঙের ছাতা শুকিয়ে শীতকালের জন্যে মজুদ রাখার জন্যে সুতোয় গেঁথে রাখছে। আমাকে দেখে সে বলল, 'আরে পিওতর আন্দ্রেইচ, যে আসুন, আসুন! আমার কী সৌভাগ্য! তা আপনার শুভাগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারি কি?' আমি সংক্ষেপে তাকে বুঝিয়ে বললাম যে আমি আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে ঝগড়া করেছি এবং আমার ইচ্ছে যে ইভান ইগ্নাতিচ ডুয়েলে আমার দোসর হয়। তার একচোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করে, মন দিয়ে আমার কথা শুনে সে বলল, 'আপনি আলেক্সেই ইভানভিচের শরীরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে চান এবং আপনার ইচ্ছে যে আমি এ ব্যাপারে সাক্ষী থাকি — এই তো? জিজ্ঞেস করছি বলে মাপ করবেন।'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'মাপ করবেন পিওতর আন্দ্রেইচ, কী বাধিয়েছেন বলুন তো? আলেক্সেই ইভানভিচের সঙ্গে আপনি ঝগড়া করেছেন? — কী বিপদ! তারপর মুখের কথায় যতই ঝগড়া করুন না কেন তাতে শরীরের হাড়গোড় ভাঙে না। সে আপনাকে গালাগালি দিল, আপনিও দুই কথা শুনিয়ে দিন, সে ঘুসি মারল আপনার মুখে, আপনিও ঝেড়ে দিন তার কানে। দুবার, তিনবার, বাস্। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক। আমরা মিটমাট করে দেব আপনাদের মধ্যে। পাশাপাশি যার সঙ্গে থাকতে হবে তাকে তলোয়ারে বেঁধা কি ভালো? অবশ্য আপনি যদি তাকে যমালয়ে পাঠাতে পারেন তা হলে ভালোই। আলেক্সেই ইভানভিচ লোকটাকে আমার কোনোদিনই ভালো লাগে নি, কিন্তু ব্যাপারটা যদি উল্টে যায়? অর্থাৎ তার তলোয়ার যদি আপনাকেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে? তা হলে কি হবে? তা হলে কে বোকা বনবে, জিজ্ঞেস করছি বলে বেয়াদপি মাফ করবেন।'

এই সুবিবেচক লেফ্টেনাণ্টের যুক্তি আমাকে নাড়া দিতে পারল না। নিজের সংকল্পেই অটল রইলাম। ইভান ইগ্নাতিচ বলল, 'যেমন আপনার অভিরুচি। যা ভালো মনে হয় করবেন। কিন্তু আমাকে কেন সাক্ষী থাকতে হবে? কী সুবাদে? লোকে মারামারি করে, জিজ্ঞেস করি,

সেটা আর দেখবার মতো কী? ভগবানের কৃপায় তুর্কী আর সুইড্‌দের বিরুদ্ধে লড়েছি। সব দেখেছি আমি।'

আমি তাকে যথাসাধ্য বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলাম, দ্বন্দ্বযুদ্ধে দোসরের কর্তব্য কী। কিন্তু ইভান ইগ্‌নাতিচ আমার কথার কোনো রকম অর্থ করতে পেরেছে বলে মনে হল না। বলল, 'যেমন আপনার অভিরুচি। কিন্তু আমাকে যদি এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তেই হয় তা হলে আমি কর্তব্যবোধে ইভান কুজমিচের কাছে গিয়ে বলব যে কেল্লার মধ্যে একটি দুষ্কার্যের মতলব আঁটা হয়েছে। সেটা রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়াই কি হুজুর কমান্ডারের উচিত হবে না...'

ভয় পেয়ে গেলাম, ইভান ইগ্‌নাতিচ যাতে অধিনায়কের কানে কিছু না তোলে সে জন্যে আমি অনুনয়-বিনয় করতে লাগলাম। ওকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমাকে কথা দিল এবং আমিও ঠিক করলাম যে তাকে নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করব না।

সন্ধ্যাটা যথারীতি কাটালাম অধিনায়কের বাড়িতে। যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহ না হয় বা কারো কাছ থেকে কোনো রকম বিরক্তিকর প্রশ্ন না ওঠে সে জন্যে আমি চেষ্টা করলাম ফুর্তি বজায় রাখতে, এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলতে যাতে মনে হবে যে আমার মধ্যে কোনো উদ্বেগ নেই। কিন্তু আমার মতো অবস্থায় পড়লে প্রায় সকলেই যে নির্বিকার ভাবের বড়াই করে, — সেটা আমার যে ছিল না তা কবুল করছি। সন্ধ্যায় আমার মনটা ছিল কোমলতা আর মমতার সুরে বাঁধা। মারিয়া ইভানভনাকে সেদিন আমার ভালো লেগেছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। হয়ত এই ওর সঙ্গে শেষ দেখা, এই ভেবে ভারি মর্মস্পর্শী লেগেছিল ওকে। শ্‌ভাব্রিনও উপস্থিত ছিল সেখানে। আমি তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেলাম এবং ইভান ইগ্‌নাতিচের সঙ্গে আমার যা কথাবার্তা হয়েছে তা বললাম তাকে। নিস্পৃহ গলায় সে বলল, 'আমাদের আবার দোসরের কী দরকার? দোসর ছাড়াই আমরা কাজ চালিয়ে নিতে পারব।' দুজনে ঠিক করলাম যে আমাদের লড়াই হবে কেল্লার অনতিদূরে খড়ের গাদার পিছনে। পরদিন সকালে ছটার পরে আমরা সেখানে হাজির হব। আমাদের দেখে মনে

হয়েছিল যেন আমরা খুবই অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করছি। তাতে ইভান ইগ্‌নাতিচ তো মনের আনন্দে আসল কথাটাই ফাঁস করে ফেলল। খুশি হয়ে সে আমায় বললে, 'ঠিক আছে! ভালো ঝগড়ার চেয়ে খারাপ শান্তিও ভালো, মান কমলেও প্রাণ তো রইল।'

অধিনায়ক-পত্নী ঘরের এক কোণে তাসের সাহায্যে ভাগ্যগণনা করছিলেন। বললেন, 'কি, কি বললে ইভান ইগ্‌নাতিচ, আমি ঠিক শুনতে পাই নি।'

আমার মুখে অসন্তোষের চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে নিজের প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল ইভান ইগ্‌নাতিচের। ভেবে পাচ্ছে না কী জবাব দেবে। শ্‌ভাব্রিন বাঁচাল তাকে। বলল:

'আমাদের মধ্যে আবার বন্ধুত্ব হতে দেখে ইভান ইগ্‌নাতিচ খুশি হয়েছেন।'

'তুমি আবার ঝগড়া করতে গেলে কার সঙ্গে শুনি?'

'পিওতর আন্দ্রেইচ আর আমার মধ্যে ভীষণ রকমের মন কষাকষি হয়েছিল।'

'কি নিয়ে?'

'একেবারে বাজে ব্যাপার, একটা গান নিয়ে, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা।'

'ভালো কাণ্ড, গান নিয়ে আবার ঝগড়া? কি হয়েছিল শুনি?'

'মানে, পিওতর আন্দ্রেইচ একটা গান লিখেছিল। গানটা সে আমাকে গেয়ে শোনায়। আমিও আমার পেয়ারের কলিটা গেয়ে উঠি:

ক্যাপটেনের মেয়ে ঘরেই থাকো,
নিশুতি রাতে বেড়াতে যেও নাকো।*

দাঁড়াল মনান্তর। পিওতর আন্দ্রেইচ তো ক্ষেপে ওঠে আর কি। তবে পরে ভেবে দেখল যে খুশিমতো গান গাইবার অধিকার সবারই আছে। ব্যাপারটা আর বেশিদূর গড়ায় না।'

শ্‌ভাব্রিনের এই বেহায়াপনায় আমি তো রেগে আগুন। কিন্তু ওর কথার অভদ্র ইঙ্গিতটুকু আমি ছাড়া আর কেউ ধরতে পারে নি। অন্তত তা নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামালে না। গান থেকে কবিদের কথা এসে

গেল। অধিনায়ক মন্তব্য করলেন যে কবিরা সবাই লম্পট আর পাঁড় মাতাল। আমাকে তিনি বন্ধ্‌জনোচিত উপদেশ দিলেন যে কবিতা-টবিতা লেখা ছেড়ে দেওয়াই উচিত। সৈন্য-জীবনের সঙ্গে কবিতা-লেখাটা খাপ খায় না। আর কবিতা লিখে কারো যে বিশেষ উপকার হয় তাও নয়।

যেখানে শ্ভাব্রিন আছে সেখানে বসে থাকতেও আমার অসহ্য লাগছিল। একটু পরেই ক্যাপটেন ও তাঁর বাড়ির সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমি। ঘরে এসে তলোয়ারটা পরীক্ষা করলাম, তার ডগাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে সাভেলিচকে বলে রাখলাম যেন সে আমাকে ছ'টার একটু পরেই উঠিয়ে দেয়। তারপর শ্‌য়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে খড়ের গাদার পিছনটিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সে এসেই আমাকে বলল, 'আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি। তাড়াতাড়ি করা দরকার।' সঙ্গে সঙ্গে উর্দি খ্‌লে রেখে শ্‌ধ্‌ অন্তর্বাসেই দাঁড়ালাম তলোয়ার বাগিয়ে। হঠাৎ খড়ের গাদার পিছন থেকে চার-পাঁচজন পঙ্গ্‌সমেত আবির্ভূত হল ইভান ইগ্‌নাতিচ। আমাদের জানাল যে আমাদের দ্‌জনকেই অধিনায়কের কাছে যেতে হবে। বিরক্তচিত্তে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। সৈন্যরা আমাদের ঘিরে রইল আর ইভান ইগ্‌নাতিচের পিছনে পিছনে আমরা রওনা হলাম কেল্লার দিকে। বিজয়গর্বে ব্‌ক ফুলিয়ে আগে চলতে লাগল ইভান ইগ্‌নাতিচ।

সদলে আমরা এসে ঢুকলাম অধিনায়কের বাড়িতে। দরজা খ্‌লে ইভান ইগ্‌নাতিচ গ্‌র্‌গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল, 'নিয়ে এসেছি!' ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না বেরিয়ে এলেন। 'আচ্ছা তোমাদের কী কান্ড বলো তো? কি হচ্ছে এ সব? আমাদের এই কেল্লার মধ্যেই কিনা খ্‌নোখ্‌নির মতলব! ইভান কুজমিচ, এক্ষ্‌নি ওদের দ্‌জনকে গ্রেপ্তার করো! পিওতর আন্দ্রেইচ, আলেক্সেই ইভানভিচ, তোমাদের তলোয়ার দিয়ে দাও। এক্ষ্‌নি, এই ম্‌হ্‌র্তে! পালাশা, এই তলোয়ারদ্‌টো নিয়ে কুঠরিতে বন্ধ করে রাখ্ তো। পিওতর আন্দ্রেইচ, তোমার কাছ থেকে এমন ব্যাপার আমি কক্ষনো আশা করি নি। লজ্জা হয় না তোমার? আলেক্সেই ইভানভিচের কথা আলাদা — ওকে তো মান্‌ষ খ্‌নের অপরাধেই

ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভ (১৭৪৪-১৭৭৫) — ১৭৭০-এর দশকের কৃষক বিপ্লবের নেতা। এনগ্রেভিঙ। ১৮৩৪

দ্বিতীয় ক্যাথারিন (১৭২৯-১৭৯৬) — রুশ সম্রাজ্ঞী, সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৬৯ সালে। অঙ্কিত ছবি থেকে এনগ্রেভিঙ।

রক্ষী বাহিনী থেকে এখানে বদলি করেছে, ভগবানে বিশ্বাস নেই ওর। কিন্তু তুমি, তুমি! তুমি করতে চাইছ কি?'

স্ত্রীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হয়ে ইভান কুজমিচ বলতে লাগলেন, 'শুনছ তো, ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না ঠিক কথা বলেছেন! ফৌজী আইন-কানুনে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে যে ডুয়েল লড়া চলবে না।' ইতিমধ্যে আমাদের তলোয়ারদুটো পালাশা কুঠরিতে নিয়ে গেছে। আমি না হেসে থাকতে পারলাম না। শ্ভাব্রিন নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নাকে উদ্দেশ করে ভাবলেশহীন গলায় বলতে লাগল সে, 'আপনার প্রতি আমার সমস্ত সম্মান সত্ত্বেও না বলে পারছি না যে আপনি খামোকাই ব্যস্ত হচ্ছেন, আপনার আদালতে সোপর্দ করছেন আমাদের। এটা ইভান কুজমিচের ব্যাপার, তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো।' অধিনায়ক-পত্নী ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'কি বলছ বাপু? স্বামী-স্ত্রী কি একপ্রাণ, একদেহ নয়? ইভান কুজমিচ! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাই তুলছ কেন? ওদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে আলাদা আলাদা ঘরে আটক করে রাখো। যতদিন মাথা থেকে শয়তান না নামে ততদিন জল আর রুটি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না। তারপর পাদ্রি গেরাসিম আসুক, এসে ওদের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়ে যাক — ভগবানের কাছে মাথা কুটে ক্ষমা চাক দুজনে, তারপর দশজনের সামনে নিজেদের পাপের জন্যে অনুতাপ করুক।'

ইভান কুজমিচ ভেবে পাচ্ছিলেন না কি করা যায়। মারিয়া ইভানভনা একেবারে বিবর্ণ। তারপর আস্তে আস্তে ঝড় কেটে গেল। অধিনায়ক-পত্নী শান্ত হলেন এবং পরস্পরকে চুমু খাইয়ে মিটমাট করিয়ে দিলেন আমাদের মধ্যে। আমাদের তলোয়ারদুটো ফিরিয়ে নিয়ে এল পালাশা। দুজনে যখন বেরিয়ে এলাম তখন বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যে আমাদের দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এল ইভান ইগ্নাতিচ। রাগত স্বরে আমি তাকে বললাম, 'আপনার লজ্জা হয় না? আপনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে কারো কাছে কিছু প্রকাশ করবেন না, কিন্তু শেষকালে কিনা অধিনায়কের কাছেই আমাদের নামে লাগিয়েছেন!' সে বলল, 'মাথার ওপরে ঈশ্বর আছেন, তিনিই বিচার

করবেন। ইভান কুজমিচকে আমি কোনো কথাই বলি নি। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে জেনে নিয়েছেন। অধিনায়ককে কোনো কিছু না জানিয়ে তিনিই সমস্ত বন্দোবস্ত করেছেন। তবে যা হয়েছে ভালোই হয়েছে — ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' এই কথা বলে সে বাড়ির দিকে চলে গেল। শ্ভাব্রিন আর আমি একা। বললাম, 'আমাদের ব্যাপারটার এইভাবে নিষ্পত্তি হতে পারে না।' শ্ভাব্রিন জবাব দিল, 'কক্ষনো নয়। আপনার স্পর্ধার জবাব আপনাকে দিতে হবে রক্ত দিয়ে। কিন্তু খুব সম্ভব আমাদের ওপর নজর রাখা হবে। ভান করে চলতে হবে দিনকয়েক। আচ্ছা চলি।' যেন কিছুই হয় নি এমনি ভাব করে তারপর আমরা যে যার পথে রওনা হলাম।

অধিনায়কের বাড়িতে ফিরে এসে রোজকার মতো মারিয়া ইভানভ্নার পাশে বসলাম আমি। ইভান কুজমিচ বাড়িতে নেই, ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত। চাপা স্বরে কথা বললাম আমরা। আমি শ্ভাব্রিনের সঙ্গে ঝগড়া করেছি শুনে ওদের সবাইকে কী উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হয়েছে সে কথা বলে মারিয়া ইভানভনা কোমল স্বরে ভর্ৎসনা করল আমাকে। বলল, 'যখন শুনলাম যে আপনারা তলোয়ার নিয়ে লড়াই করবার মতলব এঁটেছেন, আমি তো মূর্ছা যাই আর কি। পুরুষমানুষরা সত্যিই অদ্ভুত! সামান্য একটা মুখের কথা, যা এক সপ্তাহ পরে আর হয়ত মনেও থাকে না, তার জন্যেই তারা খুনোখুনি করে! এতে তারা যে শুধু নিজেরা প্রাণ খোয়ায় তা নয়, সেই সঙ্গে খুইয়ে বসে নিজেদের বিবেক এবং সেই সব লোকের মঙ্গল যারা... কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে ঝগড়াটা আপনি শুরু করেন নি। দোষ নিশ্চয়ই আলেক্সেই ইভানভিচের।'

'মারিয়া ইভানভনা, এ কথা কেন বলছেন?'

'এমনি... লোকটার সব কথাতেই খোঁচা। আলেক্সেই ইভানভিচকে আমার ভালো লাগে না মোটে, দুচক্ষে দেখতে পারি না, তা হলেও আমাকেও ওর তেমনি খারাপ লাগুক এটা কিছুতেই চাই না। ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করব আমি।'

'আচ্ছা কী মনে হয় আপনার, মারিয়া ইভানভনা, আপনাকে কি ওর ভালো লাগে?'

মারিয়া ইভানভনা থতমত খেয়ে লাল হয়ে উঠল। বলল:

'আমার মনে হয়, আমার ধারণা, ভালোই লাগে।'

'কেন, এ কথা মনে হচ্ছে আপনার?'

'কারণ ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।'

'বিয়ে করতে চেয়েছিল! আপনাকে ও চেয়েছিল বিয়ে করতে? কবে?'

'গত বছরে। আপনার এখানে আসার মাস দু-এক আগে।'

'রাজি হলেন না?'

'দেখতেই তো পাচ্ছেন। আলেক্সেই ইভানভিচ যে খুব বুদ্ধিমান লোক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বংশ ভালো, বিষয়-সম্পত্তিও আছে। কিন্তু যখনই আমি ভাবি যে বিয়ে করতে হলে এই লোকটির সঙ্গে আমাকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে বেদীর সামনে আর সকলের চোখের ওপর তাকে চুমু খেতে হবে... না, না, তা আমি কক্ষনো পারব না, প্রাণ গেলেও না!'

মারিয়া ইভানভ্নার কথা শুনে আমার চোখ খুলে গেল এবং অনেক কিছুই আমি এবার বুঝতে পারলাম। ওর কথা উঠলে শ্ভাব্রিন কেন যে ওর নামে খারাপ ছাড়া ভালো কক্ষনো বলে না তা এতক্ষণে পরিষ্কার হল আমার কাছে। আমাদের দুজনের পরস্পরের প্রতি মনোভাব কী, তা সে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে, আর অনবরত চেষ্টা করেছে যাতে আমাদের দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। যে কথাগুলোকে উপলক্ষ করে আমরা ঝগড়া করেছি সেগুলো এখন আমার কাছে আরো অভদ্র বলে মনে হতে লাগল। কথাগুলোর মধ্যে শুধু যে কুৎসিত অশ্লীলতা আছে তা নয়, ইচ্ছাকৃত কুৎসারটনাও আছে। উদ্ধত এই বৃশ্চিকটিকে শাস্তি দেবার ইচ্ছাটা আমার আরো প্রবল হয়ে উঠল। অধৈর্য হয়ে আমি সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

বেশি অপেক্ষা করতে হল না। ঠিক পরের দিনই শ্ভাব্রিন এসে টোকা দিল আমার ঘরের জানলায়। আমি তখন একটা শোকগাথা নিয়ে বসেছি, ছন্দ আর মিলের অপেক্ষায় কলমটাকে কামড়াচ্ছি; টোকা শুনে কলমটা রেখে তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তার কাছে। শ্ভাব্রিন

আমাকে বলল, 'ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখে লাভ কী? এখন আমাদের ওপর কারো নজর নেই। চল, নদীর ধারে যাই। সেখানে কেউ আমাদের বাধা দিতে আসবে না।' আমরা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লাম। খাড়াই হাঁটাপথ ধরে নেমে এলাম একেবারে নদীর ধারে। তারপর তলোয়ার কোষমুক্ত করলাম। তলোয়ার-চালনায় শ্ভাব্রিন আমার চেয়ে পটু, কিন্তু সাহস আর শরীরের ক্ষমতা আমার বেশি। মসিয়ে বোপ্রে একসময়ে সৈন্য বাহিনীতে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেই তলোয়ার-চালনা আমি কিছুটা শিখেছিলাম। সেই শিক্ষা এবার কাজে লাগল। শ্ভাব্রিন আশা করে নি যে আমি এমন বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী হব। বহুক্ষণ আমরা কেউ কাউকে ঘা দিতে পারলাম না। শেষকালে যখন বুঝতে পারলাম যে শ্ভাব্রিন ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে তখন আমি নতুন উদ্যমে তাকে আক্রমণ করলাম। তাকে জলের মধ্যে প্রায় ঠেসে ধরেছি এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, কে যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে ডাকছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখলাম — সাভেলিচ। পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে সে আমার দিকে আসছে... আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ডান কাঁধের নিচে বুকে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা লাগল। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রেম

কন্যে, ওগো কন্যে!
ক'রো না তাড়া এখনই বিয়ের জন্যে;
শুধাও তোমার বাপকে, তোমার মাকে,
শুধাও মাকে, বাপকে, আপন জনকে;
হোক না আগে বুদ্ধি, কিছু শুদ্ধি,
বুদ্ধিশুদ্ধি হোক-না আগে কন্যে।

লোকসঙ্গীত।

আমার চেয়ে সরেস পেলে আমায় যাবে ভুলে;
আমার চেয়ে নিরেশ পেলে রাখবে মনে তুলে।

লোকসঙ্গীত।

জ্ঞান ফিরে আসার পর কিছুক্ষণ কোনো ঘটনাই আমার মনে পড়ল না, বুঝে পেলাম না কী আমার ঘটেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি আমি, আর ভয়ানক দুর্বলতা বোধ করছি। একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে সাভেলিচ দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। আমার বুক আর কাঁধের চারপাশে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কে যেন সন্তর্পণে সেই ব্যাণ্ডেজ খুলছে। তারপর আস্তে আস্তে আমার চিন্তার স্বচ্ছতা ফিরে এল। মনে পড়ল ডুয়েল লড়ার কথা। অনুমান করে নিলাম যে আমি আহত হয়েছি। ঠিক সেই সময়ে দরজা খোলার কিচকিচ শব্দ শোনা গেল, তারপরেই একটা চাপা গলার স্বর: 'কেমন আছে এখন?' আর সেই গলার স্বর শুনে একটা কাঁপুনি বয়ে গেল আমার সারা শরীরে। 'আগের মতোই, তেমনি অজ্ঞান হয়ে আছে। আজ নিয়ে পাঁচদিন হল।' দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে জবাব দিল সাভেলিচ। আমি পাশ ফিরতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। 'আমি কোথায়? কে এখানে?' প্রাণপণ চেষ্টা করে কথাগুলো বললাম আমি। মারিয়া ইভানভ্না বিছানার কাছে সরে এসে আমার ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কেমন বোধ হচ্ছে?' দুর্বল স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আপনি — মারিয়া ইভানভনা নাকি? আচ্ছা বলুন তো...' কথাটা শেষ করবার মতো ক্ষমতা ছিল না, চুপ করে গেলাম। চিৎকার করে উঠল সাভেলিচ। সারা মুখে আনন্দ ফেটে পড়ছে। বারবার বলছে, 'জ্ঞান ফিরে এসেছে! জ্ঞান ফিরে এসেছে! হে ঠাকুর, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! দাদাবাবু, ইস্, কী ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছিলে! পাঁচ-পাঁচটা দিন — সোজা কথা!..' সাভেলিচকে থামিয়ে দিয়ে মারিয়া ইভানভনা বলল, 'এখন আর বেশি কথা বলো না সাভেলিচ। উনি এখনো খুব দুর্বল।' এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমার চিন্তার রাজ্যে তখন ঝড় উঠেছে। তা হলে আমি আছি অধিনায়কের বাড়িতে, মারিয়া ইভানভনা এসেছিল আমাকে দেখতে। সাভেলিচকে আমি দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে কানে ছিপি এঁটে মাথা নেড়ে দিল। বিরক্ত হয়ে আমি চোখ বন্ধ করলাম আর তারপরেই গভীর ঘুম এসে বিস্মৃতির অতলে নিয়ে গেল আমাকে।

ঘুম থেকে জেগে উঠে আমি সাভেলিচকে ডাকলাম। কিন্তু তার বদলে সামনে দেখলাম মারিয়া ইভানভনাকে। স্বর্গের দেবীর মতো মিষ্টি স্বরে আমাকে সে অভিবাদন জানালে। ঠিক সেই মুহূর্তে যে গভীর আবেগ আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল তার মাধুর্য ভাষায় প্রকাশের ক্ষমতা আমার নেই; আমি ওর হাতটা নিয়ে আবেগের আতিশয্যে চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম। মাশা হাত সরিয়ে নিল না... আর তারপরই হঠাৎ ওর ঠোঁটের ছোঁয়া লাগল আমার গালে; অনুভব করলাম তার তপ্ত, তাজা চুম্বন। আমার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে আগুন বয়ে গেল যেন। আমি ওকে বললাম, 'মারিয়া ইভানভনা, লক্ষ্মীটি, আমার বৌ হয়ে আমার সারা জীবনকে সুখে ভরিয়ে তোলো!' এবার ওর সম্বিৎ ফিরে এসেছে, হাতটা টেনে নিয়ে ও বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, একটু শান্ত হন। আপনার ফাঁড়া

এখনো কাটে নি, ক্ষতের মুখ খুলে যেতে পারে। আর কিছু না হোক, অন্তত আমার কথা ভেবেও নিজের দিকে দৃষ্টি দিন!' এই কথা বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আর উদ্বেল আনন্দে ভাসতে লাগলাম আমি। এই সুখে পুনর্জন্ম হল আমার। ও আমার হবে! ও আমাকে ভালোবাসে! আমার সমগ্র সত্তা ভরে গেল এই চিন্তায়।

তারপর থেকে আমি যেন দণ্ডে দণ্ডে সেরে উঠি। আমাকে চিকিৎসা করেছে ছাউনির নাপিত, অন্য কোনো চিকিৎসক এখানে নেই। আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে কোনো রকম কেরামতি দেখাবার চেষ্টা করে নি। তারুণ্য আর দেহটা আমার আরোগ্যলাভ দ্রুত করে। অধিনায়কের বাড়ির সবাই দেখাশোনা করেছে আমাকে। মারিয়া ইভানভনা প্রায় সর্বক্ষণ বসে থেকেছে আমার পাশটিতে। স্বাভাবিকভাবেই আবার প্রথম যেদিন সুযোগ পেলাম সেদিনই আগের বারের অসম্পূর্ণ প্রেম-নিবেদনের বাকিটুকু বলে নিতে চাইলাম আমি। এবার মারিয়া ইভানভনা অনেক বেশি ধৈর্য নিয়ে আমার কথা শুনল। আমার প্রতি ওর নিজের মনোভাব ব্যক্ত করল সহজভাবে। আমাকে জানাল যে ওকে সুখী হতে দেখে ওর বাপ-মারও খুব আনন্দ হবে। তারপর বলল, 'কিন্তু তুমি ভালো করে ভেবে দেখো। এমনও হতে পারে তো যে তোমার বাবা-মা মত দেবেন না?'

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। আমার মায়ের মনটা খুবই নরম, এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বাবার মেজাজ ও মতামত যতদূর জানি তাতে তিনি যে আমার এই প্রেমের কাহিনী শুনে বিশেষ বিচলিত হবেন তা মনে হয় না। তিনি সমস্ত ব্যাপারটাকেই তরুণ বয়সের খামখেয়োলি বলে মনে করবেন। এই সমস্ত কথা আমি মারিয়া ইভানভনার কাছে খোলাখুলি বললাম। তা সত্ত্বেও স্থির করলাম যে যতদূর সম্ভব কাকুতি-মিনতি করে বাবার কাছে একটা চিঠি লিখব এবং বাবার আশীর্বাদ চাইব। পরে চিঠিটা লিখে আমি মারিয়া ইভানভনাকে দেখালাম। চিঠিটা পড়ে ওর মনে হল যে চিঠির বক্তব্য জোরালো ও মর্মস্পর্শী হয়েছে এবং এই চিঠি পড়ার পরেও বাবার অমত হবে এ কথা বিশ্বাস করতে ওর মন চাইল না। তারপর থেকে যৌবন ও প্রেমের সমস্ত আস্থায় নিজেকে ও একেবারে সঁপে দিল নিজের কোমল হৃদয়বৃত্তির কাছে।

সেরে ওঠার পরই আমি শ্ভাব্রিনের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেললাম। ডুয়েল লড়ার জন্যে আমাকে ভর্ৎসনা করে ইভান কুজমিচ বলেছিলেন, 'ছি পিওতর আন্দ্রেইচ, তোমাকে গ্রেপ্তার করাই উচিত ছিল, তবে এমনিতেই তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। অবশ্য আলেক্সেই ইভানভিচকে পাহারায় রাখা হয়েছে রুটির গুদামে। তার তলোয়ারে তালাচাবি বন্ধ করে রেখেছেন ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা। একটু ভেবে দেখুক, অনুতাপ করুক।' আমার মনে তখন এত সুখ যে কারো অনিষ্ট কামনার স্থান ছিল না। শ্ভাব্রিনের পক্ষ নিয়ে আমি আর্জি করলাম। ভালোমানুষ অধিনায়ক স্ত্রীর মত করে নিয়ে শ্ভাব্রিনকে মুক্তি দিলেন। শ্ভাব্রিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমাদের মধ্যে যা কিছু ঘটে গেছে সে জন্যে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করে স্বীকার করল যে সবই তার দোষ এবং আমাকে অনুরোধ জানাল আমি যেন এ সব ঘটনা মনে না রাখি। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখাটা আমার স্বভাব নয়। সুতরাং আমি আন্তরিকভাবেই তাকে ক্ষমা করলাম। সে আমার প্রতি যে অন্যায় করেছে এবং যেভাবে সে আমাকে আহত করেছে — দুই অপরাধের জন্যেই ক্ষমা করলাম তাকে। ধরে নিলাম যে তার কুৎসারটনার কারণ তার অপমানিত আত্মমর্যাদা ও প্রত্যাখ্যাত প্রেমের জ্বালা, এবং খুব একটা দরাজ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে আমার এই হতভাগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করলাম।

তারপর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে সেরে উঠে ফিরে এসেছি নিজের কোয়ার্টারে। অধৈর্য হয়ে প্রতীক্ষা করছি চিঠির জবাবের জন্যে। আশা করবার মতো মনের জোর নেই, চেষ্টা করি মনের দুশ্চিন্তাকে চেপে রাখতে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না বা তার স্বামীর কাছে আমি এখনো নিজের মনোভাব প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমার প্রস্তাব শুনে তাঁদের অবাক হবার কথা নয়। মারিয়া ইভানভনা বা আমি — কেউ-ই তাঁদের কাছে আমাদের হৃদয়াবেগ গোপন করে রাখার চেষ্টা করি নি এবং তাঁদের মত যে পাওয়া যাবে সে বিষয়ে আমরা দুজনেই নিশ্চিন্ত।

অবশেষে একদিন সকালে হাতে চিঠি নিয়ে সাভেলিচ এসে হাজির। দুরুদুরু বুকে চিঠিটা নিয়ে নিলাম তার হাত থেকে। খামের ওপরে বাবার হাতে ঠিকানা লেখা। লক্ষণটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে

হল। কেননা সচরাচর মা-ই চিঠি লেখেন আমায়, আর চিঠির শেষে বাবা দু-এক লাইন যোগ করে দেন। খামের মোহর ভেঙে চিঠিটা বার করা হল না অনেকক্ষণ, বারবার করে পড়লাম ঠিকানার গুরুগম্ভীর কথাগুলো: 'ওরেনবুর্গ প্রদেশ, বেলোগর্স্ক কেল্লায়, আমার পুত্র, পিওতর আন্দ্রেয়েভিচ গ্রিনেভকে'। হাতের লেখা দেখে অনুমান করতে চেষ্টা করলাম, মনের কী অবস্থায় এই চিঠি লেখা হয়েছে। শেষকালে খামের মোহর ভেঙে বার করলাম চিঠিটা এবং প্রথম দু-একটা লাইন পড়েই পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেল যে আমাদের ব্যাপারটার এইখানেই ইতি। চিঠিতে যা লেখা ছিল তা হচ্ছে এই:

'পুত্র পিওতর! মিরোনভের কন্যা মারিয়া ইভানভনার সহিত তোমার বিবাহের প্রস্তাব তুলিয়া তুমি যে পত্র লিখিয়াছ তাহা গত ১৫-ই তারিখে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পত্রে তুমি তোমার এই বিবাহে পিতামাতার সম্মতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছ। তোমাকে জানাইতেছি যে তোমার এই বিবাহে সম্মতি বা আশীর্বাদ দিবার কোনো ইচ্ছাই আমার নাই। কেবল তাহাই নহে, অফিসার পদভুক্ত হইলেও তোমার এই শিশুসুলভ দুষ্টুমির জন্যে তোমার শাস্তিবিধান করাও কর্তব্য মনে করিতেছি। কেননা তুমি প্রমাণ করিয়াছ, যে তরবারি তোমাকে অর্পণ করা হইয়াছে দেশ রক্ষার জন্যে, তোমার মতো আরো সব অর্বাচীনের সঙ্গে ডুয়েল লড়িবার জন্যে নহে, তাহা ধারণ করিবার যোগ্যতা তোমার নাই। আন্দ্রেই কার্লোভিচের কাছে আমি অবিলম্বে পত্র লিখিতেছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিব, তোমাকে যেন বেলোগর্স্ক কেল্লা হইতে আরো দূরের এমন কোনো স্থানে পাঠানো হয় যেখানে তোমার মাথা হইতে ছাইভস্ম দূর হয়। তোমার ডুয়েল লড়ার কথা এবং আহত হওয়ার কথা শুনিয়া মনঃকষ্টে তোমার মা শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তোমাকে দিয়া কীই-বা হইবে? ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার সুমতি হয়, যদিও ঈশ্বরের মহতী কৃপার ভরসা করার সাহস আমার নাই।

তোমার পিতা আ. গ.'

চিঠি পড়ে নানান ভাবোদয় হল। পিতৃদেব আমার ওপরে অকাতরে যে সব কঠোর বাক্য বর্ষণ করেছেন তাতে অপমানিত বোধ করলাম প্রচন্ড। ম্যারিয়া ইভানভনার প্রসঙ্গে তিনি যে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন তাও সমান অশালীন ও অন্যায়। বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আমাকে অন্যত্র পাঠানো হতে পারে, এই চিন্তায় আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট হল মার অসুস্থতার খবর শুনে। সাভেলিচের ওপরে আমার ভারি রাগ হল, কারণ আমার বাবা-মা যে ওর কাছ থেকেই আমার ডুয়েল লড়ার খবর পেয়েছেন সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। ছোট্ট ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ ওর সামনে থেমে হিংস্র দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলাম, 'তোমার দৌলতেই যে আমি জখম হলাম, একমাস যমে-মানুষে টানাটানি চলল, দেখছি তোমার আশা মেটে নি, আমার মাকেও মেরে ফেলবার যোগাড় করেছ?' সাভেলিচ একেবারে আকাশ থেকে পড়ল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, 'দাদাবাবু, তুমি এ সব কি বলছ আমাকে? তুমি যে সেদিন চোট পেয়েছিলে তা কি আমারই জন্যে? ভগবান জানেন আমি সেদিন ছুটে যাচ্ছিলাম নিজের শরীর দিয়ে তোমাকে আড়াল করতে, যাতে আলেক্সেই ইভানভিচের তলোয়ার তোমাকে ছুঁতে না পারে। বুড়ো শরীর বাধ সাধল। তা ছাড়া কী ক্ষতি করলাম তোমার মা-জননীর?' বললাম, 'কী করলে তুমি? কে তোমাকে আমার সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলেছে? তুমি কি এসেছ আমার ওপরে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে?' 'আমি? আমি তোমার খবর চিঠিতে লিখেছি?' কাঁদতে কাঁদতে সাভেলিচ বলে ওঠে, 'হা ভগবান! দাদাবাবু, এই দেখো কর্তা আমাকে চিঠি দিয়েছেন। আমি তোমার খবর পাঠিয়েছি কিনা, তা এই চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবে।' এই বলে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করল। পড়লাম। চিঠিতে লেখা:

'শোন রে বুড়ো কুকুর, তোর উপর কড়া হুকুম ছিল যে আমার ছেলে পিওতর আন্দ্রেয়েভিচের সমস্ত খবর আমাকে দিতে হইবে। তাহা অমান্য করিতে তোর লজ্জা হয় না? আমার ছেলের অর্বাচীনতার খবর আমাকে কিনা শুনিতে হয় বাহিরের লোকের কাছে! এই কি মনিবের ইচ্ছা পূরণ

ও কর্তব্য পালন করিবার ধরন? শোন্ রে বুড়ো কুকুর, সত্য কথা তুই গোপন করিয়াছিস্, অপ্রাপ্তবয়স্ককে প্রশ্রয় দিয়াছিস্ — এ জন্যে তোকে আমি শুয়োরের পাল চরাইবার কাজে লাগাইব। আমার হুকুম, এই পত্র পাওয়া মাত্র অবিলম্বে আমাকে জানাইবি পিওতর কেমন আছে; শুনিয়াছি তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। আর আমাকে জানাইবি, শরীরের কোন্ স্থানে সে আঘাত পাইয়াছে এবং ঠিকমতো সেবাযত্ন হইতেছে কিনা।'

স্পষ্টই বোঝা গেল যে সাভেলিচের কোনো দোষ নেই। ওকে সন্দেহ করে এবং তিরস্কার করে অপমান করাটা ঠিক হয় নি। আমি ওর কাছে ক্ষমা চাইলাম কিন্তু বুড়ো তবুও শান্ত হয় না। বারবার সে বলতে লাগল, 'পোড়া কপাল আমার! যে মনিবদের জন্যে এত করি শেষকালে কিনা তার এই পুরস্কার! আমি হলাম বুড়ো কুকুর, আমাকে যেতে হবে শুয়োর চরাতে, আমার দোষেই তোমার জখম! না, দাদাবাবু, সমস্ত দোষ ওই হতভাগা মুসিয়ের, ওই লোকটাই তো তোমাকে শিখিয়েছে শিক দিয়ে খোঁচা দিতে আর মাটির ওপরে দাপাদাপি করতে! যেন খোঁচা দিলে আর পা দাপালেই বদ্ লোকের হাত থেকে বাঁচা যায়! ভারি দায় পড়েছিল ওই মুসিয়েকে অত টাকা-পয়সা খরচ করে আনার!'

কিন্তু আমার চালচলন সম্পর্কে সমস্ত খবর আমার বাবার কাছে পাঠাল কে? কার এত মাথাব্যথা? জেনারেল কি? কিন্তু তাঁকে দেখে মনেই হয় নি যে আমার সম্পর্কে তাঁর বিশেষ কোনো আগ্রহ আছে। আর সেই ডুয়েলের সংবাদ ওপরওলাদের কাছে পাঠান নি ইভান কুজমিচ, পাঠাবার কোনো প্রয়োজনই বোধ করেন নি তিনি। তা হলে কে হতে পারে? ভেবে ভেবে কোনো কূলকিনারা পেলাম না। শেষকালে আমার সন্দেহ গিয়ে পড়ল শ্ভাব্রিনের ওপর। এ ব্যাপারে একমাত্র তারই কিছুটা স্বার্থ আছে। এমন কোনো খবর যদি সে পাঠাতে পারে, যার ফলে এই কেল্লা থেকে আমাকে সরে যেতে হয় এবং অধিনায়কের পরিবারের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ হয় — তা হলে তারই লাভ। সমস্ত ঘটনা খুলে বলবার জন্যে মারিয়া ইভানভনার কাছে আমি গেলাম। ওর সঙ্গে আমার দেখা হল বাড়ির

অলিন্দে। আমার মুখের দিকে তাকিয়েই ও চেঁচিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে আপনার? এমন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছেন?' 'সব শেষ!' বলে আমি আমার বাবার চিঠিটা দিলাম ওর হাতে। এবার ফ্যাকাশে হবার পালা ওর। চিঠিটা আদ্যোপান্ত পড়ে কাঁপা কাঁপা হাতে ফিরিয়ে দিল আমাকে এবং কাঁপা গলায় বলল, 'দেখছেন তো, এটা হবার নয়... আপনার বাবা-মা চান না যে আমি আপনাদের পরিবারের লোক হই। ভগবানের যা ইচ্ছে তাই হবে! কিসে আমাদের মঙ্গল হবে তা আমাদের চেয়ে তিনিই ভালো জানেন। করবার কিছু নেই পিওতর আন্দ্রেইচ! অন্তত আপনি সুখী হোন...' ওর হাত চেপে ধরে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তা হবার নয়! তুমি আমায় ভালোবাসো, আমি সব কিছুর জন্যে তৈরি! এসো, আমরা দুজনে গিয়ে তোমার বাবা-মার পা জড়িয়ে ধরি। তাঁরা দুজনেই সাদাসিধে মানুষ, দেমাকে এখনো তাঁদের মন পাথর হয়ে ওঠে নি... তাঁদের আশীর্বাদ আমরা নিশ্চয়ই পাব। আমাদের বিয়ে হবে... আর তারপর কিছুদিন কাটলেই আমার বাবার রাগ পড়ে যাবে, আর আমার মা আছেন আমাদের পক্ষে, কাজেই বাবাকে আমরা নিশ্চয়ই শান্ত করতে পারব, বাবা আমাকে ক্ষমা করবেন...' মাশা জবাব দিল, 'না, পিওতর আন্দ্রেইচ, তা হয় না। তোমার বাবা-মার আশীর্বাদ না পেলে আমি তোমাকে বিয়ে করব না। তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তুমি কক্ষনো সুখী হতে পারবে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছেই মাথা নোয়াতে হবে আমাদের। অন্য একজনের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, অন্য একজনকে তুমি ভালবাসবে, এই যদি তোমার অদৃষ্ট হয়, তা হলে তাই হোক, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন, তোমাদের দুজনের জন্যেই আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।' এই পর্যন্ত বলে ও আর কান্না সামলাতে পারল না, তাড়াতাড়ি চলে গেল। একবার আমার ইচ্ছে হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ওকে ধরি। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, আমার নিজেরও এমন অবস্থা নয় যে আমার আবেগকে চেপে রাখতে পারি। তখন আমি বাড়ি চলে এলাম।

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে আমি ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম, এমন সময় সাভেলিচ এসে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন করে দিল। লেখায় ভর্তি একটা কাগজের টুকরো আমার হাতে দিয়ে বলল সে, 'দেখো দাদাবাবু, আমি

কান ভাঙানি দিয়েছি কিনা, বাপ আর ছেলেতে ঠোকাঠুকি লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি কিনা।' কাগজটা নিলাম তার হাত থেকে। সাভেলিচ যে চিঠি পেয়েছে এটা হচ্ছে তার জবাব। চিঠিটা আমি হুবহু তুলে দিচ্ছি:

'করুণাময় মনিব মাননীয় আন্দ্রেই পেত্রোভিচ বরাবরেষু!

আপনার মেহেরবান পত্র পাইয়াছি যাহাতে আপনি আমার উপর, আপনার নোকরের উপর রাগ করিয়া বলিয়াছেন যে মনিবের হুকুম আমি অমান্য করিয়াছি বলিয়া আমার লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু আমি বুড়ো কুকুর নহি, আমি আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য। মনিবের হুকুম অতি অবশ্যই আমি মানিয়া চলি। চিরকাল বিশ্বস্তভাবে আপনারই সেবা করিয়াছি। সেবা করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছি। পিওতর আন্দ্রেইচের আহত হইবার কথা আপনাকে লিখি নাই কারণ আমার ভয় ছিল যে সেই সংবাদ শুনিয়া আপনি অহেতুক আতঙ্কিত হইবেন। এক্ষণে শুনিলাম যে আমাদের গিন্নী-ঠাকুরানী আভ্‌দোতিয়া ভাসিলিয়েভ্‌না দুশ্চিন্তায় শয্যাশায়ী হইয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি নিরাময় হইয়া উঠুন। পিওতর আন্দ্রেইচ বুকে চোট পাইয়াছেন। ক্ষতস্থানটি ডান কাঁধের নিচে হাড়ের ঠিক তলায়। দেড় ইঞ্চি গভীর ক্ষত হইয়াছিল। নদীর পাড় হইতে আমরা তাঁহাকে অধিনায়কের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিলাম। সেখানেই তিনি ছিলেন। চিকিৎসা করিয়াছে স্তেপান পারামোনভ পরামানিক। এক্ষণে ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে দাদাবাবু আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন এবং বর্তমানে তাঁর সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই লিখিবার নাই। শুনিতে পাই উপরওলা অফিসাররা দাদাবাবুর কাজে সন্তুষ্ট। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না দাদাবাবুকে নিজের সন্তানের মতো দেখেন। আর দাদাবাবু যে এই গণ্ডগোলের মধ্যে পড়িয়া গেলেন, তা অল্পবয়সীর কসুর মাপ। চার-চারটি পা থাকা সত্ত্বেও ঘোড়াও তো মাঝে মাঝে হোঁচটা খায়। আপনি আমাকে শুয়োরের পাল তদারকের কাজে পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তাই হোক, হুজুরের যা মর্জি। আভূমি কুর্নিশ

আপনার বিশ্বস্ত বান্দা

আরখিপ সাভেলিয়েভ।'

ভালোমানুষ বৃদ্ধটির চিঠি পড়তে পড়তে আমি মাঝে মাঝে হাসি চেপে রাখতে পারি নি। আমার নিজের এমন অবস্থা যে আমার পক্ষে বাবার চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আর মার দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যে সাভেলিচের এই চিঠিই আমার মনে হল যথেষ্ট।

এই সময় থেকেই আমার অবস্থা বদলে গেছে। মারিয়া ইভানভনা আমার সঙ্গে কথা প্রায় বলেই না এবং যথাসম্ভব আমাকে এড়িয়ে চলে। অধিনায়কের বাড়িতে আমার আর কোনো আকর্ষণ থাকে না। ক্রমে বাড়িতে একা একা সময় কাটাতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠি। প্রথম প্রথম ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা আমাকে এ জন্যে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে বিচলিত করতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। ইভান কুজমিচের সঙ্গে আমার দেখা হয় শুধু কাজের সময়ে। শ্ভাব্রিনের সঙ্গে দেখা করি কদাচিৎ, তাও অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। সেটা আরো এই কারণে যে আমার প্রতি ওর একটা প্রচ্ছন্ন অপছন্দ লক্ষ্য করেছি। ফলে আমার সন্দেহটা আরো বদ্ধমূল হয়। জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে আমার কাছে। একটা বিষণ্ণ ভাবনার ঘোরে থাকি আমি; একাকীত্ব ও কর্মহীনতার ফলে তা আরো জোরালো হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ জীবনে আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠল আমার প্রেম এবং ক্রমাগত তা পীড়াদায়ক ভার হতে থাকল। বই পড়ায় বা সাহিত্য রচনায় আমার সমস্ত আগ্রহ চলে গেল। মনের স্ফূর্তি গেল হারিয়ে। ভয় হল আমি পাগল হয়ে যাব, নয়ত জাহান্নমে যাব। আর তারপরেই ঘটে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা; আমার সমস্ত জীবনের ওপর এই ঘটনার ছাপ পড়ে। তাতে এক প্রচণ্ড এবং শুভময় নাড়া গেল আমার প্রাণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পুগাচেভের বিদ্রোহ

ওহে ছোকরারা, শোনো হে তোমরা
যে কথা শোনাব বুড়োরা আমরা।

গান।

যে অদ্ভুত ঘটনাবলি আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তার বর্ণনা শুরু করবার আগে ১৭৭৩ সালের শেষাশেষি ওরেনবুর্গ প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নেওয়া দরকার।

এই বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ অঞ্চলটি অসংখ্য অর্ধ-সভ্য জাতির বাসভূমি; একেবারে সাম্প্রতিক কালে তারা রুশ জারের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা অনবরত বিদ্রোহ করত, আইন আর নাগরিক জীবনের সঙ্গে কিছুতেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারত না, অপরিণামদর্শী ও নিষ্ঠুর স্বভাব ছিল তাদের। ফলে তাদের দমিয়ে রাখার জন্যে সরকারকে সব সময়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হত। এ জন্যে সুবিধাজনক সব জায়গায় কেল্লা খাড়া করা হয়েছিল। আর এই সব কেল্লার সৈন্যরা ছিল প্রধানত কসাক — যারা ইয়াইক নদীর ধারে বহুকাল ধরে বসবাস করে আসছে। কিন্তু ইয়াইক কসাকেরা কোথায় নিজেরাই এই সব অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখবে, তা না হয়ে কিছুদিন থেকে তারা নিজেরাই হয়ে উঠেছিল সরকারের পক্ষে দুশ্চিন্তা ও বিপদের কারণ। ১৭৭২ সালে তাদের প্রধান ঘাঁটিতেই বিক্ষোভ দেখা দেয়। সৈন্যদলকে ঠিকমতো কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসবার জন্যে লেফ্‌টেনান্ট-জেনারেল ট্রাউবেনবার্গ কতগুলি কড়াকড়ি নিয়ম-কানুনের প্রবর্তন করেছিলেন। এই ছিল কারণ। পরিণামে নৃশংসভাবে নিহত হন ট্রাউবেনবার্গ এবং পরিচালনা-ব্যবস্থায় খুশিমতো অদলবদল করা হয়। শেষকালে গুলি চালিয়ে এবং নিষ্ঠুর শাস্তি দিয়ে দমন করা হয় বিদ্রোহকে।

বেলোগর্স্ক কেল্লায় আমি এসে পৌঁছবার অল্প কিছুকাল আগে এই সব ঘটনা ঘটেছিল। এখন অবস্থা একেবারে শান্ত; অন্তত বাইরে থেকে তাই মনে হয়। ধূর্ত বিদ্রোহীদের তথাকথিত অনুশোচনাকে অত্যন্ত সহজেই আন্তরিক বলে বিশ্বাস করেছেন কর্তৃপক্ষ। আসলে কিন্তু বিদ্রোহীরা গোপন বিদ্বেষ পোষণ করছিল এবং নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার সুযোগ খুঁজছিল।

আমার কাহিনীতে আসা যাক।

একদিন সন্ধ্যেবেলা (১৭৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শুরুতে) আমি একা একা ঘরের মধ্যে বসে আছি। শুনছি হৈমন্তিক বাতাসের আর্তনাদ আর জানলা দিয়ে দেখছি টুকরো টুকরো মেঘের ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি — এমন সময়ে একজন আমাকে খবর দিল যে অধিনায়ক আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তক্ষুনি অধিনায়কের বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম যে শ্ভাব্রিন, ইভান ইগ্নাতিচ এবং কসাক সার্জেন্টটিও সেখানে উপস্থিত। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা বা মারিয়া ইভানভনা — দুজনের একজনও ঘরে নেই। দুশ্চিন্তাগ্রস্তভাবে অধিনায়ক আমাকে সম্ভাষণ জানালেন। তারপর তিনি দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসতে বললেন আমাদের সবাইকে। বসল না শুধু সার্জেন্ট, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল সে। পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে অধিনায়ক বললেন, 'অত্যন্ত জরুরী খবর। জেনারেল কী লিখেছেন শোনো।' এই বলে তিনি চশমা পরে নিচের এই চিঠিটা পড়লেন:

'বেলোগর্স্ক কেল্লার অধিনায়ক ক্যাপটেন মিরোনভ সমীপেষু।

গোপনীয়

আপনাকে এতদ্বারা জানাইতেছি যে, দন কসাক, বিরোধী সম্প্রদায়ভুক্ত ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে এবং নিজেকে প্রয়াত সম্রাট তৃতীয় পিওতরের নামে অভিহিত করিয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে। একটি দুর্বৃত্ত দল জুটাইয়া ইয়াইক অঞ্চলের

গ্রামে গ্রামে সে অসন্তোষ উদ্দীপিত করিয়াছে, কয়েকটি কেল্লা ধূলিসাৎ করিয়াছে, সর্বত্র লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাইয়াছে। অতএব ক্যাপটেন, আপনার প্রতি নির্দেশ এই, যদি আপনার অধীনস্থ কেল্লা আক্রান্ত হয় তবে উক্ত দুরাত্মা ও ভন্ডকে প্রতিরোধ করিবার জন্যে বা সম্ভব হইলে একেবারে নির্মূল করিবার জন্যে অবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।'

'যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন!' চশমাটা খুলে চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে অধিনায়ক কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করলেন, 'বলা যত সহজ, করা তত নয়! স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, দুর্বৃত্ত শক্তিশালী। আমাদের এখানে কসাকদের বাদ দিয়ে মাত্র একশ' ত্রিশ জন লোক। কসাকদের বাদ দিচ্ছি কারণ এ ব্যাপারে তাদের ওপর ভরসা করা চলে না। মাক্সিমিচ, তুমি কিছু মনে করো না, তোমাকে কিছু বলি নি।' (সার্জেণ্ট মুখ টিপে হাসল।) 'কিন্তু কথাটা কি জানো? অবস্থার ওপরে আমাদের আর এখন কোনো হাত নেই। প্রত্যেককে কর্তব্য-পালনে দৃষ্টান্তস্থানীয় হয়ে উঠতে হবে, ছাউনি-চৌকি আর রাত-পাহারা বসাতে হবে। আক্রমণ হলে কেল্লার দরজা বন্ধ করে দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হবে সৈন্যদের। আর মাক্সিমিচ, তোমার কাজ হবে, কসাকদের ওপরে ভালোভাবে নজর রাখা। কামানটা ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে। আর খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে ওটাকে। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এ সমস্ত খবর যেন গোপন থাকে, কেল্লার একটি লোকও যেন আগে থেকে কিছু টের না পায়।'

এই সমস্ত নির্দেশ জারি করে ইভান কুজমিচ আমাদের বিদায় দিলেন। শ্ভাব্রিন ও আমি একসঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। সদ্য-শোনা কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা দুজনে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারো?' সে জবাব দিল, 'ভগবান জানেন! দেখাই যাক কি হয়। এখনো পর্যন্ত ঘটনাটাকে ভয়ানক কিছু বলে মনে হচ্ছে না। অবশ্য যদি...' কথাটা শেষ না করেই অন্যমনস্কভাবে একটা ফরাসী সুর শিস দিয়ে বাজাতে বাজাতে গভীর কোনো চিন্তায় ডুবে গেল সে।

আমাদের সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও পুগাচেভের আবির্ভাবের খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা কেল্লায়। এদিকে স্ত্রীর প্রতি ইভান কুজমিচের যতই শ্রদ্ধা থাকুক না কেন, সামরিক প্রয়োজনের খাতিরে যে গোপন সংবাদ তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে তা তিনি পৃথিবী রসাতলে গেলেও স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতেন না। জেনারেলের চিঠি পেয়ে তিনি সুকৌশলে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনাকে তিনি বলেন যে পাদ্রি গেরাসিম ওরেনবুর্গ থেকে কী সব আশ্চর্য খবর পেয়েছেন এবং সেটা তিনি একান্ত গোপনে রেখেছেন। শুনেই তো ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা তক্ষুনি পাদ্রির বৌয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবার জন্যে তৈরি। ইভান কুজমিচ পরামর্শ দেন যে মাশাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত, নইলে মেয়েটাকে একেবারে একা একা বাড়িতে থাকতে হবে।

দুজনে বেরিয়ে যেতেই ইভান কুজমিচ হয়ে ওঠেন বাড়ির সর্বময় কর্তা। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ডেকে পাঠান। পালাশা যাতে আমাদের কোনো কথা শুনতে না পায় সে জন্যে পালাশাকে আটকে রাখেন ছোটো একটা কুঠরির মধ্যে।

ওদিকে ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা পাদ্রির বৌয়ের কাছ থেকে কোনো খবরই বার করতে পারেন নি। বাড়িতে ফিরে এসে তিনি টের পেলেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ইভান কুজমিচ সমর-পরিষদের সভা ডেকেছিলেন এবং সমর-পরিষদের সভা চলবার সময়ে পালাশা তালাবন্ধ অবস্থায় ছিল। বুঝতে পারলেন যে স্বামী তাঁকে বোকা বানিয়েছেন, তখন খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন স্বামীকে। এ ধরনের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন ইভান কুজমিচ। কৌতূহলী জীবনসঙ্গিনীর প্রশ্নে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে টপাটপ্ জবাব দিতে লাগলেন। বললেন, 'ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো গিন্নি, আমাদের এখানকার স্ত্রীলোকদের মাথায় হঠাৎ কী খেয়াল চেপেছে, তারা সবাই খড় দিয়ে উনুন ধরায়। হঠাৎ একটা বিপর্যয় কাণ্ড হয়ে যেতে পারে। কাজেই আমি কড়া আদেশ জারি করেছি যেন ভবিষ্যতে কেউ খড় দিয়ে উনুন না ধরায়। শুকনো ডালপালা বা ঝোপঝাড় ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা চলবে না।' অধিনায়ক-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'তাই যদি হয় তা হলে পালাশাকে আটকে রাখবার কী দরকার পড়েছিল?

আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত বেচারিকে কুঠরির মধ্যে বন্ধ থাকতে হয়েছিল কেন?' ইভান কুজমিচ এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। বিড়বিড় করে তিনি কী যেন বললেন, কিন্তু তার কোনো অর্থবোধ হল না। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্বামী আসল কথা চেপে রাখছেন। এও বুঝতে পারলেন যে স্বামীর কাছ থেকে আসল কথাটা কিছুতেই বার করা যাবে না। সুতরাং তিনি আর কোনো প্রশ্ন না করে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলোভ্‌না একেবারে আনকোরা একটা পদ্ধতিতে শসার আচার তৈরি করেছে, সেই কথা বলতে শুরু করলেন সবিস্তারে। কিন্তু সারা রাত তিনি ঘুমোতে পারলেন না। ভাবতে লাগলেন, কী এমন গুরুতর বিষয় থাকতে পারে যা তাঁর স্বামী জানেন অথচ কিছুতেই তাঁর কাছে প্রকাশ করবেন না! অনেক ভেবেও কোনো হদিস পেলেন না।

পরদিন সকালে গির্জা থেকে ফিরে আসবার পথে লক্ষ্য করলেন যে ইভান ইগ্‌নাতিচ কামান পরিষ্কার করছে। ছেঁড়া ন্যাকড়া, নুড়ি, কাঠের কুচি, হাড়ের টুকরো আর যত রাজ্যের আবর্জনা ছোটো ছেলেমেয়েরা ঢুকিয়ে দিয়েছিল, সেগুলোকে নল থেকে বার করছে ইভান ইগ্‌নাতিচ। অধিনায়ক-পত্নী মনে মনে চিন্তা করলেন, 'ব্যাপারটা কী? এ সব যুদ্ধের তোড়জোড় কেন আবার? কিরগিজরা দুর্গ আক্রমণ করতে পারে — তাই ভাবছে নাকি সবাই? কিন্তু এমন একটা তুচ্ছ খবর ইভান কুজমিচ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে তা কক্ষনো হতে পারে না!' খবরটা না জানা পর্যন্ত স্ত্রীসুলভ কৌতূহল তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। ইভান ইগ্‌নাতিচের কাছ থেকে গোপন খবরটা টেনে বার করতে হবে, এই স্থির সিদ্ধান্ত করে তিনি ইভান ইগ্‌নাতিচকে ডাকলেন।

হাকিম যেমন আসামীকে অসতর্ক করে দেবার জন্যে জেরা শুরু করেন মূল ব্যাপারটার সঙ্গে সম্পর্কহীন দু-একটা প্রশ্ন তুলে, তেমনি ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা প্রথমে তুললেন ঘরসংসারের দু-একটা কথা। তারপর একমুহূর্ত চুপ করে থেকে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললেন, 'হা, ভগবান! কী ভয়ানক খবর — এঁ্যা! কী যে হবে?'

ইভান ইগ্‌নাতিচ জবাব দিল, 'গিন্নি-মা, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ

নেই! ঈশ্বর করুণাময়। আমাদের সৈন্য প্রচুর, গোলাবারুদ যথেষ্ট। কামানটাকেও পরিষ্কার করে রাখলাম। পুগাচেভকে আমরা হটিয়ে দিতে পারব নিশ্চয়। প্রভুর দয়া হলে পটল তুলব না।'

'তা এই পুগাচেভটি কে?' ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা জিজ্ঞেস করলেন।

তখন ইভান ইগ্‌নাতিচের টনক নড়ল যে গোপন কথাটা ফাঁস করে ফেলেছে, জিভ কামড়াল সে। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনার চাপে বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল সমস্ত কথা। ভাসিলিসা ইয়েগোরভনা কথা দিলেন যে তিনি কাউকে বলবেন না।

নিজের প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করেছেন বলতে হবে। পাদ্‌রির বৌকে ছাড়া কারও কাছেই তিনি একটিও কথা বলেন নি। তাও এই জন্যে যে পাদ্‌রির বৌয়ের গোরুটা স্তেপে চরে বেড়াচ্ছে, কি জানি পাজির দল যদি গোরুটাকে লুট করে!

কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, সবাই পুগাচেভের কথা বলাবলি করছে। চারদিকে নানা রকম গুজব। কসাক সার্জেণ্টটিকে অধিনায়ক পাঠিয়েছিলেন আশেপাশের গাঁয়ে ও কেল্লাগুলিতে। চারদিককার হালচাল ভালো করে জেনে আসতে বলেছিলেন তাকে। দুদিনের মধ্যেই মাক্‌সিমিচ ফিরে এসে জানাল যে কেল্লা থেকে প্রায় ষাট ভার্স্ট দূরে স্তেপ প্রান্তরের মধ্যে সে প্রচুর শিবিরাগ্নি জ্বলতে দেখেছে আর বাশ্‌কিররা তাকে বলেছে যে বিরাট এক সৈন্যবাহিনী এগিয়ে আসছে। অবশ্য সে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না, কারণ আর বেশি দূর এগিয়ে যেতে সে সাহস পায় নি।

কেল্লার কসাকদের মধ্যে অস্বাভাবিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা গেল। রাস্তায় রাস্তায় তারা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে জটলা করে, কথা বলে চাপা স্বরে আর ড্র্যাগুন বা ছাউনি সৈন্য দেখলেই যে যেদিকে পারে সরে পড়ে। একদল চর ছাড়া হল তাদের মধ্যে। ইউলাই নামে একটি কালমিক খ্রীষ্টান হয়েছিল, সে অধিনায়ককে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ দেয়। ইউলাই বললে সার্জেণ্টের খবর একেবারে মিথ্যে; ফিরে এসে এই ধূর্ত কসাকটি নাকি নিজের সঙ্গীসাথীদের কাছে বলেছে সে নাকি বিদ্রোহীদের শিবিরে গিয়েছিল, এমন কি বিদ্রোহীনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্যও

হয়েছিল তার; বিদ্রোহীনেতা নাকি নিজের হাত তাকে চুম্বন করতে দিয়েছে এবং দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করেছে তার সঙ্গে। অধিনায়ক সঙ্গে সঙ্গে স্যার্জেণ্টকে আটক করলেন এবং ইউলাইকে নিযুক্ত করলেন তার জায়গায়। কসাকদের কাছে খবরটা গিয়ে যখন পৌঁছল তখন স্পষ্টই বোঝা গেল যে তারা খুশি হয় নি। নিজেদের অসন্তোষকে তারা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করল। অধিনায়কের নির্দেশপালক ইভান ইগ্নাতিচ নিজের কানে শুনে এল যে তারা বলছে, 'ওরে ছাউনির ইঁদুর! এরপরের বার তোর পালা।' সেই দিনই বন্দীকে জেরা করবার ইচ্ছে ছিল অধিনায়কের। কিন্তু দেখা গেল সার্জেণ্ট পালিয়ে গেছে পাহারাঘর থেকে। ওর দলের লোকেরাই যে ওকে পালাতে সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

তারপর একটি নতুন ঘটনা অধিনায়কের উৎকণ্ঠা আরো বাড়িয়ে তুলল। বিদ্রোহের ইস্তাহারসমেত ধরা পড়ল একজন বাশ্কির। অধিনায়ক স্থির করলেন যে কেল্লার অফিসারদের আবার তিনি ডেকে পাঠাবেন। তখন আবারে চেষ্টা করলেন ভালোমতো একটা অছিলায় ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নাকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু ইভান কুজমিচ মানুষটি অতি সোজাসুজি, সৎ লোক, আগের বারে যে উপায়টি প্রয়োগ করেছিলেন, তা ছাড়া আর কিছুই ভেবে পেলেন না।

'শুনছ গো, শহর থেকে খবর এসেছে পাদ্রি গেরাসিমের কাছে...' গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন তিনি। তাঁকে বাধা দিয়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না বললেন, 'থাক, হয়েছে, আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না। দেখছি, তোমার ইচ্ছে আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দিয়ে সমর-পরিষদের সভা ডাকা আর ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভ সম্বন্ধে আলোচনা করা। এবার আর অত সহজে আমাকে বোকা বানানো যাবে না।' চোখদুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে ইভান কুজমিচ বললেন, 'গিন্নি, দেখছি, তুমি সবই জেনে ফেলেছ। তা হলে ইচ্ছে হলে এখানেই থাকো। তোমার সামনেই আমরা আলোচনা করব।' ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না জবাব দিলেন, 'সেই ভালো গো। অপরের চোখে ধুলো দেওয়ার ব্যাপারটা তোমার ভালো আসেও না। এবার তা হলে অফিসারদের ডেকে পাঠাও।'

আমরা আবার জড়ো হলাম। স্ত্রীর সামনেই ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে

পড়লেন প্মগাচেভের ইস্তাহার। স্পষ্টই বোঝা গেল ইস্তাহার একজন অর্ধশিক্ষিত কসাকের লেখা। তাতে শয়তানটা তার এই অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে যে আমাদের এই কেল্লায় অবিলম্বে সে হানা দেবে, কসাকদের আর সৈন্যদের ডাক দিয়েছে তার দলে যোগ দিতে, অফিসারদের পরামর্শ দিয়েছে যে মৃত্যুর ভয় যদি থাকে তবে যেন তারা প্রতিরোধ না করে। আবেদনের ভাষা অমার্জিত বটে কিন্তু খুবই জোরালো, সাধারণ মানুষের মনের উপরে তাতে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবার কথা।

'বদমায়েশ!' অধিনায়ক-পত্নী মন্তব্য করলেন, 'ব্যাটার সাহস তো কম নয় যে আমাদের বলে পাঠায় যেন আমরা এক্ষুনি গিয়ে তার পায়ের কাছে নামিয়ে দিই আমাদের নিশান। কুত্তার বাচ্চা! জানে না যে চল্লিশ বছর ধরে আমরা পল্টনে আছি। চোখের ওপরে দেখতেও হয়েছে অনেককিছু। এমন কোনো অধিনায়ক নিশ্চয়ই নেই যে এই ডাকাতের কথা মেনে নেবে?'

ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'তা না থাকার কথা। কিন্তু শোনা যাচ্ছে শয়তানটা নাকি অনেকগুলি কেল্লা দখল করে নিয়েছে।'

'তার মানে লোকটার সত্যিই ক্ষমতা আছে,' শ্ভাব্রিন মন্তব্য করল।

অধিনায়ক বললেন, 'তার ক্ষমতার বহর এখনই টের পাওয়া যাবে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না, ভাঁড়ারের চাবিটা দাও তো আমার হাতে। ইভান ইগ্নাতিচ, সেই বাশ্কিরটাকে নিয়ে এসো এখানে আর ইউলাইকে বলো চাবুক নিয়ে আসতে।'

ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটু সবুর করো, ইভান কুজমিচ। আগে আমি মাশাকে বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যাই। নইলে ও হয়ত চেঁচামেচি শুনে ভয় পেয়ে যাবে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও তোমাদের ওসব তদন্তের ব্যাপার বিশেষ পছন্দ করি না। মঙ্গল হোক তোমাদের।'

আগেকার দিনে আইনগত ব্যাপারে দৈহিক নিপীড়নের রেওয়াজ এত শক্ত শিকড় গেড়েছিল যে তা নাকচের সরকারী শুভ নির্দেশ দীর্ঘকাল চালু হয় নি। এমনি একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে অপরাধীকে অতি অবশ্যই নিজের মুখে দোষ স্বীকার করতে হবে, নইলে অপরাধ পুরোপুরি প্রমাণিত হয় না। এই ধারণা শুধু যে যুক্তিহীন তা নয়, আদালতী

কাণ্ডজ্ঞানের পরিপন্থীও। কারণ আসামীর অপরাধ অস্বীকার করাটা যদি আসামীর নির্দোষিতার প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত না হয়, তা হলে আসামীর অপরাধ স্বীকার করাটাও তাকে দোষী হিসেবে সাব্যস্ত করার পক্ষে যুক্তি হিসেবে আরো বেশি অচল। আজো পর্যন্ত মাঝে মাঝে পুরনো যুগের এমন সব বিচারকের সঙ্গে আমার দেখা হয় যাঁরা এই বর্বর প্রথাকে লোপ করা হয়েছে বলে দুঃখপ্রকাশ করেন। দৈহিক নিপীড়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা — এ প্রশ্ন সেকালে কিন্তু না বিচারক না আসামী, কারুর মনেই কোনো দিন ওঠে নি। সুতরাং অধিনায়কের আদেশ শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউই কিছুমাত্র অবাক হল না বা অস্বস্তি বোধ করল না। বাশ্‌কিরটিকে ভাঁড়ারে আটকে রাখা হয়েছিল, যে ভাঁড়ারের চাবি ছিল অধিনায়ক-পত্নীর কাছে। ইভান ইগ্‌নাতিচ গেল তাকে নিয়ে আসবার জন্যে। কয়েক মিনিট পরেই বন্দীকে হাজির করা হল বাড়ির বাইরের ঘরে। অধিনায়ক তাকে ঘরের ভিতরে আনবার জন্যে হুকুম দিলেন।

বাশ্‌কিরটির পা বেড়ি দিয়ে বাঁধা। অতিকষ্টে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরের ভিতরে এসে মাথার লম্বা টুপিটা খুলে দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। তার দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। লোকটিকে আমি জীবনে ভুলতে পারব না। বয়স সত্তরের একটু বেশিই হবে। নাকও নেই, কানও নেই। মাথাটা কামানো। দাড়ির বদলে উঁচিয়ে আছে দু-একটা পাকা চুল। খর্বকায়, রোগা এবং কুঁজো। কিন্তু তবুও দুচোখের কোটর থেকে যেন আগুনের ঝলক বেরিয়ে আসছে। এই ভয়ংকর লক্ষণগুলি দেখে অধিনায়ক চিনতে পারলেন যে, ১৭৪১ সালে এই লোকটিই দাঙ্গাহাঙ্গামার অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্তদের একজন। বললেন, 'আচ্ছা! পুরনো ঘাগী দেখছি! আগেও একবার আমাদের কবলে পড়েছিলি! তোর মাথাটা যেমন চাঁছাছোলা, তাতে বোঝা যায় বিদ্রোহ করাটা এই তোর প্রথম নয়। কাছে এগিয়ে আয়। এবার বল তো দেখি, কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে?'

বুড়ো বাশ্‌কির চুপ করে অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে রইল, যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। 'কথা বলছিস না যে,' ইভান কুজমিচ বলে

চললেন, 'রুশ ভাষা বুঝিস না? ইউলাই, ওকে ওর নিজের ভাষায় জিজ্ঞেস করো তো দেখি কে ওকে আমাদের কেল্লায় পাঠিয়েছে?'

অধিনায়কের এই প্রশ্ন ইউলাই তাতার ভাষায় শোনাল ওকে, কিন্তু ওর মুখচোখের ভাবে কোন পরিবর্তন এল না, তেমনি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অধিনায়ক বললেন, 'ইয়াক্সি!* এক্ষুনি কথা বার করিয়ে ছাড়ছি! ওহে, ওর ওই কিম্ভুত ডোরা-কাটা জামাটা খুলে নাও, তারপর লাগাও পিঠে চাবুক! ইউলাই, আচ্ছা করে কষে কয়েক ঘা লাগাও তো দেখি!'

দুজন বিকলাঙ্গ সৈনিক বাশ্‌কিরের গায়ের জামা খুলতে লাগল। হতভাগ্য লোকটির মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। চারদিকে তাকাচ্ছে সে — ছেলেমেয়েদের হাতে ধরা পড়ে কোনো ক্ষুদে প্রাণীর যেমন অবস্থা হয় তেমনিভাবে। তারপর একজন সৈনিক যখন বন্দীর হাতদুটো তার নিজের কাঁধে রেখে তাকে পিঠের ওপরে তুলে ধরল আর চাবুক হাঁকাল ইউলাই, তখন বাশ্‌কিরের মুখ থেকে একটা চাপা কাতর গোঙানি বেরিয়ে এল। মাথাটা নাড়তে নাড়তে হাঁ করল সে; জিভের জায়গায় নড়নড় করছে তার খানিকটা কাটা অংশ।

যখন ভাবতে বসি যে আমার জীবনকালেই এ সব ঘটনা আমি দেখেছি, আবার সম্রাট আলেক্সান্দরের সদয় শাসনও আমার জীবনকালেরই ঘটনা, তখন অবাক না হয়ে পারি না। শিক্ষার অগ্রগতি, মানবিক নীতির প্রসার কত দ্রুতই না হয়েছে! হে তরুণ যুবক! যদি কোনোদিন আমার লেখা এই লাইনগুলির উপরে তোমার চোখ পড়ে যায় তা হলে মনে রেখো যে সবচেয়ে সেরা ও সবচেয়ে স্থায়ী পরিবর্তনের মূলকথা হল মানুষের নীতিবোধের উন্নতি, কোনো রকম জবরদস্তি ঝাঁকানি ছাড়াই।

লোকটির জিভ নেই দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অধিনায়ক বললেন, 'দেখা যাচ্ছে, তার মুখ থেকে দরকারী কথা কিছু শোনা যাবে তার কোনো উপায় নেই। ইউলাই, ওকে আবার ভাঁড়ারে রেখে এসো। আচ্ছা এবার তা হলে অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

আমাদের নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি, এমন সময়ে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকলেন ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না।

হাঁপাচ্ছেন তিনি, মুখে চোখে প্রচণ্ড উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

অধিনায়ক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি, কী হয়েছে তোমার?'

ভাসিলিসা ইয়েগোরেভ্‌না বললেন, 'সর্বনাশ গো! আজ সকালে নিজনেওজেরনায়া কেল্লা দখল হয়ে গেছে। পাদ্‌রি গেরাসিমের চাকর এইমাত্র এসেছে ওখান থেকে। ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেছে ও। কেল্লার অধিনায়ক আর সমস্ত অফিসারকে ফাঁসি দিয়েছে। সৈন্যরা সবাই বন্দী। দেখতে না দেখতেই শয়তানরা এসে হাজির হবে এখানে।'

এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে স্তম্ভিত হলাম আমি। নিজনেওজেরনায়া কেল্লার অধিনায়কের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। শান্ত ও বিনয়ী মানুষটি, বয়সে তরুণ, মাস দু-এক আগে নববধূর সঙ্গে ওরেনবুর্গ থেকে ফিরবার পথে উঠেছিলেন ইভান কুজমিচের বাড়িতে। আমাদের কেল্লা থেকে নিজনেওজেরনায়া কেল্লার দূরত্ব পঁচিশ ভার্স্টের বেশি নয়। কাজেই পুগাচেভের বাহিনী যে কোনো সময়ে আমাদের আক্রমণ করে বসতে পারে। মারিয়া ইভানভ্‌নার কপালে কি আছে ভাবতেই আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল।

অধিনায়ককে আমি বললাম, 'ইভান কুজমিচ, আমাদের জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এই কেল্লাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য এ কথা আমরা জানি। কিন্তু স্ত্রীলোকদের নিরাপত্তার কথা আমাদের অতি অবশ্যই ভাবতে হবে। যদি ওরেনবুর্গের রাস্তা নির্বিঘ্ন থাকে তা হলে আপনি স্ত্রীলোকদের ওরেনবুর্গে পাঠিয়ে দিন। নইলে আরো দূরের কোনো নিরাপদ কেল্লায় পাঠিয়ে দিন, যা শয়তানদের নাগালের বাইরে।'

ইভান কুজমিচ স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় একটা কথা বলছি শোনো। বিদ্রোহীদের সঙ্গে যতদিন না বোঝাপড়া করতে পারছি ততদিন তোমাদের বরং অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া যাক। তাই ভালো হবে, না কী বলো?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'মোটেও ভালো হবে না! এমন কেল্লা কোথায় আছে যা নাকি বুলেটের নাগালের বাইরে? বেলোগর্স্ক কেল্লা নিরাপদ

নয় কেন? ভগবানের দয়ায় বাইশটা বছর আমরা কাটিয়েছি এখানে। বাশ্‌কির, কিরগিজ, অনেককেই তো দেখলাম! পুগাচেভকেও কাটিয়ে উঠতে পারব বোধ করি!'

'বেশ, গিন্নি!' আপত্তি করলেন ইভান কুজমিচ, 'কেল্লার ওপর ভরসা থাকলে এখানেই থেকে যাও। কিন্তু মাশাকে নিয়ে কী করা যায় বলো তো? যদি আমরা আক্রমণ ঠেকাতে পারি বা কোনো রকমে পরিত্রাণ পেয়ে যাই, তা হলে তো ভালোই -- কিন্তু যদি আমাদের এই কেল্লা দখল হয়ে যায়?'

'তা হলে... তা হলে...' ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌নার মুখে কথা আটকে যেতে লাগল, প্রচণ্ড একটা উত্তেজনায় চুপ করে গেলেন তিনি।

'না, তা হয় না।' অধিনায়ক বলে চললেন; জীবনে বোধ হয় এই প্রথম স্ত্রীর ওপরে তাঁর নিজের কথাটাই বজায় থাকছে তা বুঝতে পারলেন তিনি, 'মাশার এখানে কিছুতেই থাকা চলে না। আমরা ওকে ওরেনবুর্গে ওর ধর্ম-মার কাছে পাঠিয়ে দেব। ওখানে প্রচুর সৈন্য, আর কামান আছে, দেওয়ালগুলো পাথরের। আর তুমিও ওর সঙ্গে চলে গেলেই ভালো হয়। আমাদের এই কেল্লা যদি দখল হয়ে যায় তা হলে তুমি, বুড়ো মানুষ, তোমার কপালে কী আছে কে জানে?'

ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌ন্য বললেন, 'বেশ, তাই হোক। মাশাকে আমরা এখান থেকে সরিয়ে দেব। কিন্তু স্বপ্নেও ভেব না যে আমি যাব। কিছুতেই যাচ্ছি না। এই বুড়ো বয়সে তোমাকে ছেড়ে কোন এক বিদেশ বিভুঁইয়ে গিয়ে একা একা কবর নেব তা কিছুতেই হতে দেব না। আমরা এতদিন একসঙ্গে থেকেছি, একসঙ্গেই মরব।'

অধিনায়ক বললেন, 'বেশ, এই কথাই থাক। তাহলে আর দেরি করে লাভ কী। মাশার যাবার বন্দোবস্ত করো গিয়ে। কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব ওকে। আর যদিও এখানে লোকজনের খুব অভাব তবুও একদল রক্ষী দেব ওর সঙ্গে। কিন্তু মাশা কোথায়?'

স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আকুলিনা পাম্‌ফিলভ্‌নার কাছে। নিজনেওজেরনায়া দখল হবার খবর শুনেই ওর বুকের ধড়ফড়ানি শুরু

হয়ে গেছে। একটা অসুখ-বিসুখ না করলে হয়। হে প্রভু, হে ঈশ্বর! এ কী দশা করলে আমাদের!'

মেয়ের যাত্রার আয়োজন করবার জন্যে ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না উঠে গেলেন। তারপরেও অধিনায়কের ঘরে আলোচনা চলেছে, কিন্তু আমি আর সে আলোচনায় যোগ দিই নি বা কে কী কথা বলছে তাও শুনি নি। রাত্রিবেলা খাবার সময় মারিয়া ইভানভ্নাকে দেখা গেল। মুখটা ফ্যাকাশে, চোখ লাল। নিঃশব্দে আমরা খাওয়া শেষ করলাম এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়েও অল্প সময়ের মধ্যে উঠে পড়লাম খাওয়া শেষ করে। তারপর পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা রওনা হলাম যে যার কোয়ার্টারের দিকে। কিন্তু আমি ইচ্ছে করে আমার তলোয়ারটা ফেলে রেখে এসেছিলাম; সেটা আনবার জন্যে ফিরে গেলাম। মনে হয়েছিল, গিয়ে মারিয়া ইভানভনাকে একা পাব। আর হলও তাই। দরজার কাছে আমার তলোয়ারটা নিয়ে ও দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমার হাতে তলোয়ারটা দিয়ে ও বলল, 'বিদায়, পিওতর আন্দ্রেইচ! আমাকে ওরেনবুর্গ যেতে হবে। তুমি বেঁচে থেকো আর সুখে থেকো! প্রভুর দয়া হলে আমরা হয়ত একসঙ্গে মিলতে পারি। তা যদি না হয়...' এই পর্যন্ত বলে ও ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। আমি ওকে দুহাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললাম, 'বিদায়, আমার চোখের মণি, আমার বুকের ধন, বিদায়! আমার যাই হোক না কেন, জেনে রেখো যে মরবার সময় তোমার কথাই ভাবব আমি, তোমার জন্যেই প্রার্থনা করব।' আমার বুকের ওপরে মাথা রেখে মাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি ওকে আবেগের সঙ্গে চুমু খেলাম, তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

সপ্তম অধ্যায়

হানা

গর্দান, ওরে গর্দান, গর্দান মোর,
ফৌজের কাজে দিলি তো সারাটা জান তোর!
গেল এক কুড়ি, এক কুড়ি আর তেরো বছর,
গেল খেটে খেটে, হল না তো কোনো কিছু কদর।
গর্দান মোর, গর্দান তুই পেলি কই
দু-চার পয়সা, অন্তত কিছু আনন্দই।
কোনো ভালো কথা হবে নাকো তোর কপালে শোনা,
ওপর কোঠায় ওঠার কথাও মনেতে এনো না।
এত করে তোর ভাগ্যে রয়েছে গর্দান
দুটো খুঁটি আর, হায় আড়কাঠ একখান,
আড়কাঠ কিবা মেপল গাছের কাঠেই গড়া,
আরো তার থেকে ঝুলছে ফাঁসির রেশমী দড়া।

লোকসঙ্গীত।

সেদিন রাত্রে আমি ঘুমোই নি বা পোশাক ছাড়ি নি। ইচ্ছে ছিল, খুব ভোরে উঠে কেল্লার দরজার সামনে দাঁড়াব এবং মারিয়া ইভানভ্না যখন যাবে তখন শেষবারের মতো বিদায় জানাব ওকে। আমি বুঝতে পারছি যে আমার মধ্যে মস্ত একটা পরিবর্তন ঘটেছে। এতদিন পর্যন্ত একটা বিমর্ষভাব আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, এখন আমার মনের ভয়ানক একটা উত্তেজিত অবস্থা — কিন্তু সেটা আগেকার চেয়ে অনেক সহনীয়। বিচ্ছেদের যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটা আশা, অস্পষ্ট হোক, কিন্তু খুবই মধুর। আর থাকে বিপদ সম্পর্কে একটা অস্থির প্রত্যাশা আর এক আত্মগরিমার আবেগ। অলক্ষ্যে রাত্রি পার হল। বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল একজন কর্পোরাল। শোনা

গেল যে কসাকেরা রাত্রিবেলা কেল্লা ছেড়ে চলে গেছে, ইউলাইকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে সঙ্গে, আর কেল্লার আশেপাশে ঘোড়ায় চেপে ঘোরাঘুরি করছে অজানা সব লোক। সময় থাকতে মারিয়া ইভানভনা আর কেল্লা ছেড়ে যেতে পারবে না, ভাবতেই আতঙ্ক হল আমার। কর্পোরালকে দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে আমি ছুটলাম অধিনায়কের বাড়িতে।

দিনের আলো ফুটে উঠছে। রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছি এমন সময়ে কে যেন আমার নাম ধরে ডেকে উঠল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার কাছে এসে দাঁড়াল ইভান ইগ্‌নাতিচ, বলল, 'কোথায় চলেছেন? ইভান কুজমিচ র‍্যাম্পার্টে আছেন, তিনি ডাকতে পাঠিয়েছেন আপনাকে। পুগাচেভ এসে গেছে।' দুরুদুরু বুকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মারিয়া ইভানভ্‌না চলে গেছেন কি?' ইভান ইগ্‌নাতিচ জবাব দিল, 'না, তিনি যেতে পারেন নি। বড়ো বেশি দেরি করে ফেলেছি আমরা। ওরেনবুর্গের সঙ্গে এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই, আমাদের কেল্লা ঘেরাও হয়ে গেছে চারদিক থেকে। পিওতর আন্দ্রেইচ, অবস্থা খুবই খারাপ।'

আমরা র‍্যাম্পার্টে গেলাম। র‍্যাম্পার্ট বলতে প্রাকৃতিক কারণে উচ্চতাপ্রাপ্ত খানিকটা জমি, চারদিকে খুঁটির বেড়াজাল। কেল্লার সমস্ত অধিবাসী ইতিমধ্যেই জড়ো হয়েছে সেখানে। রাইফেল ধরে সার দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে সৈন্যদের। কামানটাকে টেনে সেখানে আনা হয়েছে আগের দিন। অধিনায়ক নিজের ক্ষুদ্র বাহিনীর সারির মধ্যে অনবরত সামনে পিছনে ছুটোছুটি করছেন। দেখে মনে হয় যে বিপদের আসন্নতা উদ্দীপিত করে তুলেছে এই প্রবীণ যোদ্ধাকে। কেল্লা থেকে অনতিদূরে স্তেপের ওপরে দেখা যাচ্ছে জনকুড়ি অশ্বারোহীর মূর্তি। দেখে মনে হয় কসাক, কিন্তু ওদের মধ্যে বাশ্‌কিরও আছে। সেটা বোঝা যায় বনবেড়ালের চামড়ার উঁচু টুপি আর তূণ দেখে। বাহিনী পরিদর্শন শেষ করে অধিনায়ক সৈন্যদের উদ্দেশে বললেন, 'তাহলে জোয়ানরা, সম্রাজ্ঞী মায়ের জন্যে আজ আমরা রুখে থাকব। সমস্ত দুনিয়াকে দেখিয়ে দেব যে আমরা সাহসী ও রাজভক্ত প্রজা!' অধিনায়কের কথায় সৈন্যরা উচ্চ নির্ঘোষে সোৎসাহ সমর্থন জানাল। আমার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে আছে শ্‌ভাব্রিন, ওর স্থির দৃষ্টি শত্রুর দিকে নিবদ্ধ। কেল্লায় গতিবিধি লক্ষ্য করে অশ্বারোহীরা দলবদ্ধ হয়ে

আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। ইভান ইগ্‌নাতিচকে অধিনায়ক হ্‌কুম দিলেন লোকগ্‌লোকে লক্ষ্য করে কামান দাগতে এবং কামানের সলতেয় আগ্‌ন ধরিয়ে দিলেন নিজেই। সোঁ-ও-ও করে আওয়াজ তুলে কামানের গোলা ছ্‌টল। লোকগ্‌লোর মাথার ওপর দিয়ে দ্‌রে গিয়ে পড়ল গোলাটা, কারো কোনো ক্ষতি হল না। অশ্বারোহীরা দল ভেঙে সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছ্‌টিয়ে একেবারে উধাও। স্তেপ জনশ্‌ন্য হয়ে গেল।

ঠিক এই সময়ে ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না মাশাকে সঙ্গে নিয়ে র‍্যাম্পার্টে এসে হাজির। মাশা কিছ্‌তেই তাঁর সঙ্গ ছাড়তে রাজি নয়। অধিনায়ক-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, খবর কী? শত্র্‌ কোথায়?' ইভান কুজমিচ জবাব দিলেন, 'শত্র্‌ খ্‌ব বেশি দ্‌রে নয়। ঈশ্বর কর্‌ন, ভালোয় ভালোয় কেটে যাক! মাশা, তুমি কি ভয় পেয়েছ?' মারিয়া ইভানভ্‌না বলল, 'না বাবা। বরং বাড়িতে একা থাকতেই আমার বেশি ভয় করে।' এই বলে ও আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে একটু হাসি ফোটাল। নিজের অজান্তেই আমি তলোয়ারের বাঁটটা শক্তভাবে চেপে ধরলাম। মনে পড়ল যে গতকাল ওর হাত থেকেই আমি তলোয়ারটা নিয়েছি যেন আমার প্রেমিকাকে রক্ষা করার জন্যে। ব্‌কের ভিতরটায় আগ্‌ন জ্বলে উঠল। মনে মনে কল্পনা করলাম আমি ওর ত্রাণকর্তা; প্রবল একটা বাসনা জাগল, আমি যে ওর বিশ্বাসের উপয্‌ক্ত তা ওকে দেখিয়ে দিই। অধৈর্য হয়ে চ্‌ড়ান্ত ম্‌হ্‌র্তটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

কেল্লা থেকে প্রায় আধ-ভার্স্ট দ্‌রে একটা ঢিবির আড়াল থেকে এবার নতুন আরেক দল অশ্বারোহী বেরিয়ে এসেছে। স্তেপ অঞ্চল ছেয়ে গেছে বর্শা আর তীরধন্‌কে সজ্জিত একদল সশস্ত্র মান্‌ষে। এই দলের মধ্যে একজন চেপেছে একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে, পরনে গাঢ় রক্তবর্ণের পোশাক, হাতে খোলা তলোয়ার। এই লোকটিই প্‌গাচেভ। সে ঘোড়া থামাতেই সবাই ঘিরে দাঁড়াল তাকে। তারপর, যতদ্‌র মনে হয় তার হ্‌কুমেই চারজন লোক প্‌র্ণ বেগে ঘোড়া ছ্‌টিয়ে এল একেবারে আমাদের কেল্লা পর্যন্ত। এই চারজনকে চিনতে পারলাম আমরা। আমাদের দলত্যাগী সেই চারজন লোক। একজন একটা কাগজের টুকরো মাথার ওপরে তুলে ধরে আছে। আর একজনের বর্শার মাথায় ইউলাইয়ের ম্‌ণ্ডটা গাঁথা।

বর্শাটাকে ঝাঁকিয়ে মুণ্ডটাকে সে বেড়ার ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। বেচারি কাল্‌মিকের মুণ্ডটা এসে পড়ল অধিনায়কের পায়ের কাছে। বিশ্বাসঘাতকরা চেঁচিয়ে বলল, 'গোলাগুলি ছুঁড়ো না, এসো রাজার কাছে, তিনি এখানে!'

ইভান কুজমিচ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'রোসো, আমি দেখাচ্ছি তোদের!' তারপর সৈন্যদের হুকুম দিলেন, 'চালাও গুলি!' একঝাঁক গুলি বৃষ্টি করল আমাদের সৈন্যরা। যে কসাকটির হাতে চিঠিটা ছিল, সে ঘোড়ার জিনের ওপর থেকে টলে পড়ে গেল মাটিতে। অন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে গেল। মারিয়া ইভানভ্‌নার দিকে আমি তাকালাম। ইউলাইয়ের রক্ত-মাখা মাথাটা দেখে ও শিউরে উঠেছে, বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে, সমস্ত মিলিয়ে ওর প্রায় একটা হতচেতন অবস্থা। মৃত কসাকের হাতে কাগজের টুকরোটা রয়ে গেছে, সেটা আনবার জন্যে একজন কর্পোরালকে ডেকে হুকুম দিলেন অধিনায়ক। কর্পোরাল মাঠের দিকে চলে গেল। ফিরে আসবার সময় মৃত লোকটির ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে নিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। অধিনায়কের হাতে চিঠিটা দিল সে। অধিনায়ক পড়ে দেখলেন, তারপর ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। ওদিকে বিদ্রোহীদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, আক্রমণ করবার জন্যে ওরা প্রস্তুত। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কানের পাশ দিয়ে শিস দিয়ে বুলেট ছুটতে লাগল। কয়েকটা তীর এসে বিঁধল আমাদের পায়ের কাছে মাটিতে আর বেড়ার খুঁটিতে। অধিনায়ক বললেন, 'ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না! এখানে মেয়েদের কিছু করবার নেই। মাশার দিকে একবার তাকিয়ে দেখো তো! প্রায় মরবার মতো অবস্থা!'

চারদিকে বুলেট বৃষ্টি হতে দেখে ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না খানিকটা দমে গেছেন। স্তেপের দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি; সেখানে রীতিমতো সাড়া জেগেছে। স্বামীর দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'ইভান কুজমিচ, আমরা মরি কিংবা বাঁচি, সবই এখন ভগবানের হাতে। মাশাকে আশীর্বাদ করো! মাশা, তোর বাবাকে প্রণাম কর গিয়ে!'

মাশার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শরীরটা কাঁপছে। ইভান কুজমিচের কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল, প্রণাম করল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।

বৃদ্ধ অধিনায়ক মেয়ের মাথার ওপরে তিনবার ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন, তারপর হাত ধরে তুলে কপালে চুমু খেয়ে ধরা গলায় বললেন, 'মাশা, আশীর্বাদ করি, তুই সুখী হ'। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস! ভগবান তোর সহায় হবেন! যদি সত্যিকারের খাঁটি মানুষের সঙ্গে তোর দেখা হয়, তা হলে ভগবান করুন, তোরা যেন ভালোবাসতে পারিস, তোদের যেন বুঝতে ভুল না হয়। তোর মা আর আমি যেমন একসঙ্গে জীবন কাটিয়েছি, তেমনিভাবে থাকতে চেষ্টা করিস সেই মানুষটির সঙ্গে। এখন এসো, মাশা! ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্না আর দেরি করো না, যত তাড়াতাড়ি পারো ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও।' (বাবার বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মাশা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।) কাঁদতে কাঁদতে অধিনায়ক-পত্নী বললেন, 'এসো, আমরাও দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিই! বিদায়, ইভান কুজমিচ! যদি কোনোদিন কোনো কারণে তোমার মনে কষ্ট দিয়ে থাকি তা হলে আমাকে ক্ষমা করো!' স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে অধিনায়ক বললেন, 'বিদায়, ওগো বিদায়, আর না, যাও তোমরা! দেরি করো না! যদি সময় পাও তো মাশাকে সারাফান পরিয়ে দিও।' মা ও মেয়ে চলে গেল। মারিয়া ইভানভ্নার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে ও মাথা নাড়ল। ইভান কুজমিচ এবার ফিরে তাকিয়েছেন আমাদের দিকে। তাঁর সমস্ত মনোযোগ এখন শত্রুর দিকে। বিদ্রোহীরা এতক্ষণ তাদের নেতার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল, এবার হঠাৎ সবাই একসঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। অধিনায়ক বললেন, 'তৈরি হও! এবার ওদের আক্রমণ শুরু হবে...' আর ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল একটা ভীষণ চিৎকার আর গর্জন। বিদ্রোহীরা মরিয়া হয়ে আমাদের কেল্লার দিকে ছুটে আসছে। আমাদের কামানে গ্রেপ-শট ভরা ছিল, অধিনায়ক একেবারে কাছাকাছি নিশানা করে হঠাৎ কামান দাগলেন। গোলাটা গিয়ে ফাটল ভিড়ের মাঝখানে। বিদ্রোহীরা ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে পিছু হটছে। শুধু তাদের নেতা একা দাঁড়িয়ে আছে সামনে... তলোয়ার হাঁকাচ্ছে সে, মনে হয় উত্তেজিত হয়ে সে বোঝাচ্ছে লোকজনদের... চিৎকার ও গর্জন মুহূর্তের জন্যে থেমে গিয়েছিল, আবার শুরু হয়ে গেল। সৈন্যদের দিকে ফিরে তাকিয়ে অধিনায়ক বললেন, 'কেল্লার দরজা

খোলো! ভেরি বাজাও! ঝাঁপিয়ে পড়ো জোয়ানরা! এগোও আমার সঙ্গে সঙ্গে!'

অধিনায়ক, ইভান ইগ্‌নাতিচ আর আমি তৎক্ষণাৎ র‍্যাম্পার্ট ছেড়ে এলাম। কিন্তু কেল্লার সৈন্যরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তারা একটুও নড়ল না। ইভান কুজমিচ চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? মরতে হয় মরব, ফৌজী ব্যাপার!' এদিকে বিদ্রোহীরা ঢুকে পড়েছে কেল্লার মধ্যে। এবার তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, ভেরির শব্দ থেমে গেল, কেল্লার সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে দিল। একটা ঘা খেয়ে পড়ে গেলাম আমি, আবার উঠে দাঁড়ালাম, তারপর বিদ্রোহীদের সঙ্গে সঙ্গে কেল্লার মধ্যে ঢুকলাম। অধিনায়কের মাথায় চোট লেগেছে, তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন একদল দুর্বৃত্তের মাঝখানে, চাবির গোছাটা তাঁর কাছ থেকে নেবার জন্যে তারা জবরদস্তি করছিল। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে আমি ছুটে যেতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু জনকয়েক ষণ্ডাগণ্ডা কসাক তাদের বেল্‌ট দিয়ে কষে বাঁধল আমাকে, বলল, 'জারের বিরুদ্ধে যাবার মজাটা তোমরা এখুনি টের পাবে!' রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। কেল্লার বাসিন্দারা রুটি আর নুন নিয়ে তাদের বরণ করার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে, বেজে উঠেছে গির্জার ঘণ্টা। হঠাৎ রব উঠল যে, জার চত্বরে বন্দীদের অপেক্ষায় আছেন আর আনুগত্যের শপথ নেবেন। দল বেঁধে মানুষ ছুটল সেদিকে। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও চলতে হল।

অধিনায়কের বাড়ির অলিন্দে একটা কেদারায় বসে আছে পুগাচেভ। পরনে লেস-দেওয়া লাল কসাক জামা। মাথায় সেব্‌ল্‌ লোমের উঁচু টুপি; টুপিটা থেকে ঝুলছে একটা সোনার থোপ্‌না। তার চকচকে চোখদুটোর ওপরে আড়াআড়িভাবে টুপিটা বসানো। লোকটির মুখ আমার চেনা-চেনা মনে হল। তাকে ঘিরে আছে কসাক সর্দাররা। হাতে ক্রুশ নিয়ে অলিন্দের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে আছে পাদ্‌রি গেরাসিম। মুখটা ফ্যাকাশে, শরীর কাঁপছে। দেখে মনে হয়, যাদের শাস্তি দেওয়া হবে তাদের প্রত্যেকের জন্যে তিনি নিঃশব্দে মার্জনা ভিক্ষা করছেন। চত্বরের মাঝখানটিতে তাড়াহুড়ো করে একটা ফাঁসিমঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা এগিয়ে আসতেই বাশ্‌কিররা লোকজনদের ঠেলে সরিয়ে আমাদের জন্যে পথ করে দিল,

আমাদের দাঁড় করাল পুগাচেভের সামনে। ঘণ্টার শব্দ থেমে গেছে। চারদিকে থমথমে নিস্তব্ধতা। 'অধিনায়ক কে?' ভুয়ো-জার জিজ্ঞেস করল। আমাদের কেল্লার সেই সার্জেণ্টটি ভিড়ের থেকে বেরিয়ে এসে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল ইভান কুজমিচকে। বৃদ্ধের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়! আমি তোমার জার — আর আমারই বিরুদ্ধে কিনা তুমি লড়াই চালাও!' জখমে দুর্বল অধিনায়ক তার শেষ শক্তি জড়ো করে দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, 'তুমি আমার প্রভু নও! তুমি একটা চোর, ভুয়ো-জার! শুনছ?' তীব্র ভ্রূকুটি করে তাকাল পুগাচেভ, তারপর একটা সাদা রুমাল নাড়ল। কয়েকজন কসাক বৃদ্ধ ক্যাপটেনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল ফাঁসিমঞ্চের কাছে। যে বিকলাঙ্গ বাশ্‌কিরটিকে আগের দিন আমরা জেরা করেছিলাম, তাকে দেখা গেল। হাতে দড়ি নিয়ে ফাঁসিমঞ্চের আড়কাঠের ওপরে দুপাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে; কিছুক্ষণের মধ্যেই হতভাগ্য ইভান কুজমিচ আমার চোখের সামনে শূন্যে ঝুলতে লাগলেন। তারপর পুগাচেভের সামনে নিয়ে আসা হল ইভান ইগ্‌নাতিচকে। পুগাচেভ তাকে বলল, 'জার পিওতর ফিওদরোভিচ তোমার সামনে বসে আছেন, তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ নাও!' ক্যাপটেনের কথার পুনরাবৃত্তি করে ইভান ইগ্‌নাতিচ জবাব দিল, 'তুমি আমাদের জার নও। বাপু হে, তুমি হচ্ছ একটা চোর ও ভুয়ো-জার!' পুগাচেভ আবার রুমাল নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ অধিনায়কের পাশে এই সুযোগ্য লেফ্‌টেনাণ্টটিও শূন্যে ঝুলতে থাকল।

এবার আমার পালা। সাহসের সঙ্গে আমি পুগাচেভের দিকে তাকালাম। আমার মহাপ্রাণ কমরেডরা যে কথাগুলি বলেছে, আমিও বলবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। এই সময়ে বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যে আমি শ্‌ভাব্রিনকে দেখতে পেলাম। কসাক জামা গায়ে, কসাকদের ধরনে চুল ছাঁটা। সে বিস্ময় বর্ণনাতীত। পুগাচেভের কাছে গিয়ে কানে কানে কী যেন বলল সে। পুগাচেভ আমার দিকে না তাকিয়েই হুকুম দিল, 'লটকাও ফাঁসিতে!' আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল। মনে মনে আমি প্রার্থনা করতে শুরু করলাম, আমার সমস্ত পাপের জন্যে আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে অনুশোচনা নিবেদন করলাম ভগবানের কাছে, আমার প্রিয়জনদের বাঁচিয়ে রাখবার

জন্যে কাতর মিনতি জানালাম। আমাকে টানতে টানতে ফাঁসিমঞ্চের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। 'ভয় পেও না!' আমাকে ফাঁসিমঞ্চের কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলছিল খুনীরা, হয়ত সত্যিই তারা আমাকে একটু উৎসাহিত করে তুলতে চেয়েছিল। হঠাৎ একটা আর্ত চিৎকার শুনলাম, 'থামো! হতচ্ছাড়ারা, সবুর করো!' জল্লাদরা থেমে গেল। তাকিয়ে দেখি সাভেলিচ পুগাচেভের পা জড়িয়ে ধরেছে। 'বাপ আমার! আমার মনিবের ছেলেকে কেন তুমি খুন করতে চাও?' বলছে আমার বুড়ো খুড়ো, 'ওকে তুমি ছেড়ে দাও; তার জন্যে অনেক ক্ষতিপূরণ পাবে। আর লোক-দেখানোর জন্যে, ভয় পাওয়াবার জন্যে ফাঁসি দিতে হলে, এই বুড়ো লোকটাকেই লটকাও!' পুগাচেভ ইঙ্গিত করতেই বাঁধন খুলে ছেড়ে দেওয়া হল আমাকে। 'আমাদের জার তোমাকে ক্ষমা করেছে।' ওরা বলল আমাকে। এভাবে মুক্তি পেয়ে আমার যে খুব আনন্দ হয়েছিল, সে কথা বলতে পারি না, কিন্তু আমি যে অনুতপ্ত হয়েছিলাম, এও বলব না। আবেগগুলো হয়েছিল ভারি ঘোলাটে। আমাকে আবার সেই ভুয়ো-জারের সামনে নিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসিয়ে দেওয়া হল। পুগাচেভ তার পেশীবহুল হাতখানা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। 'হাতে চুমু খাও! হাতে চুমু খাও!' রব ওঠে চারদিকে। কিন্তু এভাবে নিজেকে ছোটো করে নিজের সম্মান নষ্ট করার চেয়ে আমি হিংস্রতম শাস্তিও মাথা পেতে নিতে রাজি। সাভেলিচ উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে আমার পিঠে কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'দাদাবাবু, এখন আর গোঁয়ার্তুমি করো না। তোমার কী এসে যায়? একদলা থুতু ফেলে চুমু খেলেই হয় শয়তা... (থুঃ!) চুমু খেলেই হয় ওর হাতে।' তবুও আমি নড়ি না। পুগাচেভ হাতটা সরিয়ে নিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলল, 'হুজুর বোধ হয় আনন্দে দিশেহারা হয়ে গেছেন! দাঁড় করিয়ে দাও!' আমাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। আমি মুক্তি পেলাম। তারপর চোখের সামনে আর যে সব ভয়ানক কমেডির অভিনয় হল তাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হল আমাকে।

কেল্লার বাসিন্দারা আনুগত্যের শপথ নিচ্ছে। একজন একজন করে আসে, ক্রুশে চুমু খায়, ভুয়ো-জারকে কুর্নিশ করে চলে যায়। ছাউনির সৈনিকেরা এখানেই দাঁড়িয়ে আছে। সৈন্যবাহিনীর দর্জি হাতে একটা

ভোঁতা কাঁচি নিয়ে সৈনিকদের বিনুনি কেটে দিচ্ছে। সৈনিকেরা আসে, শরীরটাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পুগাচেভের হাতে চুমু খায় আর তখন পুগাচেভ সমস্ত দোষ মার্জনা করে দলভুক্ত করে নেয় তাদের। এই সমস্ত শেষ হতে ঘণ্টা তিনেক সময় লাগল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পুগাচেভ সর্দারদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। জমকালো সাজপোশাক-পরানো সাদা একটা ঘোড়া আনা হয়েছে তার জন্যে। দুটি কসাক তাকে বগলের তলায় ধরে তুলে দিল ঘোড়ার জিনের ওপরে। পাদ্রি গেরাসিমকে পুগাচেভ বলল যে তাঁর বাড়িতে সে খেতে যাবে। আর ঠিক এই সময়ে শোনা গেল স্ত্রীলোকের চিৎকার। ডাকাতের দল ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নাকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে অলিন্দে। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নার আলুথালু চুল, একেবারে উলঙ্গ চেহারা। তাঁর পরনের তুলো-ভরা জ্যাকেটটা ইতিমধ্যেই একজনের গায়ে উঠেছে। অন্যরা টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসছে পালকের তোশক, সিন্দুক, চায়ের বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় আর সংসারের হাজারটা খুঁটিনাটি জিনিস। হতভাগিনী বৃদ্ধা চিৎকার করে বললেন, 'ওগো বাছারা, আমাকে তোমরা শান্তিতে মরতে দাও। ইভান কুজমিচের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।' হঠাৎ ফাঁসিমঞ্চের দিকে তাঁর নজর পড়ল। নিজের স্বামীকে চিনতে পারলেন তিনি। আর তারপরেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'শয়তানের দল! তোরা এ কী দশা করেছিস ওর! ইভান কুজমিচ! আমার চোখের মণি! বীর সৈনিক! প্রুশিয়ানদের বেওনেট বা তুর্কীদের বন্দুকের গুলি তোমাকে ছুঁতে পারে নি! সামনাসামনি লড়াইয়ে প্রাণ হারাও নি তুমি! শেষকালে তোমাকে কিনা প্রাণ দিতে হল এক ফেরারী কয়েদীর হাতে!' পুগাচেভ বলল, 'ওই বুড়ি ডাইনীর বকবকানি থামাও তো দেখি।' এ কথা শুনে একজন তরুণ কসাক তাঁর মাথা লক্ষ্য করে তলোয়ারের কোপ বসাল। ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নার প্রাণহীন শরীর লুটিয়ে পড়ল অলিন্দের সিঁড়ির ওপরে। পুগাচেভ স্থানত্যাগ করল। সমস্ত মানুষ ছুটল তার পিছনে পিছনে।

অষ্টম অধ্যায়

অনাহূত অতিথি

অনাহূত অতিথি তাতারের চেয়েও খারাপ।

প্রবাদ।

ময়দানটা জনশূন্য হয়ে গেল। আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। গুছিয়ে চিন্তা করবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। পর পর কতকগুলি ভয়ঙ্কর ঘটনার ছাপ আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে।

আমার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে মারিয়া ইভানভ্‌নার ভবিষ্যৎ ভেবে। কোথায় আছে ও? কী ঘটেছে ওর কপালে? ও কি লুকোতে পেরেছে? যে জায়গায় লুকিয়েছে তা নিরাপদ তো?.. এমনি নানা চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। অধিনায়কের ঘরে গেলাম... ঘরের ভিতরে ছত্রখান অবস্থা, চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক ভাঙা, কাঁচের জিনিসপত্র গুড়ো গুড়ো, জিনিসপত্র যে যা পেরেছে তুলে নিয়ে গেছে। মেয়েদের ঘরের দিকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, সেদিকে গেলাম এবং জীবনে এই প্রথম এসে ঢুকলাম মারিয়া ইভানভ্‌নার ঘরে। ঘরের একপাশে বিছানা, ডাকাতের দল ওর বিছানাটাকে লণ্ডভণ্ড করেছে, ওর পোশাকের আলমারিটা ভেঙেছে, ভিতরে যা কিছু ছিল লুটপাট করে নিয়ে গেছে। যেখানে যিশু খ্রীষ্টের বিগ্রহ ছিল, সে জায়গাটা শূন্য, শুধু একটা বাতি তখনো টিমটিম করে জ্বলছে। আর অক্ষত আছে দুই জানলার মাঝখানে ঝোলানো আরসিটা... কিন্তু এই অনাড়ম্বর কুমারী আশ্রমের কর্ত্রী কোথায়? ভয়ঙ্কর একটা দুশ্চিন্তা ঝলক দিল মনে, কল্পনায় প্রত্যক্ষ করলাম যে ডাকাত-দলের হাতে ও ধরা পড়েছে... ভাবতেই আমার বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল যেন... বুক-ভাঙা কান্না কাঁদলাম, চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম আমার

প্রেমাস্পদার নাম ধরে। ... এই সময় শুনতে পেলাম অস্পষ্ট একটা শব্দ; আলমারির পিছন থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফ্যাকাশে মুখে বেরিয়ে এল পালাশা।

হতাশাসূচক একটা ভঙ্গি করে পালাশা বলল, 'পিওতর আন্দ্রেইচ! কী ভীষণ দিন! কী ভয়ানক কান্ড!'

অধৈর্য হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মারিয়া ইভানভ্‌না কোথায়? তার খবর কী?'

পালাশা জবাব দিল, 'দিদিমণি বেঁচে আছেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলভ্‌নার বাড়িতে লুকিয়ে আছেন তিনি।'

আতঙ্কে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'পাদ্‌রির বাড়িতে! সর্বনাশ! পুগাচেভ যে গেছে ওখানে!'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলাম; চোখের পলক না ফেলতে রাস্তায়, তারপর কোনোদিকে দৃকপাত না করে সোজা পাদ্‌রির বাড়ির দিকে। পাদ্‌রির বাড়ির ভিতর থেকে হৈ-হট্টগোল, হাসি আর গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে... সঙ্গীদের নিয়ে উৎসবে মেতেছে পুগাচেভ। পালাশা এসেছে আমার পিছনে পিছনে। ওকে বললাম ও যেন যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আকুলিনা পামফিলভ্‌নাকে ডেকে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা খালি বোতল হাতে পাদ্‌রির স্ত্রী বারান্দায় বেরিয়ে এলেন।

'ভগবানের দোহাই! মারিয়া ইভানভ্‌না কোথায় আমাকে বলুন?' উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম।

পাদ্‌রির স্ত্রী জবাব দিলেন, 'আহা বেচারি! পর্দার আড়ালে আমার বিছানায় শুয়ে আছে ও! পিওতর আন্দ্রেইচ, আর একটু হলে ভয়ানক একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল আর কি। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ফাঁড়াটা কেটে গেছে। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানেন, শয়তানটা সবে খাবার টেবিলে বসেছে এমন সময় বাছার আমার ঘুম ভেঙে যায় আর ককিয়ে ওঠে। আমার তো বুকের ভিতরটা দুরদুর করে উঠল। শব্দটা শুনতে পেয়ে যায় শয়তান। আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ বুড়ি, কে ককাচ্ছে বলো তো?' মাথা নুইয়ে আমি বলি, 'হুজুর, আমার ভাইঝি। অসুখ করেছে ওর। এক সপ্তাহেরও ওপর ও শয্যাশায়ী।' 'তোমার ভাইঝির কি ছুক্‌রী

বয়েস?' 'ছুক্‌রী, হুজুর।' 'তা হলে বুড়ি, তোমার ভাইঝিকে একবার নিয়ে এসো তো দেখি।' শুনে আমার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে থাকে। কিন্তু কী আর করা যাবে, কোনো উপায় নেই। বলি, 'জো হুকুম হুজুর কিন্তু মেয়েটার যে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হুজুরের কাছে আসবে কী করে?' 'ঠিক আছে বুড়ি, আমি নিজেই গিয়ে তাকে দেখব।' বলতে না বলতে শয়তানটা একেবারে ভিতরে গিয়ে ঢোকে। তারপর কী হল জানেন? পর্দাটা সরিয়ে বাজপাখির মতো চোখে তাকিয়ে দেখল শুধু — বাস্‌ আর কিছু নয়! ভগবানের অশেষ দয়া! সত্যি কথা বলতে কি, ওদিকে আমার স্বামী আর আমি তো শহীদের মতো মরব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। আর কপাল বলতে হবে যে বাচ্ছা আমার লোকটাকে চিনতে পারে নি। হায় ভগবান! পোড়া চোখে এ সব দেখবার জন্যেই কিনা বেঁচে রইলাম! কী আর বলি, বেচারি ইভান কুজমিচ! কে ভাবতে পেরেছিল! আর ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্‌না! ইভান ইগ্‌নাতিচ! সে কী দোষ করেছিল!.. আর আপনাকে যে কী ভেবে ছেড়ে দিলে কে জানে? আলেক্সেই ইভানভিচ শ্‌ভাব্রিনের কাণ্ড দেখলেন তা? কসাকের মতো চুল কাটা হয়েছে আর ওদের সঙ্গে এসে বসেছে আমাদের বাড়িতে, খানাপিনা চলছে! লোকটার পেটে পেটে শয়তানি! যখন আমি বললাম যে আমার ভাইঝির অসুখ, সে কী চাউনি তার! যদি একবার দেখতেন! যাই হোক, তবুও যে সত্যিকারের পরিচয় সে বলে দেয় নি, তাতেই তার কাছে কৃতজ্ঞ।' এই সময়ে বাড়ির ভিতর থেকে মদে-বেসামাল অতিথিদের কোলাহল আর পাদ্‌রি গেরাসিমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অতিথিরা মদ চাইছে আর গৃহস্বামী খোঁজ করছেন গৃহকর্ত্রীর। পাদ্‌রির স্ত্রী অস্থির হয়ে উঠে বললেন, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, আপনি বাড়ি চলে যান। এখন আপনার দিকে মন দেবার সময় নেই। শয়তানের দল খানাপিনায় মেতেছে। এখন ওদের মদে-বেসামাল অবস্থা; এ সময়ে আপনি যদি ওদের সামনে পড়ে যান তা হলে আর রক্ষে নেই। বিদায় পিওতর আন্দ্রেইচ। যা হবার তা হবেই। হয়ত ভগবান আমাদের পায়ে ঠেলবেন না।'

পাদ্‌রির স্ত্রী ভিতরে চলে গেলেন। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে আমি ফিরে গেলাম আমার কোয়ার্টারে। ময়দানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার চোখে

পড়ল, একদল বাশ্‌কির ফাঁসিমঞ্চের চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে আর ফাঁসিতে ঝোলানো শরীরগুলোর পা থেকে টেনে টেনে জুতো খুলবার চেষ্টা করছে। রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলে উঠল কিন্তু অতিকষ্টে আমি নিজেকে সংযত করলাম। আমি ভালো করেই জানি যে এ সব ব্যাপারে বাধা দিতে যাওয়াটা একেবারেই অর্থহীন। ডাকাতের দল কেল্লার সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছে, অফিসারদের কোয়ার্টারগুলো লুটপাট করছে। সর্বত্র শোনা যাচ্ছে মদে-বেসামাল বিদ্রোহীদের হুঙ্কার আর গর্জন। আমি বাড়ি গেলাম। আমার অপেক্ষায় সাভেলিচ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, 'ভগবানের দয়ায় ফিরে এসেছ যা হোক। আমার তো ভাবনা হচ্ছিল যে তুমি বোধ হয় আবার এই শয়তানদের কবলে পড়েছ। দাদাবাবু, এদিকে কী কাণ্ড হয়েছে দেখো গে যাও। পাজীগুলো আমাদের সমস্ত জিনিস লুঠ করে নিয়ে গেছে — জামাকাপড়, থালাবাটি, কিচ্ছুটি ফেলে যায় নি! তা কী আর করা যাবে! ভগবানের অশেষ দয়া যে ওদের কবল থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে তুমি ফিরে আসতে পেরেছ! দাদাবাবু, দলের সর্দারটিকে চিনতে পেরেছ তো?'

'না, চিনতে পারি নি। কে সে?'

'তুমি বলছ কি দাদাবাবু! সেই মাতাল লোকটাকে ভুলে গেলে? সেই যে সরাইখানায় তোমার খরগোসের চামড়ার কুর্তাটা হাতিয়েছিল? ইস্‌, একেবারে নতুন ছিল কুর্তাটা আর জানোয়ারটা কিনা সেটা গায়ে দিতে গিয়ে একেবারে পট্‌ পট্‌ করে ছিঁড়ে ফেললে।'

আমি একেবারে থ'। সত্যিই, সেই পথপ্রদর্শকের সঙ্গে পুগাচেভের চেহারার সাদৃশ্যটা বিস্ময়কর। এবার আর কোনো সন্দেহই রইল না যে পুগাচেভ ও সেই পথপ্রদর্শকটি অভিন্ন ব্যক্তি, বুঝতে পারলাম, কেন সে আমায় মার্জনা করেছে। ঘটনার এই আশ্চর্য যোগাযোগ দেখে অবাক না হয়ে পারি নি। একটা ভবঘুরেকে দেওয়া ছেলেবেলাকার একটা জামা বাঁচিয়ে দিলে আমাকে ফাঁসির দড়ি থেকে। আর একদিন যে মাতাল লোকটা এক সরাইখানা থেকে আর এক সরাইখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই কিনা আজ দুর্গের পর দুর্গ আক্রমণ করছে এবং রাষ্ট্রের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে তুলছে!

'দাদাবাবু, কিছু খাবে তো বলো!' স্বাভাবিক অভ্যাসবশে সাভেলিচ জিজ্ঞেস করল, 'ঘরে অবশ্য কিছু নেই। তবে যা হোক কিছু খুঁজে পেতে এনে রান্না চাপিয়ে দিচ্ছি।'

সাভেলিচ চলে যেতেই আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম। এখন কী করব আমি? এই দুর্বৃত্তের আওতায় কেল্লাতেই থেকে যাওয়া বা ওর দলের সঙ্গে সঙ্গে চলা — সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসারের পক্ষে দু-কাজই সমান অমর্যাদার। কর্তব্যের ডাকে যদি সাড়া দিতে হয় তবে আমার উচিত এমন জায়গায় গিয়ে আমার অস্তিত্ব জানানো যাতে স্বদেশের এই দুর্দিনে এখনো আমার শক্তি নিয়োজিত হতে পারে... কিন্তু আমার প্রেমের দাবি আমাকে জোর করে মারিয়া ইভানভ্নার কাছে ধরে রাখতে চাইছে — যাতে আমি ওর ত্রাণকর্তা ও রক্ষক হতে পারি। আমি বুঝতে পারছি, অবস্থার দ্রুত ও অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবে — তা সত্ত্বেও মারিয়া ইভানভনার আশঙ্কাজনক অবস্থার কথা চিন্তা করে শিউরে না উঠে পারছি না।

একজন কসাকের আবির্ভাবে আমার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। কসাকটি ছুটতে ছুটতে এসে জানাল যে, 'মহান জার তোমাকে তাঁর সামনে হাজির হতে হুকুম করেছেন।' যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে হবে?'

কসাকটি জবাব দিল, 'অধিনায়কের বাড়িতে। খাওয়াদাওয়ার পরে প্রভু আমাদের স্নানঘরে চলে গেলেন আর এখন তিনি বিশ্রাম করছেন। হুজুর, লক্ষণ দেখে মনে হয়, উনি মস্ত লোকই বটে, খেতে বসে দু-দুটো ভাজা শুয়োরের ছানা খেয়েছেন! আর স্নান করলেন এমন গরম জলে যে তারাস কুরচ্কিন পর্যন্ত সইতে পারল না; গা ঘসে দেবার ভার ফোম্কা বিক্বায়েভকে দিয়ে এসে ঠান্ডা জলেও নিজেকে সামলাতে বেগ পেয়েছে। আপনি যাই বলুন — ওনার সমস্ত চালচলনই একেবারে বাদশাহী। শুনেছি, স্নানঘরে নাকি উনি বুকে জারের চিহ্ন দেখিয়েছেন। একদিকে জোড়ামাথার ঈগলপাখি, প্রায় একটা পাঁচ কোপেকের মতো বড়ো; আর অন্যদিকে ওনার নিজেরই ছবি।'

কসাকটির মতের বিরুদ্ধাচরণ করাটা আমি প্রয়োজন মনে করি নি। অধিনায়কের বাড়িতে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লাম ওর সঙ্গে। পুগাচেভের

সঙ্গে আমার এই আসন্ন সাক্ষাৎকারের পরিণতি কী হতে পারে, তাই নিয়ে মনে মনে জল্পনা-কল্পনা করছিলাম। পাঠক অনায়াসেই অনুমান করে নিতে পারেন যে আমি একেবারে নির্বিকার থাকতে পারি নি।

অধিনায়কের বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যা ঘনায়মান। নিজের বলিগুলো সমেত ভয়াবহ রকমের কালো হয়ে উঠেছে ফাঁসিমঞ্চ। বেচারি ভাসিলিসা ইয়েগোরভ্নার মৃতদেহ তখনো পড়ে আছে অলিন্দের নিচে আর সেই অলিন্দের সামনে দুজন কসাক পাহারারত। যে কসাকটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে আমার আগমন-সংবাদ জানাবার জন্যে ভিতরে চলে গেল এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে আমাকে নিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। এই ঘরেই আগের দিন ভারি কোমল একটা মূর্ছনার মধ্যে মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়েছি।

ঘরে ঢুকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের মুখোমুখি হতে হল। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল, সারা টেবিলে বোতল আর গ্লাসের ছড়াছড়ি, আর জনদশেক কসাক-সর্দারে পরিবৃত হয়ে পুগাচেভ বসে আছে। কসাক-সর্দারদের মাথায় লম্বা টুপি, পরনে রঙিন শার্ট। নেশায় উত্তেজিত সবাই, লাল হয়ে উঠেছে মুখ, চোখগুলো চকচক করছে। কিন্তু শ্ভাব্রিন ও মাক্সিমিচ এই দলে নেই যদিও এই দুই বিশ্বাসঘাতক সম্প্রতি ওদের দলভুক্ত। আমাকে দেখে পুগাচেভ বলল, 'আ, হুজুর এসেছেন স্বাগত, স্বাগত, মান্যি করছি, বসা হোক।' ঘরের মধ্যে যারা হুল্লোড় করছে তারা জায়গা ছেড়ে দিল আমার জন্যে। নিঃশব্দে আমি গিয়ে বসলাম টেবিলের একধারে। আমার পাশের আসনে বসে ছিল একজন কসাক যুবক, সুঠাম সুন্দর চেহারা। সে আমার জন্যে একগ্লাস সাধারণ মদ ঢাললে, আমি অবশ্য সেই মদ স্পর্শও করি নি। কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকের লোকজনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। টেবিলের মাথার দিকে বসে আছে পুগাচেভ, তার কনুই টেবিলের ওপরে রাখা, হাতের মস্ত চওড়া মুঠোর ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে তার কালো দাড়ি। তার মুখের আদলটা নিখুঁত, দেখে বেশ ভালো লাগে, তাতে হিংস্রতার চিহ্ন নেই। বছর পঞ্চাশেক বয়সের একটি লোকের সঙ্গে ঘন ঘন কথা বলছে সে, কখনো তাকে ডাকছে কাউন্ট বলে, কখনো তিমোফেইচ, কখনো বা শুধু কাকা। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের

সাথীর মতো ব্যবহার, তাদের নেতার সঙ্গে ব্যবহারেও বিশেষ কোনো তারতম্য আছে বলে মনে হয় না। আলোচনা চলছে সকালবেলার আক্রমণ, বিদ্রোহের সাফল্য এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে। সকলেই জাঁক করছে, নিজের নিজের মত প্রকাশ করছে, পুগাচেভের মতের বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করতেও কোনো রকম সঙ্কোচ নেই। এই অদ্ভুত সমর-পরিষদের আলোচনায় স্থির হল যে অভিযান করা হবে ওরেনবুর্গের দিকে। পরিকল্পনাটা ছিল খুবই দুঃসাহসিক — যা আর একটু হলেই মণ্ডিত হতে পারত সর্বনাশা সাফল্যে। ঘোষণা করা হল যে পরের দিন অভিযান শুরু হবে। পুগাচেভ বলল, 'ভাইসব, এবার এসো, শুতে যাবার আগে একটু গান গাওয়া যাক। আমার পেয়ারের সেই গানটা। চুমাকোভ! তুমিই শুরু করো!' আমার পাশে যে লোকটি বসেছিল, সরু গলায় গাইতে শুরু করল গুণ-টানিয়েদের বিষণ্ণ এক গান, আর সকলে যোগ দিলে সমস্বরে:

হে মা সবুজ ওক বন, কোরো না শনশন,
বাধা দিয়ো না আমাকে, এই সাহসী জোয়ানকে তার ভাবনা ভাবতে।
কাল যে আমার এই সাহসী জোয়ানের জেরা
ভয়ংকর বিচারক, খোদ জারের কাছে।
জার-সম্রাট আমায় তখন শুধাবে:
বল রে বাছা, বল রে চাষার ছেলে,
চুরি করিস কার সঙ্গে, কে থাকে লুঠপাটে,
সঙ্গীসাথী অনেক নাকি তোর?
বলছি তোমায়, আশা-ভরসা ধর্মাবতার জার,
সত্যি কথা বলছি তোমায়, সব সত্যি কথাই,
সঙ্গীসাথীর সংখ্যা আমার মাত্র মোটে চার:
আমার প্রথম সঙ্গী হল অন্ধকার রাত,
দ্বিতীয় সঙ্গী ইস্পাতের ছোরা,
তৃতীয় সঙ্গী, সে আমার তেজী ঘোড়া,
চতুর্থ সঙ্গী আমার টান-টান ধনুক,
আমার দূতেরা হল তীক্ষ্ন যত তীর।
আশা-ভরসা ধর্মাবতার জার বলবে আমায়:
বলিহারি তোকে বাছা চাষার ছেলে;

জানিস তুই চুরি করতে, জানিস জবাব দিতেও!
সেই জন্যে, তোকে বাছা, দেব পুরস্কার
উঁচু উঁচু কোঠা বাড়ির মাঝখানেতে মাঠে,
শক্ত দুটো খুঁটি, তাদের ওপরে আড়কাঠ।

পল্লিগীতিটির বিষয় ফাঁসিকাঠ, যারা গাইছে তারা নিজেরাও শেষ পর্যন্ত মরবে ফাঁসিকাঠেই — গানটা শুনে আমার মনের অবস্থা যে কী হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। গায়কদের ভয়ঙ্কর চেহারা, সুরেলা গলা, গানের যে কথাগুলো এমনিতেই অর্থময়, তাতে একটা বিষণ্ন ব্যঞ্জনা — সব মিলিয়ে আমার মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি হল তা প্রায় একটা আতঙ্কের মতো।

অতিথিরা মদ খেল আর এক গ্লাস করে। তারপর পুগাচেভের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমিও ওদের সঙ্গে যেতে চাইছিলাম। কিন্তু পুগাচেভ বলল, 'বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' মুখোমুখি কেবল আমরা দুজনে।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ রইলাম। পুগাচেভ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। পাষণ্ডতা আর তামাসার আশ্চর্য একটা ভাব ফুটিয়ে কোঁচকাচ্ছে বাঁ চোখটা। শেষ পর্যন্ত এমন অকপট ফুর্তিতে সে হো-হো শব্দে হেসে উঠল যে তার দিকে তাকিয়ে আমিও হাসতে শুরু করে দিলাম, জানি না কেন।

সে বলল, 'কী হুজুর, আমার লোকেরা যখন তোমার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিচ্ছিল তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিলে, না? কবুল করে ফেলো? আমি হলফ করে বলতে পারি যে, ভয়ে তোমার মাথার ঠিক ছিল না! আর তোমার চাকরটি যদি না থাকত তা হলে এতক্ষণে তুমিও ফাঁসিকাঠে ঝুলে থাকত। বুড়ো ইঁদুরটাকে চিনতে আমার একটুও দেরি হয় নি। হুজুর, ভেবেছিলে কি, যে লোকটি তোমাকে পথ দেখিয়ে সরাইখানায় নিয়ে গিয়েছিল সে হচ্ছে মহান জার!' (এই বলে সে চোখেমুখে বেশ একটা ভারিক্কি ও রহস্যজনক ভাব ফুটিয়ে তুলল।) 'আমার কাছে তুমি খুবই অপরাধী। কিন্তু শত্রুর কাছ থেকে যখন লুকিয়ে থাকতে বাধ্য

হয়েছিলাম তখন আমার উপকার করেছ বলে মার্জনা করেছি। আরো কত কী দেখবে দাঁড়াও-না! আমার রাজ্য ফিরে পাবার পর তোমার জন্যে আরো অনেক কিছুই আমি করব। কথা দেবে কি, আমার প্রতি তুমি বিশ্বস্ত থাকবে?'

জুয়াচোরটার এই প্রশ্ন আর ধৃষ্টতা দেখে আমার এত মজা লাগল যে আমি মুচকিয়ে না হেসে থাকতে পারলাম না।

ভ্রূকুটি করে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি হাসছ কেন? তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না যে আমিই হচ্ছি মহান জার? সত্যি কথা বলো।'

আমি উভয় সংকটে পড়লাম। এই ভবঘুরেটাকে সর্বময় প্রভু হিসেবে কিছুতেই স্বীকার করে নেওয়া চলে না। সেটা হবে আমার পক্ষে একটা অমার্জনীয় কাপুরুষতা। আর যদি লোকটাকে মুখের ওপরে জালিয়াৎ বলি তা হলে হয়ত আমার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনা হবে। ক্রোধের প্রথম উত্তেজনায় লোকজনের চোখের সামনে ফাঁসিকাঠের নিচে আমি যা করতে রাজি ছিলাম, এখন সেটা মনে হল নিতান্তই অর্থহীন বাহাদুরি ফলানো। দ্বিধা করতে লাগলাম। নীরস দৃষ্টিতে আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছিল পুগাচেভ। শেষকালে মানবিক দুর্বলতার ওপরে জয়ী হল কর্তব্যবোধ। (এই মুহূর্তটির কথা ভেবে এখনো আমি আত্মশ্লাঘা বোধ করি।) পুগাচেভকে আমি বললাম, 'শোনো, আমি পুরোপুরি সত্যি কথাই বলব। তুমি নিজেই ভেবে দ্যাখো, তোমাকে সর্বময় প্রভু বলে স্বীকার করে নিতে আমি পারি কি? তুমি বিবেচক লোক — আমি যে চালাকি খাটাচ্ছি তা তুমি ধরে ফেলতে।'

'তা হলে কী বলতে চাও তুমি? কে আমি?'

'ঈশ্বর জানেন তুমি কে? কিন্তু তুমি যে-ই হও না কেন, এক সর্বনাশা খেলায় মেতেছ তুমি।'

চকিতে আমার দিকে একবার তাকিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তা হলে তুমি বিশ্বাস করো না যে আমিই জার পিওতর ফিওদরোভিচ? বেশ কথা! তবে জানো তো — সাহস যার জয় তার? আগেকার দিনে গ্রিশ্‌কা ওত্রেপিয়েভ* কি রাজত্ব করে যায় নি? তুমি আমার সম্পর্কে যা খুশি ধারণা করো, কিন্তু আমার সঙ্গেই থেকে যাও। আমি যা-ই হই না কেন তাতে

তোমার কী যায় আসে? পাদ্রি যেই হোক, তাকেই ডাকি বাবা। বিশ্বস্ততা আর আন্তরিকতার সঙ্গে তুমি আমার অধীনে কাজ করো, দেখবে আমি তোমাকে ফিল্ড্-মার্শাল ও প্রিন্স বানিয়ে দেব। কী বল, রাজি?'

দৃঢ় স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'না। অভিজাত বংশে আমার জন্ম, সম্রাজ্ঞীর প্রতি আমি আনুগত্যের শপথ নিয়েছি। তোমার অধীনে আমি কিছুতেই কাজ করতে পারি না। তুমি যদি সত্যিই আমার শুভার্থী হও, তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ওরেনবুর্গে চলে যাই।'

পুগাচেভ মনে মনে কী ভাবল। বলল, 'যদি তোমাকে আমি যেতে দিই তা হলে অন্তত এই প্রতিজ্ঞাটুকু তুমি করে যেতে পারো কিনা যে আমার বিরুদ্ধে তুমি কখনো অস্ত্রধারণ করবে না!'

আমি জবাব দিলাম, 'তা কী করে হয়? তুমি ভালো করেই জানো যে নিজের ইচ্ছায় চলবার উপায় নেই আমার। আমার ওপর তোমার বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরার হুকুম হলে — ধরব, উপায় কী। এখন তুমি নিজেই সেনাপতি, অধীনদের কাছ থেকে বাধ্যতা দাবি করো তুমি। সেটা কী রকম হবে যদি আমি হুকুম মানতে না চাই, যখন দরকার হবে হুকুম মানার। এখন তোমার হাতেই আমার জীবন; যদি ছেড়ে দাও, তোমাকে ধন্যবাদ; যদি ফাঁসিকাঠে ঝোলাও, ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন, যা সত্য, তা-ই আমি তোমায় বলেছি।'

আমার অকপটতায় বিস্মিত হল পুগাচেভ। আমার কাঁধের ওপরে একটা চাপড় মেরে সে বলল, 'বেশ, তাই হোক! আমি শাস্তি দিলে শাস্তিই দিই, ক্ষমা করলে ক্ষমাই করি। তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো, যা খুশি করতে পারো। আগামী কাল যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেও। এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোও। আমার নিজেরও ঘুম পাচ্ছে।'

পুগাচেভকে রেখে আমি বাড়ির বাইরে এলাম। চুপচাপ তুহিন রাত্রি। আকাশে চাঁদ আর তারা জ্বলজ্বল করছে; সেই আলো এসে পড়েছে চত্বরে, ফাঁসিমঞ্চে। অন্ধকার কেল্লা, কোথাও কোনো সাড়শব্দ নেই। শুধু আলো দেখা যাচ্ছে সরাইখানায়, সেখানে একদল লোকের মাতামাতি এখনো শেষ হয় নি, শোনা যাচ্ছে তাদের চিৎকার। পাদ্রির বাড়ির দিকে

আমি তাকালাম। বাড়ির দরজা আর জানলার খড়খড়ি বন্ধ, দেখে মনে হয় বাড়িটার মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।

কোয়ার্টারে ফিরে এসে দেখলাম, আমার অপেক্ষায় বসে থেকে সাভেলিচ হা-হুতাশ করছে। আমার মুক্তির খবর শুনে তার এত আনন্দ হল যে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন এঁকে সে বলল, 'হে ভগবান, হে সৃষ্টিকর্তা, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম! সকাল হলেই আমরা এই কেল্লা ছেড়ে যেদিকে মন চায় চলে যাব। আর দাদাবাবু, তোমার জন্যে যা হোক কিছু রান্না করে রেখেছি, খেয়ে নাও। তারপর নিশ্চিন্ত মনে ঘুম দাও সকাল পর্যন্ত — ঠাকুরের দয়া হয়েছে, আর ভয় কি!'

সাভেলিচের কথামতো কাজ করলাম। খেলাম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। তারপর শরীরে ও মনে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম খালি মেঝের ওপরেই।

নবম অধ্যায়

বিচ্ছেদ

তব সাথে পরিচয়
ছিল সে মধুর,
ছেড়ে যেতে প্রাণে জাগে
বিষাদ বিধুর।

খেরাস্কোভ।*

ভোরবেলা ড্রামের শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি সোজা গিয়ে হাজির হলাম সমাবেশের জায়গায়। ফাঁসিমঞ্চের পাশে পুগাচেভের লোকজন ইতিমধ্যেই ভিড় দিয়ে দাঁড়িয়েছে। গতকাল যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল তারা তখনো ঝুলছে ফাঁসিমঞ্চে। কসাকরা চেপেছে ঘোড়ার পিঠে, সৈন্যদের হাতে রাইফেল। ঝাণ্ডা উড়ছে। কামান-টানা গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে কয়েকটা কামান; তার মধ্যে আমাদের কামানটাও চিনতে পারলাম। ভুয়ো-জারের অপেক্ষায় বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে। ভারি চমৎকার সাদা একটি কিরগিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে অধিনায়কের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন কসাক। অধিনায়ক-পত্নীর মৃতদেহ তখনো পড়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্যে আমি তাকালাম। মৃতদেহটাকে একপাশে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। তারপর একসময়ে পুগাচেভ বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। মাথার টুপি খুলল সবাই। অলিন্দে দাঁড়িয়ে পুগাচেভ অভিবাদন জানাল সকলকে। সর্দারদের মধ্যে একজন এসে তার হাতে তামার মুদ্রা ভর্তি একটা থলি দিয়ে গেল। থলির মধ্যে থেকে মুঠো মুঠো মুদ্রা নিয়ে পুগাচেভ ছড়াতে লাগল ভিড়ের মধ্যে। আর চিৎকার করে সেই মুদ্রা কুড়োবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মানুষগুলো। হাত-পা ভেঙে বসল বেশ কিছু লোক।

ইয়েকাতেরিনা কারাম্‌জিনা (১৭৮০-১৮৫১) —
ঐতিহাসিক কারাম্‌জিনের স্ত্রী। ১৮৪০-এর দশকের ছবি

কনস্তান্তিন দানজাস (১৮০১-১৮৭০) — লিৎসেইয়ে
পাঠকালে পুশকিনের সতীর্থ এবং দাঁতেসের সঙ্গে ডুয়েলে
পুশকিনের দোসর। ১৮৪০-এর দশকের ড্রইঙ

১৮৩৭ সালের ২৭ জানুয়ারি (৮ ফেব্রুয়ারি) দাঁতেসের সঙ্গে পুশকিনের ডুয়েল। নাউমোভ অঙ্কিত ছবি। ১৮৮৪

স্‌ভিয়াতোগর্স্ক মঠে পুশকিনের সমাধি। লিথোগ্রাফ। ১৮৩৭

পুগাচেভের যারা সেরা দোসর, তারা এসে ঘিরে দাঁড়াল তাকে। এই দোসরদের দলে শ্ভাব্রিনও ছিল। শ্ভাব্রিনের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার। চোখেমুখে আমার যে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছিল তা দেখে আন্তরিক বিদ্বেষ আর চেষ্টাকৃত অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল শ্ভাব্রিন। ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে চোখ পড়ে গেল পুগাচেভের, ইঙ্গিতে আমাকে কাছে ডেকে বলল, 'আমার কথাটা শুনে রাখো। এখান থেকে তুমি সোজা ওরেনবুর্গে চলে যাও। ওরেনবুর্গের শাসনকর্তা আর সেনাপতিদের বলো গিয়ে যে সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আমি ওখানে হাজির হচ্ছি। ওদের পরামর্শ দেবে, ওরা যেন শিশুর মতো ভালোবাসা ও বাধ্যতা নিয়ে আমার সম্বর্ধনার আয়োজন করে রাখে। নইলে কুটিল মৃত্যুর হাত থেকে ওদের কারও রেহাই নেই। তোমার যাত্রা শুভ হোক হুজুর!' তারপর শ্ভাব্রিনকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'নওজোয়ানরা, এই হচ্ছে তোমাদের নতুন অধিনায়ক! সমস্ত ব্যাপারে একে মেনে চলো। তোমাদের ভার এবং কেল্লার ভার এরই ওপর থাকবে এবং কোনো কিছু হলে একেই জবাবদিহি করতে হবে আমার কাছে।' কথাগুলি শুনে আতঙ্কে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে শুকিয়ে গেল। এই কেল্লার অধিনায়ক হবে শ্ভাব্রিন! মারিয়া ইভানভনা পড়বে গিয়ে ওর হাতে! হায় ভগবান, কী উপায় হবে মেয়েটার? অলিন্দ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল পুগাচেভ। ঘোড়াটাকে নিয়ে যাওয়া হল তার কাছে। কসাকরা সাহায্য করবার সময় পায় নি, তার আগেই পুগাচেভ একলাফে অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিতে চেপে বসেছে ঘোড়ার জিনের ওপরে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখলাম যে সাভেলিচ ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে পুগাচেভের হাতে একটা কাগজ দিচ্ছে। ব্যাপারটা কী হতে পারে তা আমি অনুমান করতে পারলাম না। শুনতে পেলাম, পুগাচেভ সদম্ভে জিজ্ঞেস করছে, 'এটা কী?' সাভেলিচ জবাব দেয়, 'পড়ে দেখো, তা হলেই বুঝতে পারবে।' পুগাচেভ কাগজটা হাতে নিল এবং চোখেমুখে যথোচিত ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে তুলে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল কাগজটির দিকে, শেষকালে বলল, 'বড়ো বিশ্রী পেঁচানো পেঁচানো হাতের লেখা তোমার। এই লেখার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারা আমাদের এই

জারের চোখের কর্ম নয়। আমার পয়লা-সেক্রেটারি গেল কোথায়?'

কর্পোরালের পোশাক-পরা একজন যুবক দ্রুত পায়ে পুগাচেভের কাছে ছুটে গেল। 'চেঁচিয়ে পড়ো তো।' তার হাতে কাগজটা দিয়ে বলল ভুয়ো-জার। কী মতলব নিয়ে সাভেলিচ পুগাচেভের কাছে চিঠি লিখেছে তা জানবার জন্যে আমি ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। পুগাচেভের পয়লা-সেক্রেটারি শব্দের প্রত্যেকটি মাত্রাকে আলাদা-আলাদা করে বানান করে নিচের এই কথাগুলো চেঁচিয়ে পড়ল:

'দুটি পোশাক, একটি ক্যালিকো কাপড়ের, অপরটি ডোরা-কাটা সিল্কের। ছয় রুব্‌ল।'

ভ্রূকুটি করে পুগাচেভ জিজ্ঞেস করল, 'এর মানে কী?'

শান্ত স্বরে সাভেলিচ জবাব দিল, 'আরো পড়ে যেতে বলো।'

পয়লা-সেক্রেটারি পড়ে চলল:

'চমৎকার সবুজ একটা উর্দি। সাত রুব্‌ল।

'সাদা কাপড়ের ট্রাউজার। পাঁচ রুব্‌ল।

'হাতাসমেত বারোটি ওলন্দাজ শার্ট। দশ রুব্‌ল।

'চায়ের বাসন-কোসন বোঝাই একটি বাক্স। দুই রুব্‌ল পঞ্চাশ কোপেক...'

পুগাচেভ থামিয়ে দিল, 'এ সবের অর্থ কি? তোমার চায়ের বাসন-কোসন বোঝাই বাক্স বা ট্রাউজার বা জামার হাতার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

গলা খাঁকারি দিয়ে সাভেলিচ বোঝাতে শুরু করল, 'ব্যাপারটা কী জানো? শয়তানের দল আমার মনিবের যে সব সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে গেছে এটা তারই একটা ফিরিস্তি...'

'শয়তানের দল মানে?' হুঙ্কার ছাড়ল পুগাচেভ।

সাভেলিচ বলল, 'ক্ষমা করো, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। শয়তানের দল নয় তো। তোমার লোকজন। তারা আমাদের বাড়ি লন্ডভন্ড করে সমস্ত সম্পত্তি নিয়ে চলে গেছে। শয়তানের দল বলেছি বলে রাগ করো

না। চার-চারটি পা থাকা সত্ত্বেও ঘোড়া মাঝে মাঝে হোঁচট খায়। ফিরিস্তিটা পড়ে যেতে বলো।'

'পড়ো,' পুগাচেভ বলতেই সেক্রেটারি পড়ে চলল:

'তুলো-ভরা সুতীর লেপ একটা। তাফ্‌তা লেপ একটা। চার রুব্‌ল।

'শেয়ালের লোমের কিনার-দেওয়া লাল কাপড়ের কোট একটা। চল্লিশ রুব্‌ল।

'খরগোসের চামড়ার কুর্তা একটা। এই কুর্তাটি হুজুরকে সরাইখানায় দেওয়া হয়েছিল। পনেরো রুব্‌ল।'

'এ সবের অর্থ কী?' দু-চোখে আগুন ধরিয়ে চিৎকার করল পুগাচেভ।

স্বীকার করতেই হবে যে বেচারি সাভেলিচের কথা শুনে সেই মুহূর্তে আমার আতঙ্ক হয়েছিল। পুগাচেভের কথায় আরো বিশদ ব্যাখ্যা দিতে যাচ্ছিল সাভেলিচ, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে পুগাচেভ বলল, 'তোমার সাহস তো কম নয়! এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করতে আসো!' সেক্রেটারির হাত থেকে কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে সাভেলিচের মুখের ওপরে ছুঁড়ে বলতে থাকল, 'ওরে বুড়ো গণ্ডমূর্খ! সামান্য কয়েকটা জিনিস নিয়ে গেছে তাতেই এত আক্ষেপ! আমার হুকুম না মানবার জন্যে এখানে আর যাদের আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছি, তাদের সঙ্গে সঙ্গে তোকে আর তোর মনিবকেও ঝুলিয়ে দিতে পারতাম জানিস? কিন্তু তোদের দুজনেরই প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছি। সে জন্যে কোথায় বাকিটা জীবন আমার আর আমার দলের মঙ্গলের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবি বুড়ো ইঁদুর — তা না করে এই ফিরিস্তি নিয়ে এসেছিস? খরগোসের চামড়ার কুর্তা! খরগোসের চামড়ার কুর্তা কাকে বলে তা দেখিয়ে দিচ্ছি! জানিস, জ্যান্ত অবস্থায় তোর চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে সেই চামড়া দিয়ে কুর্তা বানিয়ে দিতে পারি!'

সাভেলিচ জবাব দিল, 'তোমার যেমন অভিরুচি করবে। আমি আমার মনিবের গোলাম মাত্র। মনিবের সম্পত্তি খোয়া গেলে আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।'

স্পষ্টই বোঝা গেল যে পুগাচেভ দিলদরিয়া মেজাজে আছে। আর

বাক্যব্যয় না করে সে সামনের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। শ্‌ভাব্রিন ও অন্য সর্দাররা চলল তার পিছনে পিছনে। সুশৃঙ্খলভাবে দলটি বেরিয়ে গেল কেল্লা থেকে। পুগাচেভের যাওয়া দেখবার জন্যে মানুষ ভিড় করে সামনে এগিয়ে গেছে। আমি ও সাভেলিচ ছাড়া ময়দানে আর কোনো জনপ্রাণী নেই। সাভেলিচের হাতে রয়েছে সেই ফিরিস্তিটা, গভীর আক্ষেপের সঙ্গে ফিরিস্তিটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে সে।

সাভেলিচ ভেবেছিল, পুগাচেভের সঙ্গে আমার যখন খাতির তখন নিশ্চয়ই কিছুটা সুযোগ-সুবিধা করে নেওয়া যাবে। কিন্তু ওর এই সাধু উদ্দেশ্য সফল হল না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ওর এই অসঙ্গত ব্যগ্রতার জন্যে ওকে একটু ধমক দিই। কিন্তু ধমক দিতে গিয়ে আমি হেসে ফেললাম। সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু হাসছ বটে। কিন্তু আবার যখন নতুন করে ঘরসংসার পাততে হবে তখন বুঝবে এটা সত্যি সত্যিই হাসির ব্যাপার কিনা।'

মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আমি পাদ্‌রির বাড়িতে গেলাম। পাদ্‌রির স্ত্রী খুবই খারাপ খবর শোনালেন আমাকে। রাত্রিবেলা মারিয়া ইভানভনার প্রচণ্ড জ্বর এসেছে আর এখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর প্রলাপ বকছে। পাদ্‌রির স্ত্রী আমাকে মারিয়া ইভানভনার ঘরে নিয়ে গেলেন। পা টিপে টিপে আমি বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, অবাক হলাম ওর চেহারার পরিবর্তন দেখে। ও আমাকে চিনতে পারল না। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ওর বিছানার পাশে। পাদ্‌রি গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী আমাকে নানা রকম সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন কিন্তু তার কিছুই কানে ঢুকছে না আমার। বিষণ্ণ চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করেছে। বাপ-মা হারা এই হতভাগিনীকে অসহায় অবস্থায় একদল হিংস্র বিদ্রোহীর মাঝখানে ফেলে যেতে হবে অথচ আমার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই — ভাবতেই আতঙ্ক হচ্ছে আমার। শ্‌ভাব্রিন — বিশেষ করে শ্‌ভাব্রিন — একটা বিভীষিকার মতো গ্রাস করেছে আমার কল্পনাকে। ভুয়ো-জার তাকে কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে দিয়ে গেছে, সে এখন এই কেল্লার অধিনায়ক, আর এই কেল্লাতেই থাকবে এই নিরীহ হতভাগিনী, তার ঘৃণার পাত্রী — সব কিছু সে করতে পারে। কিন্তু কী আমি করি?

কেমন করে সাহায্য করি ওকে? কী করে ওকে মুক্ত করতে পারি এই দুর্বৃত্তের কবল থেকে? আমার সামনে একটিমাত্র রাস্তা খোলা আছে — ঠিক করলাম অবিলম্বে ওরেনবুর্গে চলে যাব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেলোগর্স্ক কেল্লা মুক্ত করতে হবে এবং যথাসম্ভব সাহায্য করব তাতে। পাদ্রি এবং আকুলিনা পাম্ফিলভনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। আকুলিনা পাম্ফিলভনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালাম যেন তিনি ওর ভার নেন যাকে আমি আমার স্ত্রী বলে গণ্য করছি। বেচারি মেয়ের হাতটা তুলে নিয়ে চুমু খেলাম। আমার চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম ওর হাত। সদর পর্যন্ত আমার সঙ্গে আসতে আসতে পাদ্রির স্ত্রী বললেন, 'বিদায়! বিদায় পিওতর আন্দ্রেইচ! সুসময়ে নিশ্চয় দেখা হবে। আমাদের কথা ভুলে যাবেন না, চিঠিপত্র দেবেন ঘন ঘন। আহা বেচারা মারিয়া ইভানভনা — আপনি ছাড়া ওর সান্ত্বনা বলতে, রক্ষক বলতে আর কেউ নেই।'

ময়দানে বেরিয়ে এসে ফাঁসিমঞ্চের সামনে আমি একটু দাঁড়ালাম। মাথা নোয়ালোম ফাঁসিমঞ্চের উদ্দেশে। তারপরেই কেল্লার এলাকা ছেড়ে এগিয়ে চললাম ওরেনবুর্গের রাস্তা ধরে। সাভেলিচ চলল সঙ্গে সঙ্গে। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে ও।

আপন মনে চিন্তা করতে করতে আমি চলেছি হঠাৎ শুনলাম পিছন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে। তাকিয়ে দেখলাম, একজন কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে কেল্লার দিক থেকে, বাশ্কিরী একটা ঘোড়াকে লাগাম ধরে নিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে এবং দূর থেকে আমাকে থামবার জন্যে ইঙ্গিত করছে। আমি থামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে লোকটি এসে হাজির হল সে আমাদের পূর্ব পরিচিত সেই সার্জেণ্ট। ঘোড়া থেকে নেমে দ্বিতীয় ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে দিয়ে সে বলল, 'হুজুর, আমাদের কর্তা আপনার জন্যে এই ঘোড়াটা পাঠিয়ে দিয়েছেন আর নিজের গায়ের থেকে খুলে এই কোটটা।' (একটা ভেড়ার চামড়ার কোট ঘোড়ার জিনের সঙ্গে আটকানো আছে।) 'আরেকটা জিনিসও তিনি আপনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন,' এই পর্যন্ত বলে সার্জেণ্ট থামে, তার মুখে কথা আটকে যাচ্ছে, '...পঞ্চাশটা কোপেক তিনি দিয়েছিলেন... কিন্তু পথে আসতে আসতে সেগুলো আমার পকেট থেকে পড়ে গেছে। মাপ চাইছি আপনার

কাছে।' আড়চোখে লোকটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে সাভেলিচ বলল, 'পথে আসতে আসতে পড়ে গেছে? বাপু হে, তোমার বুকের কাছটায় যে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে — সেটা কী? বেহায়া কোথাকার!' কিছুমাত্র উদ্বেগ না দেখিয়ে সার্জেণ্ট জবাব দিল, 'আমার বুকের কাছে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে? তা তুমি বুড়ো মানুষ, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন! ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজছে কী জানো? পয়সা নয়, ঘোড়ার লাগাম।' দুজনের কথা কাটাকাটি থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম, 'খুব হয়েছে। যিনি তোমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানিও। আর যে পঞ্চাশটা কোপেক পড়ে গেছে, ফেরার পথে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্‌কা খেও।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ হুজুর! আপনার জন্যে চিরকাল প্রার্থনা করব ভগবানের কাছে!' এই বলে সে বুকের জায়গাটা এক হাতে চেপে ফিরতি পথে ঘোড়া ছুটাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ভেড়ার চামড়ার কোটটা আমি গায়ে দিলাম। তারপর ঘোড়ার ওপরে চেপে সাভেলিচকে বসালাম আমার পিছনে। সাভেলিচ বলল, 'দেখলে তো দাদাবাবু, শয়তানটার কাছে যে আরজি পেশ করেছিলাম তাতে ফল হয়েছে। লজ্জা পেয়েছে চোরটা। অবিশ্যি যে সব জিনিস বাটপাড়রা চুরি করেছে, তা ছাড়া তুমি ভালোমানুষি করে ওকে যা দিয়েছ, দামের দিক থেকে তার অর্ধেকও নয় এই লম্বা-ঠেঙে বাশ্‌কিরী ঘোড়াটা আর এই ভেড়ার চামড়ার কোটটা তবুও যা পাওয়া গেছে তাই ভালো। কাজে লাগবে। কিছু না পাওয়ার চেয়ে বেয়াড়া কুকুরের কাছ থেকে একগোছা লোমও ভালো।'

দশম অধ্যায়

শহর অবরোধ

...দখল রেখে প্রান্তরে ও পাহাড়ে,
শিখর থেকে ঈগল-সম রইল চেয়ে শহরে।
হুকুম দিল ছাউনিটাকে গুলি-গোলায় সাজাতে
রাতের বেলায় আড়াল থেকে শহর মুখো চালাতে।

খেরাস্কোভ।*

ওরেনবুর্গের কাছাকাছি এসে প্রথমেই আমাদের সঙ্গে দেখা হল একদল কয়েদির। তাদের মাথা কামানো, শাস্তিদাতার সাঁড়াশি তাদের মুখগুলিকে বিকৃত করে দিয়েছে। দুর্গের কাছাকাছি অঞ্চলে তারা কাজ করছে আর তাদের কাজের তদারক করছে ছাউনির জনকতক বিকলাঙ্গ সৈন্য। কেউ কেউ পরিখা থেকে গাড়ি বোঝাই আবর্জনা নিয়ে ফেলে আসছে, কেউ কেউ কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে। নগরের দেওয়াল মেরামত করবার জন্যে রাজমিস্ত্রীরা ইট নিয়ে উঠছে র‍্যাম্পার্টের ওপরে। শহরের প্রবেশপথে শান্ত্রীরা আমাদের আটকাল এবং আমাদের পাসপোর্ট দেখতে চাইল। আমি বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আসছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে সার্জেণ্ট আমাকে নিয়ে গেল জেনারেলের বাড়িতে।

জেনারেলের সঙ্গে দেখা হল তাঁর বাগানে। হেমন্তের নিঃশ্বাস আপেল গাছগুলোর পাতা ঝরিয়ে দিয়ে গেছে আর তিনি সেই সব গাছের পরিচর্যা করছেন। একজন বুড়ো মালীর সঙ্গে সযত্নে তিনি গাছগুলোকে খড় দিয়ে ঢেকে দিচ্ছেন। তাঁর চেহারার মধ্যে ফুটে উঠেছে স্থৈর্য, স্বাস্থ্য ও প্রসন্নতার ছাপ। তিনি খুশি হলেন আমাকে দেখে এবং যে সব ভয়ঙ্কর ঘটনাবলি আমি প্রত্যক্ষ করে এসেছি সে সম্পর্কে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে সমস্ত কথা বললাম। গাছের শুকনো ডাল ছাঁটতে

ছাটিতে বৃদ্ধ মনোযোগ দিয়ে শ‌ুনলেন আমার কথা। বেলোগর্স্কের বিষণ্ণ কাহিনী আগাগোড়া বলা হলে তিনি বললেন, 'বেচারি মিরোনভ! কী দ‌ুর্ভাগ্যের কথা! তিনি ছিলেন ভালো অফিসার। আর মাদাম মিরোনভ ছিলেন সদাশয়া নারী, ব্যাঙের ছাতা ন‌ুনে জারাতেন কী চমৎকার! আচ্ছা, ক্যাপটেনের মেয়ে মাশার খবর কী?' জবাবে আমি বললাম যে মেয়েটি পাদ্‌রির স্ত্রীর হেপাজতে কেল্লাতেই রয়ে গেছে। জেনারেল মন্তব্য করলেন, 'না, না, এটা তো ভালো কথা নয়। মোটেই ভালো কথা নয়। ওই ডাকুগ‌ুলো নিয়ম-শ‌ৃঙ্খলা মেনে চলবে সে ভরসা কিছ‌ুতেই রাখা চলে না। বেচারি মেয়েটার কপালে কী আছে কে জানে!' আমি বললাম যে বেলোগর্স্ক কেল্লা এখান থেকে খ‌ুব বেশি দ‌ূরে নয় এবং আমার বিশ্বাস আছে যে বেলোগর্স্কের হতভাগ্য অধিবাসীদের ম‌ুক্তি দেবার জন্যে মান্যবর সৈন্যবাহিনী পাঠাতে বিলম্ব করবেন না। অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জেনারেল বললেন, 'সে দেখা যাবে, দেখা যাবে। বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার সময় এখনো চলে যায় নি। আজ এসো, আমার সঙ্গে একটু চা খাবে। আমার কাছে আজ সমর-পরিষদের বৈঠক হবে। দ‌ুর্বৃত্ত প‌ুগাচেভ আর তার সৈন্যদলের অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল খবর তুমি আমাদের দেবে। আচ্ছা, এবার বিশ্রাম করো গিয়ে।'

আমার জন্যে নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে সাভেলিচ ইতিমধ্যেই ঘরকন্নায় কাজে লেগে গেছে। অধৈর্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। সমর-পরিষদের বৈঠকের ওপর খ‌ুবই নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ জীবন ; স‌ুতরাং পাঠক অনায়াসেই অন‌ুমান করে নিতে পারেন যে বৈঠকে হাজির থাকতে আমি অপারগ হই নি। নির্দিষ্ট সময়েই আমি জেনারেলের বাড়িতে হাজির হলাম।

নগরের রাজপ‌ুর‌ুষদের একজনকে দেখলাম সেখানে। যতদ‌ূর মনে পড়ে, শ‌ুল্ক বিভাগের পরিচালক। মোটা চেহারা, লাল টকটকে গাল, পরনে কিংখাপের পোশাক। তিনি আমাকে ইভান কুজমিচের কথা বারবার জিজ্ঞেস করলেন; ইভান কুজমিচ নাকি তাঁর সাঙাত। আমার কথায় বাধা দিয়ে তিনি নানা প্রশ্ন করতে থাকলেন এবং শিক্ষাপ্রদ সব মন্তব্য জ‌ুড়তে থাকলেন। তা থেকে ব‌ুঝতে পারা যায় যে এই মান‌ুষটি সামরিক ব্যাপারে

নিপুণ না হলেও অন্তত পক্ষে বেশ বুদ্ধিমান, প্রকৃতিদত্ত একটা মেধা তাঁর আছে। ইতিমধ্যে অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র জেনারেল ছাড়া আর কেউ-ই সামরিক ব্যক্তি নন। সকলে আসন গ্রহণ করলে এক-এক পেয়ালা চা দেবার পর জেনারেল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও বিস্তৃত এক বিবরণ দিয়ে বললেন কী ব্যাপার। তারপর জানালেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা করা উচিত, **আক্রমণমূলক ব্যবস্থা** না **আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা**? মনে রাখবেন, এই দুই ব্যবস্থার প্রত্যেকটিরই সুবিধার দিক আছে, অসুবিধার দিক আছে। আক্রমণমূলক ব্যবস্থায় শত্রুকে দ্রুত নির্মূল করে ফেলবার আশা থাকে। আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা বেশি নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ... সুতরাং বিষয়টির উপরে আমরা যথোচিত ভাবে আইনসঙ্গতভাবে ভোট নেব। অর্থাৎ পদমর্যাদার দিক থেকে যিনি সবচেয়ে নিচে তাঁকে দিয়ে শুরু হবে। এন্‌সাইন্‌!' এই বলে আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'এবার আপনাকে আপনার মতামত আমাদের সামনে পেশ করতে অনুরোধ করছি।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পুগাচেভ আর তার দলবলের সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিয়ে আমি দৃঢ়ভাবে বললাম যে, সঠিক অস্ত্রশস্ত্রের মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা এই ভুয়ো-জারের নেই।

আমার এই মত রাজপুরুষরা যে পছন্দ করছেন না তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে এটা হচ্ছে ছোকরা-বয়সের মাথা-গরম ও অবিবেচনার ফল। ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উঠল। কে যেন চাপা স্বরে বলে উঠল, 'একেবারে ছেলেমানুষ!' কথাটা আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আমার দিকে ফিরে মৃদু হেসে জেনারেল বললেন, 'এন্‌সাইন্‌, সমর-পরিষদের বৈঠকে সাধারণত প্রথম ভোটগুলি যায় আক্রমণমূলক ব্যবস্থার পক্ষেই। এমনটিই হয়ে আসছে। যাক, এবার আমাদের ভোটের ব্যাপারে ফিরে আসি। কাউন্‌সিলর মশাই, আপনার মত বলুন!'

কিংখাপের পোশাক-পরা বৃদ্ধটি এ কথা শুনে তাড়াতাড়ি গলাধঃকরণ করলেন তৃতীয় পেয়ালা চা, তাতে অনেকটা পরিমাণে রাম্‌ মেশানো হয়েছিল। তারপর তিনি জেনারেলকে যে জবাব দিলেন তা হচ্ছে এই:

'মান্যবর, আমি মনে করি, আক্রমণমূলক বা আত্মরক্ষামূলক — কোনো ব্যবস্থাই ঠিক নয়।'

অবাক হয়ে জেনারেল বলে উঠলেন, 'আপনি বলছেন কী, কাউন্সিলর মশাই! এ ছাড়া অন্য কোনো কৌশল নেই! হয় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা, নয়ত আক্রমণমূলক...'

'মান্যবর, উৎকোচের ব্যবস্থা নিন।'

'হে-হে-হে, আপনি যথার্থ বলেছেন। উৎকোচের কৌশল গ্রহণেও কোনো আপত্তি নেই। আপনার উপদেশ মেনে নিলাম। দুর্বৃত্তটির মস্তকের জন্যে গোপন তহবিল থেকে সত্তর রুবল বা এমনকি একশ' রুবলও ঘোষণা করা যায়...'

জেনারেলের কথায় বাধা দিয়ে শুল্ক বিভাগের পরিচালক বললেন, 'ব্যস্, তা হলেই ওই ডাকাতের দল তাদের সর্দারকে হাতে পায়ে বেঁধে আমাদের হাতে সঁপে যদি না দেয় তা হলে আমি কাউন্সিলর নই কিরগিজ ভেড়া।'

জেনারেল জবাব দিলেন, 'ও নিয়ে আরো বিচার-বিবেচনা করা যাবে। কিন্তু সামরিক ব্যবস্থাকেও বাদ দেওয়া চলে না। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যথোচিত ক্রমানুসারে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন।'

দেখা গেল সকলেই আমার বিরুদ্ধে। রাজপুরুষরা সকলেই বলতে লাগলেন যে সৈন্যদের ওপর ভরসা রাখা যায় না, সাফল্য অনিশ্চিত, সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা আছে, ইত্যাদি। সকলেই মনে করছেন, খোলা মাঠে যুদ্ধের ভাগ্য পরীক্ষার চেয়ে পাকাপোক্ত পাথুরে দেওয়ালের আড়ালে কামান-বন্দুকের আশ্রয়ে থাকাটা ঢের বেশি বুদ্ধিমানের কাজ। সকলের মতামত শোনার পর, জেনারেল পাইপের ছাই ঝেড়ে যে বক্তৃতা দিলেন তা এই:

'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের বলতেই হবে যে এন্সাইনের মতের সঙ্গে আমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে। সঠিক সামরিক নিয়মাবলির উপরে এন্সাইনের মত প্রতিষ্ঠিত। কৌশল প্রায় সর্বদা আক্রমণের অনুকূল, আত্মরক্ষার নয়।'

এই পর্যন্ত বলে তিনি পাইপে তামাক ভরতে শুরু করলেন। বিজয়গর্বে

আমি স্ফীত হয়ে উঠলাম এবং উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকালাম রাজপুরুষদের দিকে। তাঁদের মুখে উদ্বেগ ও অসন্তোষের চিহ্ন। ফিসফিস আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন নিজেদের মধ্যে।

'কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ,' একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে একরাশ ঘন ধোঁয়া ছেড়ে জেনারেল বলতে লাগলেন, 'নিজের উপর এই বিপুল দায়িত্বভার নেবার আমার অধিকার নেই। পরম কারুণিক মহামান্য সম্রাজ্ঞীর আদেশে এই প্রদেশের নিরাপত্তার ভার আমার উপরে অর্পিত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রশ্নটা এই নিরাপত্তা নিয়ে। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের মতকেই আমি গ্রহণ করছি, অর্থাৎ সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ ব্যবস্থা হচ্ছে শহরের অভ্যন্তরেই অবরোধের জন্যে অপেক্ষা করে থাকা এবং গোলাবর্ষণ করে বা (সম্ভব হলে) আচমকা হানায় শত্রুকে হটিয়ে দেওয়া।'

এবার আমার দিকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকাবার পালা রাজপুরুষদের। পরিষদের বৈঠক শেষ হল। জেনারেলের মতো সম্মানীয় যোদ্ধার এই দুর্বলতা দেখে দুঃখ করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি অনভিজ্ঞ ও অজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়েছেন।

এই বিখ্যাত অধিবেশনটির কিছুদিন পরেই আমরা জানলাম যে, পুগাচেভ তার কথামতো ওরেনবুর্গের কাছে আসতে শুরু করেছে। নগরের প্রাচীরের ওপর থেকে বিদ্রোহী-সৈন্যদের আমি দেখতে পেলাম। মনে হল, গতবারের আক্রমণের সময় আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তার চেয়ে বিদ্রোহীদের সংখ্যা দশগুণ বেড়ে গেছে। এবারে ওদের কাছে কামান আছে। ছোটখাটো যে সব কেল্লা ওরা দখল করেছে সেখানকারই কামান এগুলো। সমর-পরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ওরেনবুর্গ শহরের মধ্যে দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। ক্ষোভে আমার প্রায় কান্না পেতে লাগল।

ওরেনবুর্গ অবরোধের বর্ণনা দেবার চেষ্টা আমি করব না। সে কাহিনী ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে; ঘরোয়া ইতিবৃত্তে তার স্থান নেই। আমি শুধু যথাসম্ভব সংক্ষেপে এইটুকু বলব যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অসাবধানতার ফলে শহরবাসীদের পক্ষে অবরোধটা হয়েছিল সর্বনাশা।

দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, হাজার রকম অসুবিধের মধ্যে পড়তে হল মানুষকে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে ওরেনবুর্গের জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে অপেক্ষা করে থাকত সবাই। জিনিসপত্রের দাম খুবই বেশি, সত্যিই তা ভয়াবহ। ফলে মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়ির উঠোনে কামানের গোলা এসে পড়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেল লোকে। এমনকি পুগাচেভ মাঝে মাঝে যে হামলা করে তা নিয়েও কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে না কেউ। একঘেয়েমিতে আমি তো প্রায় মরার সামিল। দিন কাটে। বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে আমি কোনো চিঠিপত্র পাই নি। সমস্ত রাস্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে বিচ্ছেদ অসহ্য হয়ে উঠেছে আমার কাছে। ওর কপালে কী ঘটেছে জানতে না পেরে যন্ত্রণা ভোগ করছি আমি। এখন একমাত্র অবসর-বিনোদন শুধু ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ানো। পুগাচেভের দৌলতে ঘোড়াটা ভালোই পেয়েছি। সামান্য যা কিছু খাবারের সংস্থান আমার আছে তাই ঘোড়াটার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খাই আর ঘোড়ার পিঠে চেপে চলে যাই একেবারে শহরের বাইরে, পুগাচেভের ঘোড়সওয়ার দলের সঙ্গে গুলি-বিনিময়ের জন্যে। এই সমস্ত সংঘর্ষে বেশি সুবিধা ছিল সাধারণত দুর্বৃত্ত দলের। তারা ভালো পানাহার করে, ঘোড়া তাদের ভালো। শহরের ক্ষীণকায় অশ্বারোহী বাহিনী তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না। মাঝে মাঝে আমাদের ক্ষুধার্ত পদাতিক বাহিনীও অভিযানে নামত কিন্তু ঘন বরফের বাধায় তারা বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহী অশ্বারোহীদের কাছে কোনো সাফল্য লাভ করতে পারত না। র‍্যাম্পার্টের ওপর থেকে আমাদের কামানগুলি বৃথাই গর্জন করত আর যখন কামানগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া হত তখন সেগুলি বরফে আটকে যেত কারণ আমাদের ঘোড়াগুলির এমন কাহিল অবস্থা যে কামানগুলোকে টেনে তুলতে পারত না। এই হচ্ছে আমাদের সামরিক তৎপরতার ধরন! আর ওরেনবুর্গের রাজপুরুষেরা একেই বলেন সতর্কতা আর বিবেচনা!

একদিন বেশ ঘন একটি শত্রুদলকে আমরা ছত্রভঙ্গ করে ভাগিয়ে দিলাম। দল থেকে ছিটকে পড়া একটি কসাকের পিছু ধাওয়া করলাম, আমার তুর্কী তলোয়ার উঁচিয়ে প্রায় ঘা দিতে গেছি, এমন সময় সে তার

মাথার টুপিটা খুলে ফেলে চিৎকার করে উঠল, 'নমস্কার, পিওতর আন্দ্রেইচ, কেমন আছেন আপনি?'

লোকটির দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম। আমাদের সেই সার্জেন্ট। তাকে দেখে আমার যা আনন্দ হল বলবার নয়।

বললাম, 'আরে, মাক্‌সিমিচ যে! তুমি কি অনেকদিন আগে বেলোগর্স্ক থেকে বেরিয়েছ?'

'না, পিওতর আন্দ্রেইচ, অনেক দিন নয়। মাত্র কালই আমি এসেছি। আপনার একটি চিঠি আমার কাছে আছে।'

'কোথায়?' গভীর উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

'এই যে!' বলে মাক্‌সিমিচ তার শার্টের ভিতরে হাত গলাল: 'পালাশাকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে চিঠিটা যে করে হোক আপনার হাতে পৌঁছে দেব।' ভাঁজ করা একটা কাগজ সে আমার হাতে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। দুরুদুরু বুকে চিঠিটার ভাঁজ খুলে এই কথাগুলো পড়লাম:

'ভগবান আমার বাবা-মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। এই পৃথিবীতে আমার আত্মীয় বা অভিভাবক বলতে আর কেউ নেই। আপনারই দ্বারস্থ হচ্ছি। আমি জানি আপনি আমার শুভার্থী এবং সবাইকে সাহায্য করতে আপনি প্রস্তুত। ভগবান করুন, এই চিঠিটা যেন আপনার হাতে পড়ে! মাক্‌সিমিচ কথা দিয়েছে যে পৌঁছে দেবে। পালাশা তার কাছে শুনেছে দূর থেকে আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখে। আপনি নাকি নিজের সম্পর্কে এতটুকুও সাবধান নন। যারা আপনার মঙ্গলের জন্যে সজল চোখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে তাদের কথা আপনি একটুও ভাবেন না। আমি বহুদিন অসুখে ভুগে সেরে উঠেছি। আমি সেরে উঠবার পর পাদ্‌রি গেরাসিমকে আলেক্সেই ইভানভিচ হুকুম দিয়েছে, আমাকে যেন তার হাতে দিয়ে আসে। প্রয়াত বাবার জায়গায় সে-ই এখন এই কেল্লার কর্তা, পাদ্‌রি গেরাসিমকে সে পুগাচেভের নাম করে শাসিয়েছে। এখন আমি আমাদের পুরনো বাড়িতেই আটক আছি। আলেক্সেই ইভানভিচকে বিয়ে করার জন্যে সে আমার ওপর চাপ দিচ্ছে। সে বলে, সে নাকি আমার

জীবন বাঁচিয়েছে, কারণ আকুলিনা পাম্‌ফিলভনা যখন শয়তানগুলোর কাছে আমাকে তার ভাইঝি বলে পরিচয় দেয় তখন সে সত্য কথা প্রকাশ করে নি। কিন্তু আলেক্সেই ইভানভিচের মতো লোকের স্ত্রী হওয়ার চেয়ে আমার মরণও ভালো ছিল। সে আমার সঙ্গে অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে আর বলে যে আমি যদি আমার মত না বদলাই ও তাকে বিয়ে করতে রাজি না হই তা হলে সে আমাকে বিদ্রোহীদের শিবিরে রেখে দিয়ে আসবে। তারপর শুনিয়ে রাখে যে লিজাভেতা খার্লোভার কপালে যা ঘটেছিল, আমারও সেই পরিণতি হবে। ভেবে দেখবার জন্যে আলেক্সেই ইভানভিচের কাছ থেকে আমি সময় চেয়েছি। সে তিনদিন অপেক্ষা করতে রাজি আছে, তিনদিন পরে আমি যদি তাকে বিয়ে না করি তা হলে আর আমাকে সে ক্ষমা করবে না। পিওতর আন্দ্রেইচ! একলা আপনিই আমার রক্ষাকর্তা। এই হতভাগিনীর পক্ষ নিন! জেনারেল আর অধিনায়কদের বুঝিয়ে বলুন, তাঁরা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সাহায্যের জন্যে সৈন্য পাঠান। সম্ভব হলে আপনিও সঙ্গে আসুন। ইতি

আপনার বশংবদ হতভাগিনী অনাথ মারিয়া মিরোনভা।'

চিঠিটা পড়ে আমি একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। নিরীহ ঘোড়াটাকে নির্দয়ভাবে কাঁটার ঘা মেরে ফিরে এলাম শহরে। সারা রাস্তা অনেক চিন্তা করেও অভাগিনীকে উদ্ধার করার কোনো পথ খুঁজে পাই নি। শহরে পৌঁছে সোজা চলে এলাম জেনারেলের বাড়িতে, একেবারে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জেনারেলের সামনাসামনি।

তিনি তখন একটা মীরশাউম পাইপে তামাক টানতে টানতে পায়চারি করছিলেন ঘরের মধ্যে। আমাকে দেখে থামলেন। আমার চেহারা দেখে নিশ্চয় অবাক হয়েছিলেন তিনি, ধৈর্য ধরে আমার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসার কারণ শুনলেন।

আমি বললাম, 'মান্যবর, আপনাকে নিজের বাপের মতো জ্ঞান করে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, ভগবানের দোহাই আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না! এ আমার সমস্ত জীবনের সুখের প্রশ্ন!'

বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কী বাছা? বলো তো শুনি। আমাকে কী করতে হবে বলো!'

'মান্যবর, হুকুম দিন, জন পঞ্চাশ কসাক ও একদল সৈন্য নিয়ে বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দিয়ে আসি!'

জেনারেল চোখ বড়ো বড়ো করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিনি নিশ্চয়ই ভাবছিলেন যে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। (তিনি যে খুব ভুল করেছিলেন তা নয়।)

অবশেষে তিনি বললেন, 'কী বললে? বেলোগর্স্ক কেল্লা থেকে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেবে?'

উদ্দীপ্ত হয়ে জবাব দিলাম, 'আপনাকে কথা দিচ্ছি সাফল্য সুনিশ্চিত! শুধু আমাকে যেতে দিন!'

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, 'বাপু হে, তা হয় না। বেলোগর্স্ক কেল্লা এখান থেকে অনেক দূরে। শত্রু সহজেই মূল ঘাঁটির সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে তোমাদের একেবারে পরাস্ত করে ফেলবে। যোগাযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়...'

সামরিক কথাবার্তায় তাঁকে পেয়ে বসতে দেখে আমার ভয় হল। তাড়াতাড়ি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, 'ক্যাপটেন মিরোনভের কন্যা আমার কাছে চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন তিনি। শ্ভাব্রিন তাঁকে জবরদস্তি বিয়ে করতে চাইছে।'

'বটে! এই শ্ভাব্রিনটা একেবারে পাজির পা ঝাড়া! ব্যাটাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পাই, তা হলে চব্বিশ ঘণ্টাও পার হতে দেব না, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে র‍্যাম্পার্টে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারব! কিন্তু আপাতত ধৈর্য ধরা দরকার!'

'ধৈর্য!' আমি প্রায় উন্মত্তের মতো কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম, 'ধৈর্য ধরব আর ওদিকে সে মারিয়া ইভানভনাকে বিয়ে করে বসুক!'

জেনারেল আপত্তি করে বললেন, 'এই কথা! ওটা তেমন কিছু সর্বনাশ নয়! বরং আপাতত শ্ভাব্রিনের বৌ হয়ে থাকাটাই ভালো। তা হলে অন্তত লোকটা ওঁকে আশ্রয় দিতে পারবে। তারপর আমরা যখন লোকটাকে গুলি করে মারব তখন ওঁর আর একটা বিয়ের বন্দোবস্ত করে

দিলেই চলবে। সুন্দরী বিধবারা আইবুড়ো হয়ে চিরকাল থাকে না। মানে বলতে চাইছিলাম যে, কুমারী মেয়ের চেয়ে তরুণী বিধবারা সহজেই স্বামী পেয়ে যায়।'

'শ্ভাব্রিনের হাতে ওঁকে তুলে দেওয়ার চেয়ে আমি বরং মরব!' রাগে অন্ধ হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

বৃদ্ধ বললেন, 'বটে, বটে, বটে, বটে! এতক্ষণে বোঝা গেল! তুমি মারিয়া ইভানভনার প্রেমে পড়েছ দেখছি। তা হলে তো, ব্যাপার অন্য রকম। বেচারি ছোকরা! কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার হাতে একদল সৈন্য ও জন পঞ্চাশ কসাককে ছেড়ে দেওয়া আমার কিছুতেই সম্ভব নয়। এই ধরনের অভিযান হবে অবিমৃষ্যকারিতা। আমি এর দায়িত্ব নিতে পারি না।'

হতাশ হয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মনের মধ্যে খেলে গেল। সাবেক কালের ঔপন্যাসিকদের যা ধরন তাতে বলতে গেলে, পরবর্তী অধ্যায়টি পড়লেই পাঠক জানতে পারবেন ব্যাপারটা কী।

একাদশ অধ্যায়

বিদ্রোহী গ্রাম

হিংস্র হলেও পেটটা ভরা থাকায় —
'কেন আগমন আমার এই গুহায়?'
শুধাল সিংহ একটু নরম গলায়।

আ. সুমারোকভ।*

জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি দ্রুতপায়ে আমার নিজের কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। সাভেলিচের সঙ্গে দেখা হতেই সে তার স্বভাবসিদ্ধ নালিশ জানাতে শুরু করে দিল, 'দাদাবাবু, ওই মাতাল শয়তানগুলোর সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে কী লাভটা হচ্ছে শুনি! এটা কি ভদ্রলোকের কাজ? যদি কিছু একটা হয়ে যায় বেঘোরেই প্রাণটা খোয়াবে যে! হ্যাঁ, যদি বুঝতাম যে তুর্কী বা সুইডীয় — তা হলে অন্য কথা। কিন্তু তুমি যাদের সঙ্গে লড়াই করছ তাদের নাম মুখে আনাও পাপ।'

সাভেলিচের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কাছে এখন সর্বসমেত কত টাকা আছে?' তুষ্ট মুখে সে জবাব দিল, 'হবে দাদাবাবু, হবে। বদমাইসগুলো যতই ঘাঁটাঘাঁটি করুক না, কিন্তু টাকা আমি লুকিয়ে রাখতে পেরেছি।' এই বলে সে তার পকেট থেকে রুপোর মুদ্রা-ভর্তি একটা লম্বা হাতে-বোনা থলিয়া বার করল। আমি বললাম, 'সাভেলিচ, একটা কথা বলি শোনো। এই টাকাটার অর্ধেক আমাকে দাও আর বাকি অর্ধেক তোমার নিজের জন্যে রাখো। আমি বেলোগর্স্ক কেল্লায় যাচ্ছি।'

'সে কী বাছা পিওতর আন্দ্রেইচ!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল ভালোমানুষ, আমার খুড়োটি, 'ভগবানের দোহাই দাদাবাবু! সারা রাস্তায়

লুঠেরারা ছড়িয়ে আছে, এই সময়ে তোমায় ছেড়ে দিই কী করে? তোমার নিজের প্রাণের মায়া না থাকে অন্তত তোমার বাপ-মার কথাটা একবার ভেবে দেখো দাদাবাবু! আর যাচ্ছ কোথায়? কী এমন দরকার? কয়েকটা দিন সবুর করো, পল্টন এসে হতচ্ছাড়াগুলোকে প্যাকড়াও করুক। তারপর যেখানে খুশি যেও।'

কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

বললাম, 'ও সব কথা বলে এখন আর কোনো লাভ নেই। যেতে আমাকে হবেই, না গিয়ে পারি না। মন খারাপ করো না সাভেলিচ, মাথার ওপরে ভগবান আছেন, হয়ত আবার আমাদের দেখা হবে। আর শোনো, টাকাপয়সা যা আছে তা নিয়ে বেশি হিসেব করতে যেও না বা বেশি কিপটেমি করো না। যা তোমার দরকার লাগবে, কিনবে, যতই দাম হোক না কেন। এই টাকাটা আমি তোমাকে উপহার দিয়ে যাচ্ছি। যদি তিনদিনের মধ্যে আমি ফিরে না আসি...'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সাভেলিচ বলল, 'এ সব তুমি কী বলছ, দাদাবাবু? তোমাকে আমি একা যেতে দিচ্ছি আর কি! ওটা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না মনে। আর তুমি যখন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছ যে যাবেই, কাজেই যাব। হেঁটে যেতে হলেও যাব তোমার সঙ্গে। তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তোমাকে ছাড়া আমি এই পাথরের দেওয়ালের মধ্যে বসে থাকব বৈকি! আমার তো আর মাথা খারাপ হয় নি, দাদাবাবু! তুমি আমাকে যা খুশি বলতে পারো কিন্তু আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়ব না।'

আমি জানি যে সাভেলিচের সঙ্গে তর্ক চলে না। সুতরাং তাকে যাত্রার তোড়জোড় করতে বললাম। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম আমরা। আমি বসেছি তাগড়াই ঘোড়াটির ওপর আর সাভেলিচ চেপেছে একটা হাড়-জিরজিরে খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে। শহরের একজন লোক সাভেলিচকে এই ঘোড়াটা দান করেছে, ওটাকে খাওয়ানোর সামর্থ্য তার ছিল না। নগরদ্বারের কাছে আমরা এলাম। শান্ত্রীরা আমাদের ছেড়ে দিল। ওরেনবুর্গ পিছনে ফেলে বেরিয়ে এলাম দুজনে।

সন্ধ্যা নামছে। বের্দস্কায়া গ্রাম পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। এই গ্রামে এখন ঘাঁটি করেছে পুগাচেভ। রাস্তা বরফে ঢাকা; কিন্তু স্তেপের

সর্বত্র ঘোড়ার খুরের ছাপ, রোজই তা নতুন করে পড়ে। আমি জোর কদমে ঘোড়া ছোটাচ্ছি। আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়াটা সাভেলিচের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর বারবার চিৎকার করে বলছে সে, 'আস্তে দাদাবাবু, ভগবানের দোহাই, আরেকটু আস্তে দাদাবাবু! তোমারে এই লম্বা-ঠেঙে জানোয়ারটার সঙ্গে এই হতভাগা ঘোড়াটা কিছুতেই তাল রাখতে পারছে না! আর তোমার এত তাড়াই বা কিসের? ভোজে যেতে পারলেই হত ভালো, কিন্তু চলেছি হয়ত ফাঁসির দিকে — এই তোমাকে বলে রাখলাম, দাদাবাবু!.. পিওতর আন্দ্রেইচ! নিজেকে ধ্বংস করো না। হে প্রভু, আমার মনিবের ছেলের প্রাণটা যে গেল!..'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বের্দস্কায়া গ্রামের আলো দেখা গেল। আমরা এসে পৌঁছলাম একটা খাদের ধারে; এই খাদটা গ্রামের একটা স্বাভাবিক পরিখা হিসেবে কাজ করছে। সারাটা পথ সাভেলিচ এসেছে আমার পিছনে পিছনে, তার সেই করুণ মিনতি কখনো থামায় নি। আমার আশা ছিল, গ্রামের পাশ কাটিয়ে ভালোয় ভালোয় চলে যেতে পারব। হঠাৎ দেখলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে ঠিক আমার সামনেটিতে লাঠি হাতে জন পাঁচেক চাষী দাঁড়িয়ে। বোঝা গেল, এটা হচ্ছে পুগাচেভের ছাউনির একটা অগ্রণী পাহারা-দল। লোকগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে হাঁক দিল। সঙ্কেত শব্দ আমার জানা ছিল না সুতরাং আমি নিঃশব্দে জায়গাটা পার হয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ঘিরে ফেলল, একজন এসে ধরল আমার ঘোড়ার লাগাম। তলোয়ার বার করে লোকটার মাথা লক্ষ্য করে ঘা বসালাম আমি, লোকটির মাথার টুপি ওকে বাঁচিয়ে দিল বটে কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিল। অন্যরা হকচকিয়ে গিয়ে পালাল। নিশ্বাস ফেলবার মুহূর্তের এই ফাঁকটুকুর সুযোগ আমি নিলাম। ঘোড়ার পেটে কাঁটার ঘা দিতেই জোর কদমে ঘোড়া ছুটল।

ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার আমাকে হয়ত সমস্ত বিপদ থেকেই বাঁচিয়ে দিতে পারত, কিন্তু হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, সাভেলিচ আমার সঙ্গে নেই। খোঁড়া ঘোড়ায় বেচারি বৃদ্ধ লোকগুলোর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পারে নি। এখন কী করি? সে যে সত্যিই আটক হয় নি সে

সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে একটুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চললাম সাভেলিচকে উদ্ধার করবার জন্যে।

খাদের কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে অনেক মানুষের কলরব ভেসে এল। এই কলরবের মধ্যে সাভেলিচের গলাও শোনা যাচ্ছে। আমি আরো জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার দাঁড়ালাম গিয়ে সেই পাহারার চাষীদের কাছে যারা কয়েক মিনিট আগে আমায় থামাতে চেষ্টা করেছিল। সাভেলিচকে তারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তাকে টেনে নামিয়েছে ঘোড়া থেকে, তারপর বাঁধবার উপক্রম করছে। আমাকে হাজির হতে দেখে সবাইকার মহা আনন্দ, হৈ-হৈ করতে করতে সবাই ছুটে এল আমার দিকে, পরক্ষণেই আমাকে টেনে নামিয়ে ফেলল ঘোড়া থেকে। ওদের মধ্যে যে লোকটিকে দেখেশুনে সর্দার বলে মনে হচ্ছিল, সে ঘোষণা করল যে আমাদের দুজনকে অবিলম্বে জারের কাছে হাজির করবে। তারপর যোগ দিল, 'তোমাদের এক্ষুনি ফাঁসিকাঠে লট্‌কানো হবে, না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে — তা আমাদের জারই বলে দেবেন।' আমি বাধা দিলাম না, সাভেলিচও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। বিজয় উল্লাসে পাহারাদাররা নিয়ে চলল আমাদের।

খাদ পেরিয়ে আমরা গ্রামে ঢুকলাম। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। কলরব আর চিৎকার শোনা যাচ্ছে চারদিক থেকে। রাস্তায় দেখা গেল অনেক লোক, কিন্তু অন্ধকারে কেউ আমাদের দিকে নজর করল না, আমাকে ওরেনবুর্গের অফিসার বলে চিনতেও পারে নি কেউ। আমাদের বরাবর নিয়ে যাওয়া হল চৌমাথার কাছে একটা কুটিরে। ফটকের কাছে রয়েছে কয়েক পিপে মদ আর দুটো কামান। একজন চাষী বলল, 'এই হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। আমি ভিতরে গিয়ে তোমাদের খবর জানিয়ে আসছি।' সে ভিতরে চলে গেল। সাভেলিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বুড়ো বারবার বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকছে আর বিড়বিড় করে প্রার্থনা করে চলেছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল আমাকে। তারপর একসময়ে সেই চাষীটি বেরিয়ে এসে আমাকে বলল, 'ভিতরে চলো। আমাদের জার তোমাকে ভিতরে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

আমি কুটিরের ভিতরে ঢুকলাম, অথবা চাষীরা যাকে রাজপ্রাসাদ বলেছে তাতে। ভিতরে দুটো চর্বির মোমবাতি জ্বলছে, দেওয়ালগুলোয়

সোনালি কাগজ সাঁটা। এটুকু ছাড়া বাদবাকি সবই সাধারণ একটা কুটিরের মতো। তেমনি টেবিল আর বেঞ্চি, হাতমুখ ধোবার জন্যে ঝোলানো পাত্র, পেরেকে টাঙানো তোয়ালে, এককোণে লম্বা বড়ো হাতল আর চওড়া পাথরের তাকের ওপরে সাজানো রয়েছে মাটির হাঁড়ি-কলসী। গুরুগম্ভীর ভাব করে পুগাচেভ বসে আছে কোণের যীশু খ্রীষ্টের পটের নিচে, পরনে লাল পোশাক, মাথায় লম্বা টুপি, তার দুই হাত কোমরে। তার কয়েকজন প্রধান অনুচর দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে। সকলেরই হাবভাবে কৃত্রিম অতি-বিনীত ভাব। বোঝা যাচ্ছে ওরেনবুর্গ থেকে একজন অফিসার এসে হাজির হয়েছে — এই সংবাদ শুনে সবাই হয়েছে বিশেষ রকমের কৌতূহলী, আর স্থির করেছে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে সাড়ম্বরে। দেখেই পুগাচেভ আমাকে চিনতে পারল। তার চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য হঠাৎ উবে গেল, সোল্লাসে সে বলে উঠল, 'আরে হুজুর যে! খবর কী? ভগবান তোমায় এখানে পাঠাল কী জন্যে?' আমি বললাম যে আমি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কাজে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার লোকেরা আমাকে থামায়। পুগাচেভ জিজ্ঞেস করে, 'তা তোমার কাজটা কী?' আমি কী জবাব দেব বুঝতে পারলাম না। পুগাচেভ ভাবল যে বাইরের লোকের সামনে আমি কথা বলতে ইতস্তত করছি, তখন সে ইঙ্গিতে সবাইকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বলল। সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল, শুধু দুজন বাদ, তারা নড়ল না। পুগাচেভ বলল, 'তোমার যা বলবার এদের সামনেই নির্ভয়ে বলতে পারো। এদের কাছে আমি কোনো কথা গোপন করি না।' ভুয়ো-জারের এই দুই সহযোগীর দিকে আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম। একজন পলকা চেহারার কুঁজোমতো বৃদ্ধ, মুখে একটু পাকা দাড়ি। পরনের ধূসর মোটা কোটের ওপরে সে একটা নীল ফিতে বেঁধেছে আর এইটুকু ছাড়া তার ভেতর উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। কিন্তু অপরজনকে আমি আমার সারা জীবন ভুলতে পারব না। শক্তসমর্থ লম্বা চেহারা, চওড়া কাঁধ, দেখে মনে হয় বছর পয়তাল্লিশ বয়েস। তার ঘন পাটকিলে দাড়ি, চকচকে ধূসর চোখ, খাঁদা নাক, কপালে ও গালে লালচে দাগ — সব মিলিয়ে তার বসন্তের দাগওলা চওড়া মুখখানায় একটা কুটিল ভাব ফুটে উঠেছে। পরনে লাল কামিজ, কিরগিজ আলখাল্লা, কসাক শালওয়ার। প্রথম জনের নাম (আমি পরে

জেনেছি) বেলোবরোদভ, সৈন্যদলের ফেরারী কর্পোরাল। দ্বিতীয় জনের নাম আফানাসি সকলোভ (সবাই ডাকে খ্লপুশা বলে), নির্বাসিত কয়েদি, তিন-তিনবার সাইবেরিয়ার খনি-অঞ্চল থেকে পালিয়ে এসেছে। আমার সারাটা মন জুড়ে ছিল অন্য একটা চিন্তা কিন্তু তা সত্ত্বেও এমন আচমকা এই লোকগুলির মাঝখানে এসে পড়ার পর তারা ভারি নাড়া দিল আমার কল্পনাকে। কিন্তু 'বলো কী কাজে তুমি ওরেনবুর্গ থেকে?' এই প্রশ্ন করে পুগাচেভ আমায় সজাগ করে দিলে।

অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মনে। আমার মনে হল, পুগাচেভের সঙ্গে আমার দ্বিতীয়বার এই সাক্ষাৎ ঘটিয়ে বিধাতা আমার সংকল্পকে কাজে পরিণত করবার একটা সুযোগ দিয়েছেন। মনে মনে স্থির করলাম যে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করব এবং আমার এই সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ কিছু বিবেচনা না করেই পুগাচেভের প্রশ্নের জবাবে বললাম:

'একটি অনাথাকে বাঁচাবার জন্যে আমি বেলোগর্স্ক কেল্লায় যাচ্ছিলাম, এই অনাথাটির ওপরে সেখানে দুর্ব্যবহার করা হচ্ছে।'

দুচোখে আগুন ঝরিয়ে পুগাচেভ চেঁচিয়ে বলল, 'আমার লোকেদের মধ্যে কার সাহস যে অনাথার ওপর দুর্ব্যবহার করে? যত ধূর্তই সে হোক, আমার ন্যায়-বিচার থেকে তাকে পালাতে হচ্ছে না। বলো — কে এই দুর্বৃত্ত?'

আমি বললাম, 'শ্ভাব্রিন! পাদ্রির বাড়িতে তুমি যে অসুস্থ মেয়েটিকে দেখেছিলে সেই মেয়েটিকে সে বন্দী করে রেখেছে। মেয়েটিকে সে জোর করে বিয়ে করতে চায়।'

ভীতিপ্রদর্শনের স্বরে পুগাচেভ বলল, 'শ্ভাব্রিনকে উচিত শিক্ষা দেব আমি। আমার এখানে স্বেচ্ছাচার চালালে, লোকের উপর অত্যাচার করলে ফল কী হতে পারে তা সে টের পাবে। ফাঁসিকাঠে লটকাব তাকে।'

ঘড়ঘড়ে গলায় খ্লপুশা বলল, 'আমাকে কিছু বলতে দাও। শ্ভাব্রিনকে কেল্লার অধিনায়ক করবার বেলাতেও তুমি বড়ো বেশি তাড়াহুড়ো করেছিলে, এখন তাকে ফাঁসি দেবার বেলাতেও তোমার তর সইছে না। একজন অভিজাত শ্রেণীর লোককে কর্তা করে একবার তুমি কসাকদের

অপমান করেছ। এখন তার নামে কথা উঠতেই তাকে ফাঁসিতে লটকিয়ে অভিজাত শ্রেণীকে আতঙ্কিত করো না।'

নীল ফিতেওলা বুড়ো বলল, 'মায়া করবারও দরকার নেই বা নালিশ করারও দরকার নেই। শ্ভাব্রিনকে ফাঁসি দিলে কিছু ক্ষতি নেই। কিন্তু এই অফিসারটিকে একটু জেরা করলে বোধ হয় খারাপ হবে না। ও কেন এসেছে? তোমাকে যদি ও সম্রাট বলে স্বীকার না-ই করে, তবে তোমার কাছে ওর সুবিচার চাইবার কিছু নেই। আর যদি স্বীকার করে তা হলে যারা তোমার জাত-শত্রু তাদের দলে মিশে ওরেনবুর্গে এতদিন বসে ছিল কেন? তুমি যদি বলো তো ওকে আমি সদরে নিয়ে যাই, তারপর গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দেখি। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে, ওরেনবুর্গের কম্যান্ডাররা ওকে আমাদের এখানে পাঠিয়েছে।'

আমার মনে হল যে এই বুড়ো শয়তানটার যুক্তি সহজে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। কাদের হাতে এসে পড়েছি ভেবে আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমার এই অস্বস্তি পুগাচেভ লক্ষ্য করেছে। আমার দিকে চোখ টিপে সে জিজ্ঞেস করল, 'কথাগুলো শুনলে তো হুজুর? আমার ফিল্ড্-মার্শাল মনে হয় ঠিক কথাই বলেছে। তুমি কী বলো?'

বিদ্রূপের সুরে-বলা পুগাচেভের কথাগুলি শুনে আমার সাহস ফিরে এল। শান্ত স্বরে আমি জবাব দিলাম যে আমি পুগাচেভের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছি, সুতরাং পুগাচেভ আমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

পুগাচেভ বলল, 'বেশ কথা। আচ্ছা এবার বলো তো, তোমাদের ওই শহরটার হাল এখন কী রকম?'

বললাম, 'ঈশ্বরের দয়ায় সব কিছুই ভালো।'

পুগাচেভ বলে উঠল, 'ভালো? ওদিকে লোকে না খেয়ে মরছে!'

ভুয়ো-জারের কথাটা সত্যি, কিন্তু আমি যে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি, তাই কর্তব্যবশে বোঝাতে লাগলাম যে ও সব নেহাতই গুজব, ওরেনবুর্গে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্যের সংস্থান আছে।

আমার কথার খেই ধরে বুড়ো বলল, 'দেখছ তো, ও তোমার মুখের ওপরে মিথ্যে কথা বলছে। শহর থেকে যারা পালিয়ে এসেছে তারা সবাই

একবাক্যে বলেছে যে ওরেনবুর্গে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী চলছে, লোকে মরা জন্তুর মাংস খেয়ে দিন কাটায়, তাও পেলে বর্তে যায় সবাই। আর উনি বলছেন, শহরে যথেষ্ট খাদ্য আছে। যদি তুমি শ্ভাব্রিনের ফাঁসি দিতে চাও, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে সেই একই ফাঁসিকাঠে এই ছোকরাকেও ঝুলিয়ে দাও। তা হলে আর দুজনের কারো মনে কোনো ক্ষোভ থাকবে না।'

হতচ্ছাড়া বুড়োটার কথা পুগাচেভকে যেন দ্বিধায় ফেলল বলে মনে হল। কপাল ভালো বলতে হবে যে খ্লপুশা আপত্তি করতে শুরু করে দিল সঙ্গীর কথায়।

বলল, 'খুব হয়েছে নাউমিচ, থামো তো বাপু। সবই টুঁটি টিপে মারা আর গলা কাটতে পারলেই তোমার হল। কোন এক মহাবীর তুমি? দেখলে মনে হয় ধড়ে প্রাণ নেই। নিজেই ঘাটের মড়া আর অন্যদের যমের বাড়ি পাঠাতে চাও! রক্তপাত কি কিছু কম করেছ?'

বেলোবরোদভ আপত্তি করে বলল, 'আর তুমি ভাবো নিজেকে কী? সাধুপুরুষ? তা হঠাৎ তোমার প্রাণে এমন দয়া উথলিয়ে উঠল যে?'

খ্লপুশা জবাব দিল, 'আমিও পাপী, নিশ্চয়। এই হাত দিয়ে (এই বলে সে অস্থিল হাতের মুঠি পাকিয়ে আস্তিন গুটিয়ে লোমশ একটা হাত বার করল), এই হাত দিয়ে অনেক খ্রীষ্টানের রক্তপাত করেছি। কিন্তু তাই বলে অতিথিদের খুন করি নি, খুন করেছি শত্রুদের। আমি মানুষ খুন করেছি খোলা চৌমাথায়, অন্ধকার জঙ্গলে, ঘরের মধ্যে চুল্লির পাশে বসে নয়; লাঠি কিংবা কুড়ুলের ঘায়ে, মেয়েমানুষের মতো গুজগুজ ফুসফুস করে নয়।'

বুড়ো অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'খাঁদা!'

খ্লপুশা চিৎকার করে উঠল: 'ধাড়ী ইঁদুর, বিড়বিড় করে কী বলা হচ্ছে শুনি? একটু সবুর করো, তোমার পালাও আসবে। ভগবান করুন, চিমটের গন্ধটা কেমন লাগে তা যেন টের পেতে হয়। একটু সমঝে চলো — নইলে তোমার দাড়ি উপড়িয়ে ফেলব।'

ভারিক্কি চালে পুগাচেভ ঘোষণা করল, 'জেনারেল মশাইরা, ঝগড়া যথেষ্ট হয়েছে! ওরেনবুর্গের কুকুরগুলোকে যদি একসঙ্গে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় — তাতে কিছু সর্বনাশ হবে না। কিন্তু আমাদের

এখানকার কুকুরগুলো যদি খেয়োখেয়ি করে তাহলেই সর্বনাশ। বাস, এবার মিটমাট করে নাও।'

খ্লপুশা আর বেলোবরোদভ কোনো কথা না বলে মুখ ভার করে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি বুঝতে পারলাম, কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার। এভাবে চলতে দিলে ব্যাপারটা আমার পক্ষেই অসুবিধাজনক হয়ে উঠবে, এমন আশঙ্কা আছে। পুগাচেভের দিকে ফিরে খুশির সুরে আমি বললাম, 'ওহো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম, ভেড়ার চামড়ার কোট আর ঘোড়াটার জন্যে তোমার ধন্যবাদ পাওনা আছে। তোমার সাহায্য না পেলে, আমি কিছুতেই শহরে পেঁছিতে পারতাম না। শীতে জমে গিয়ে পথেই মরে থাকতাম।'

আমার ফন্দিতে কাজ হল। খুশি হয়ে উঠল পুগাচেভ। চোখ টিপে ভুরু কুঁচকে সে বলল, 'শোধ দিলেই ঋণ ভালো। এবার আমাকে বলো তো দেখি, শ্ভাব্রিন যে মেয়েটির ওপরে দুর্ব্যবহার করছে সে তোমার কে হয়? মেয়েটি আবার তোমার প্রেমিকা নয় তো? এ্যাঁ?'

'সে আমার বাগ্‌দত্তা,' আবহাওয়ার পরিবর্তনটা আমার অনুকূলে যাচ্ছে দেখে এবং সত্য গোপন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই বুঝতে পেরে আমি বললাম।

'তোমার বাগ্‌দত্তা!' পুগাচেভ চেঁচিয়ে উঠল। এ কথা আমাকে আগে বলো নি কেন? আমরা তোমার বিয়ে দেব, তোমার বিয়েতে ভোজ খাব!' তারপর বেলোবরোদভের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'শোনো ফিল্‌ড্‌-মার্শাল! আমরা দুজনে পুরনো বন্ধু। এসো এবার সকলে মিলে রাতের খাওয়া খেতে বসি। সকাল হলেই বুদ্ধি খোলে। কাল সকালে ঠিক করা যাবে, আমার বন্ধুকে নিয়ে কী করা যায়।'

আমার প্রতি এই সম্মান-প্রদর্শনের প্রস্তাবে রাজি না হতে পারলেই আমি খুশি হতাম। কিন্তু উপায় নেই। দুটি কসাক তরুণী — এই বাড়ির মালিকেরই দুই মেয়ে — একটা সাদা কাপড় বিছিয়েছে টেবিলের ওপরে, নিয়ে এসেছে রুটি, মাছের ঝোল, কয়েক বোতল ভদ্‌কা ও বীয়ার। ঘটনাচক্রে আবার আমাকে পুগাচেভ আর তার ভয়াবহ সঙ্গীদের সঙ্গে একই টেবিলে বসে খেতে হল।

পানাহারের হুল্লোড় চলল অনেক রাত পর্যন্ত। আমি ছিলাম তার অনিচ্ছুক দর্শক। শেষকালে একসময়ে মদের নেশায় চুর হয়ে গেল আমার সঙ্গীরা। পুগাচেভ চেয়ারে বসে বসেই ঢুলছে। সঙ্গীরা উঠে দাঁড়িয়ে ইঙ্গিতে আমাকে বেরিয়ে আসতে বলল। ঘর থেকে আমি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। খ্লপুশার হুকুমে শান্ত্রীরা আমাকে নিয়ে গেল সদরে। সাভেলিচ ছিল সেখানে। সেখানেই বন্ধ করে রাখা হল আমাদের। আমার খুড়োটি এত সব কাণ্ডকারখানা ঘটতে দেখে এমন থ' হয়ে গেছে যে আমাকে একটা প্রশ্নও করল না। অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই বহুক্ষণ ধরে গোঙালে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। শেষকালে তার নাকে ডাকতে শুরু করল। আমি চিন্তায় ডুবে গেলাম, সারা রাত এক মিনিটের জন্যে ঘুম এল না আমার চোখে।

পরদিন সকালে পুগাচেভ ডেকে পাঠাল আমাকে। আমি গেলাম তার কাছে। দরজার সামনে একটা স্লেজগাড়ি দাঁড়িয়ে, তিনটে তাতার ঘোড়া জোতা হয়েছে গাড়ির সঙ্গে। রাস্তায় মানুষের ভিড়। অলিন্দে পুগাচেভের সঙ্গে আমার দেখা হল। ফারের কোট গায়ে, মাথায় কিরগিজ টুপি, যাত্রার উপযুক্ত পোশাক পরেছে সে। তার গত সন্ধ্যার সঙ্গীরা ঘিরে আছে তাকে, তাদের সকলেরই এখন অনুগতভাব। আগের দিন সন্ধ্যায় আমি যে দৃশ্য দেখেছি তার সঙ্গে এ দৃশ্যের প্রচণ্ড একটা পার্থক্য রয়েছে। পুগাচেভ সহাস্যে আমাকে সম্ভাষণ জানাল, তারপর স্লেজগাড়িতে উঠতে বলল আমাকে।

উঠে বসলাম গাড়িতে। একজন চওড়া-কাঁধ তাতার লোক ঘোড়া তিনটেকে চালাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। পুগাচেভ তাকে বলল, 'বেলোগর্স্ক কেল্লা!' আমার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। ঘোড়াগুলো চলতে শুরু করে, টিংটিং শব্দে ঘণ্টা বাজে, বরফের ওপর দিয়ে উড়ে চলে স্লেজগাড়ি...

'থাম! থাম!' কে যেন চিৎকার করছে। গলাটা আমার খুবই পরিচিত। দেখলাম, সাভেলিচ সামনে থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে আমাদের দিকে। পুগাচেভের হুকুমে গাড়ি থেমে গেল। সাভেলিচ বলল, 'দাদাবাবু, পিওতর আন্দ্রেইচ! এই বুড়ো বয়সে আমাকে আর ফেলে যেও না এই শয়তা...'

পুগাচেভ বলল, 'কী হে ধাড়ী ইঁদুর! ভগবানের দয়ায় আবার আমাদের দেখা হয়ে গেল। যাও, কোচোয়ানের পাশে বসো গিয়ে।'

নির্দিষ্ট স্থানে বসে সাভেলিচ চিৎকার করে বলল, 'ধন্যবাদ হুজুর! তুমি আমার পিতার তুল্য, ধন্যবাদ তোমাকে! এই বুড়ো মানুষটাকে দয়া করবার জন্যে ভগবান তোমাকে একশ' বছর পরমায়ু দিন! যতদিন বেঁচে থাকব, তোমার মঙ্গলের জন্যে আমি প্রার্থনা করব। আর খরগোসের চামড়ার কুর্তার কথাটা কোনোদিন তোমার সামনে তুলব না।'

খরগোসের চামড়ার কুর্তার কথাটা পুগাচেভকে হয়ত বাস্তবিকই ভয়ানক ক্ষেপিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কপাল ভালো বলতে হবে, হয় সে সাভেলিচের কথা শুনতেই পায় নি কিংবা এই অস্থানোচিত ইঙ্গিতটাকে উপেক্ষা করেছে। ঘোড়া ছুটে চলেছে, রাস্তার লোকেরা থেমে গিয়ে নিচু হয়ে লম্বা কুর্নিশ করছে, মাথা নেড়ে রাস্তার দুধারের জনতাকে অভিবাদন জানাচ্ছে পুগাচেভ। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গ্রামের বাইরে চলে এলাম। মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে আমাদের স্লেজগাড়ি ছুটে চলল।

ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনের ভাব কী হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমার সঙ্গে যে মেয়েটির দেখা হবে, তাকে আবার কোনোদিন দেখতে পাব সে আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দেখা হওয়ার মুহূর্তটি কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম। আর যে মানুষটির হাতে আমার ভাগ্য নির্ভর করছে, ভাবলাম তার কথাও। পর পর কয়েকটি বিচিত্র ঘটনাসূত্রে এই মানুষটির সঙ্গে আমার এক রহস্যজনক যোগাযোগ ঘটে গেছে। মনে পড়ল তার নির্বিকার হিংস্রতা ও রক্তলোলুপ অভ্যেসের কথা। সে-ই কিনা হতে চলেছে আমার প্রেমিকার ত্রাণকর্তা! পুগাচেভ জানে না, ক্যাপটেন মিরোনভের কন্যা ও। নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে না দেখে শ্ভাব্রিন হয়ত ওর সত্যকার পরিচয় প্রকাশ করে দিতে পারে। হয়ত অন্য কোনো উপায়ে খবরটা জেনে ফেলতে পারে পুগাচেভ। তা যদি হয় তো মারিয়া ইভানভনার কপালে কী আছে কে জানে! আমার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা হিমপ্রবাহ নেমে গেল। খাড়া হয়ে উঠল মাথার চুল...

'কী ভাবছ হুজুর?' পুগাচেভ আমাকে জিজ্ঞেস করল। তার এই প্রশ্ন শুনে আমার চিন্তায় বাধা পড়ল।

বললাম, 'ভাবনার কি আর শেষ আছে? আমি অভিজাত বংশের ছেলে, সৈন্যবাহিনীর অফিসার, কালও আমি তোমার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি আর আজ কিনা আমাকে একই গাড়িতে তোমার পাশে বসে যেতে হচ্ছে আর আমার সমস্ত জীবনের সুখ নির্ভর করছে তোমারই ওপর।'

পুগাচেভ বলল, 'তাতে কী! তোমার ভয় করছে নাকি?'

জবাবে আমি বললাম, পুগাচেভ একবার যখন আমাকে ক্ষমা করেছে, তখন আমার আশা আছে যে তার ক্ষমাই শুধু নয়, সাহায্যও পাব।

ভুয়ো-জার বলে উঠল, 'তুমি ঠিক কথাই বলেছ! একেবারে ঠিক কথা! আমার দলের লোকেরা তোমার দিকে কেমন বাঁকা চোখে তাকাচ্ছিল দেখেছ তো? আজও বুড়োটা হলফ করে বলছিল যে তুমি হচ্ছ গোয়েন্দা, সে জন্যে তোমাকে নির্যাতন করে ফাঁসি দেওয়া উচিত।' সাভেলিচ ও তাতার লোকটা যাতে শুনতে না পায়, এমনিভাবে গলা নামিয়ে তারপর সে বলল, 'কিন্তু আমি রাজি হই নি। তুমি যে আমাকে একগ্লাস ভদ্‌কা ও খরগোসের চামড়ার কুর্তা দিয়েছিলে তা আমি ভুলি নি। দেখছ তো, তোমার ভাইয়েরা যা বলে আসলে তেমন রক্তলোলুপ দানব আমি নই।'

বেলোগর্স্ক কেল্লা দখলের দৃশ্যটা আমার মনে পড়ল। কিন্তু পুগাচেভের এই উক্তির প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে না করে আমি চুপ করে রইলাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুগাচেভ জিজ্ঞেস করল, 'ওরেনবুর্গের লোকেরা আমার সম্পর্কে কী বলে?'

'বলে যে তোমার সঙ্গে যুঝে ওঠাটা সহজ ব্যাপার নয়। বলবার কিছু নেই, নিজেকে তুমি টের পাইয়ে ছেড়েছ।'

ভুয়ো-জারের চোখেমুখে পরিতৃপ্ত অহঙ্কার ফুটে উঠল। উৎফুল্ল হয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। কী করে লড়াই করতে হয় তা আমি জানি। ইউজেয়েভায়ায় যে যুদ্ধ হয়েছিল তার কথা কি ওরেনবুর্গের লোকেরা জানে? চল্লিশ জন জেনারেল খুন, চারটি ফৌজবন্দী। আচ্ছা কী মনে হয় তোমার: প্রুশিয়ার রাজাও আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে?'

শয়তানটাকে এভাবে দেমাক জাহির করতে দেখে আমি কৌতুক বোধ করলাম।

'তোমার নিজের কী ধারণা? ফ্রিদেরিককেও তুমি হটিয়ে দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ফিওদর ফিওদরিচের কথা বলছ?* কেন পারব না? তোমাদের জেনারেলদের ওপর আমি তো এখনই শাসন চালাচ্ছি আর ওই লোকটাকে হারিয়ে দিয়েছে তোমাদের জেনারেলরাই। আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে আমি হারি নি। কিছুদিন সবুর করেই দেখো না কেমন করে মস্কোয় গিয়ে পৌঁছই।'

'তুমি কি মস্কোতে অভিযান করতে চাও?'

ভুয়ো-জার চুপ করে ভাবতে লাগল। তারপর চাপা স্বরে বলল সে:

'ভগবান জানেন! পথ আমার কঠিন, স্বাধীনতা অল্প। আমার দলের লোকেরা সব সময়ে চালাকি খেলছে, চোরের দল তারা। কান খোলা রেখে চলতে হয় সব সময়ে। আমি জানি, প্রথম ঠোক্কর খেলেই আমার মাথা বিক্রি করে ওরা নিজেদের গর্দান বাঁচাবে।'

আমি বললাম, 'তা হলেই দেখো! তার চেয়ে সময় থাকতে নিজেই দল থেকে সরে এসে সম্রাজ্ঞীর কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করাই ভালো নয় কি?'

তিক্ত হাসি হেসে পুগাচেভ বলল, 'না, অনুশোচনা করার সময় আর নেই। আমার জন্যে মার্জনা হবে না। যেমন শুরু করেছি তেমনি চালিয়ে যাব। কে বলতে পারে? হয়ত সাফল্য ঘটে যাবে। জানো তো, গ্রিশ্‌কা ওত্রেপিয়েভ মস্কোয় রাজত্ব করে গেছে।'

'কিন্তু জানো তার পরিণতি কী হয়েছিল? তাকে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, মাথা কেটে তাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়, আর ছাইগুলোকে কামানের নলে ঢুকিয়ে তোপ দাগা হয়।'

'তাহলে শোনো,' কেমন একটা বন্য উন্মাদনায় পুগাচেভ বলে উঠল, 'তোমায় একটা গল্প বলি, ছেলেবেলায় এক কাল্‌মিক বুড়ির কাছে শুনেছিলাম। একবার এক ঈগলপাখি একটা কাককে জিজ্ঞেস করে, ওহে কাক, তুমি এই পৃথিবীতে তিনশ' বছর বেঁচে থাকো কী করে, আর আমার আয়ু মাত্র তেত্রিশ বছর? কাক জবাব দেয়, প্রভু, তার কারণ হচ্ছে

এই — তুমি জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত খাও আর আমি মরা প্রাণীর মাংস খাই। তাই শুনে ঈগলপাখি মনে মনে ভাবল, ঠিক আছে, আমরাও তাই খেয়ে দেখি। বেশ কথা। ঈগল আর কাক তো একসঙ্গে উড়ে চলেছে। এক জায়গায় দেখে একটা মরা ঘোড়া পড়ে আছে। দুজনেই নেমে এল। কাক এক-একবার মাংস ঠোকরায় আর মাংসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। ঈগলপাখি একবার ঠোকরায়, দুবারে ঠোকরায়, তারপর ডানা ঝাপটিয়ে কাককে বলে, না ভায়া কাক, মরা প্রাণীর মাংস খেয়ে তিনশ' বছর বাঁচার চেয়ে জ্যান্ত প্রাণীর রক্ত একবার মাত্র খাওয়াও ঢের ভালো। তারপর ভগবান যা করেন করবেন! কাল্‌মিক স্ত্রীলোকটির গল্প কেমন লাগল তোমার?'

আমি বললাম, 'খুবই চতুর গল্প! কিন্তু আমার তো মনে হয়, খুন আর লুটপাট করে বেঁচে থাকাটা মরা প্রাণীর মাংস ঠোকরানোর মতোই।'

পুগাচেভ অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে, কিন্তু কোনো জবাব দিলে না। নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়ে দুজনেই চুপ করে গেলাম। তাতার লোকটি বিষণ্ণ একটা গান ধরল। কোচোয়ানের আসনে বসে বসে ঢুলছে সাভেলিচ। শীতকালের মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে স্লেজগাড়ি। হঠাৎ একসময়ে সামনের দিকে দেখা গেল ইয়াইক নদীর খাড়া পাড়ের ওপরে সেই গ্রাম, গ্রামের ঘণ্টাঘর আর খুঁটির বেড়া। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমাদের গাড়ি বেলোগর্স্ক কেল্লায় ঢুকল।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনাথা

আমাদের আপেল গাছের
নেই কো কচি ডাল, নেই কো মাথার চূড়ো;
আমাদের রাজকুমারীর
নেই কো বাবা-মা, নেই কো কেউ গো,
যে সাজাবে কনের সাজে,
যে করবে আশীর্বাদ।

বিয়ের গান।

স্লেজগাড়ি এসে থামল অধিনায়কের বাড়ির অলিন্দে। ঘণ্টার শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পেরেছে যে স্লেজগাড়িটা পুগাচেভের। সবাই ভিড় করে ছুটে এল আমাদের পিছনে পিছনে। ভুয়ো-জারকে শ্ভাব্রিন স্বাগত করল অলিন্দে। পরনে কসাক ধরনের পোশাক, দাড়িও রেখেছে। বিশ্বাসঘাতকটা পুগাচেভের স্লেজগাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল। কদর্য মুখভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আনন্দ আর উৎসাহ। আমার ওপর চোখ পড়তেই যেন থতমত খেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তা হলে তুমিও আমাদের দলে? অনেক আগেই এলেই পারতে!' আমি একটিও কথা না বলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

ঘরে এসে ঢুকলাম। সেই পরিচিত ঘর, অতীত দিনের বিষণ্ণ স্মৃতিচিহ্নের মতো অধিনায়কের ডিপ্লোমাটা তখনো দেওয়ালে ঝুলছে। দেখে আমার বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। যে সোফাটিতে বসে ইভান কুজমিচ স্ত্রীর প্যানপ্যানানি শুনতেন আর ঢুলতেন, সেই একই সোফায় বসেছে পুগাচেভ। শ্ভাব্রিন নিজে ভদ্কা নিয়ে এল পুগাচেভের

জন্যে। একপাত্র ভদ্কা খেয়ে পুগাচেভ আমাকে দেখিয়ে শ্ভাব্রিনকে বলল, 'ওঁকেও মান্য করো।' শ্ভাব্রিন ট্রে হাতে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি এই দ্বিতীয়বার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ও যেন অস্বস্তি বোধ করছে। সন্দেহ নেই যে তার সহজাত বোধশক্তি থেকে সে টের পেয়েছে যে পুগাচেভ তার প্রতি অপ্রসন্ন। পুগাচেভের সামনে সে ভয়ে কাঁচুমাচু, মাঝে মাঝে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে আমার দিকে। কেল্লার অবস্থা, শত্রুসৈন্য সম্পর্কে গুজব ইত্যাদির খোঁজখবর নিয়ে পুগাচেভ হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল:

'বলো তো ভায়া, যে তরুণীটিকে তুমি আটক রেখেছ, সে কে? তাকে আমি একবার দেখতে চাই।'

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল শ্ভাব্রিন।

আমতা আমতা করে বলল: 'তাকে আমি আটক করি নি, হুজুর... তার অসুখ... কুমারী ঘরে আছে সে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ভুয়ো-জার বলল, 'তা হলে চলো তার ঘরেই যাওয়া যাক।' পুগাচেভের কথা অমান্য সম্ভব নয়, পুগাচেভকে পথ দেখিয়ে সে নিয়ে গেল মারিয়া ইভানভনার ঘরে। পিছনে পিছনে আমিও হাজির হলাম।

সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে শ্ভাব্রিন বলল:

'হুজুর, আপনি আমাকে যা খুশি হুকুম করতে পারেন। আমি নিশ্চয়ই মেনে চলব। কিন্তু একজন বাইরের লোককে আমার স্ত্রীর শোবার ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

বুক আমার অস্থির হয়ে উঠল:

'কী, বিয়ে হয়ে গেছে তোমার!' সেই মুহূর্তে লোকটাকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারতাম।

'আস্তে! এটা আমার ব্যাপার।' আমাকে থামিয়ে দিয়ে শ্ভাব্রিনের দিকে ফিরে পুগাচেভ বলতে লাগল, 'ও সব চালাকি রেখে দাও, ন্যাকামি করো না। মেয়েটি তোমার স্ত্রী হোক বা না হোক, যাকে খুশি তাকে আমি মেয়েটির কাছে নিয়ে যাব। হুজুর, এসো আমার পেছু পেছু।'

ঘরের দরজার সামনে এসে শ্ভাব্রিন আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাঙা ভাঙা আর্তস্বরে বলে উঠল:

'হুজুর, আপনাকে আগে থেকেই বলে রাখছি, তিনদিন ধরে মেয়েটি জ্বরে বেঁহুস হয়ে পড়ে আছে আর প্রলাপ বকছে।'

'দরজা খোলো,' পুগাচেভ বলল।

শ্ভাব্রিন পকেট হাতড়ে বলল যে চাবি সে সঙ্গে আনে নি। পুগাচেভ লাথি মারল দরজায়। তালা ভেঙে দরজা খুলে গেল। আমরা ঘরের ভিতরে ঢুকলাম।

একবার তাকিয়ে দেখেই আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। কৃষক-নারীর ছিন্নভিন্ন বেশে মারিয়া ইভানভনা মেঝের ওপরে বসে আছে, রোগা ফ্যাকাশে চেহারা, উশকো-খুশকো চুল। সামনে একঘটি জল আর ঘটির ওপরে এক চাবড়া রুটি। আমাকে দেখে সে শিউরে চিৎকার করে উঠল। আমার তখন কী অবস্থা হয়েছিল, কিছুই মনে নেই।

শ্ভাব্রিনের দিকে তাকিয়ে তিক্ত ব্যঙ্গের হাসি হেসে পুগাচেভ বলল:

'বাঃ বাঃ, চমৎকার তোমার হাসপাতাল!' তারপর মারিয়া ইভানভনার কাছে গিয়ে বলল, 'লক্ষ্মীটি, বলো তো শুনি তোমার স্বামী তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে কেন? কী দোষ করেছিলে তুমি?'

মারিয়া ইভানভনা পুনরুক্তি করল, 'স্বামী? ওই লোকটা আমার স্বামী নয়। আমি কিছুতেও ওর স্ত্রী হতে পারব না। আমি পণ করেছি যে আমি মরব। মরবই আমি, কেউ যদি আমাকে উদ্ধার না করতে পারে।'

শ্ভাব্রিনের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুগাচেভ বলল:

'তোমার সাহস তো কম নয় — আমাকে ধাপ্পা দিতে চাও! জানো তুমি, অকর্মার ধাড়ী, কী তোমার যোগ্য শাস্তি!'

শ্ভাব্রিন নতজানু হয়ে বসে পড়ল... সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত আক্রোশ আর ক্রোধ চাপা পড়ে গেল ঘেন্নায়। এক আইনভঙ্গকারী পলাতক কসাকের পায়ের কাছে লুটোপাটি খাচ্ছে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক — দেখে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। একটু নরম হল পুগাচেভ, শ্ভাব্রিনকে সে বলল:

'তোমাকে এবার ক্ষমা করছি। কিন্তু জেনে রাখো। তোমার প্রথম দোষেই এটাও মনে রাখা হবে।'

তারপর মারিয়া ইভানভনার দিকে তাকিয়ে কোমল স্বরে বলল:

'বেরিয়ে এসো সুন্দরী। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। আমি রাজা।'

চকিতে মুখ তুলে তাকাল মারিয়া ইভানভনা। বুঝতে পেরেছে তার সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে, সে-ই খুন করেছে তার বাপ-মাকে। দুহাতে মুখ ঢেকে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি ছুটে গেলাম তার দিকে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পুরনো পরিচিতা পালাশা কোনোদিকে দৃকপাত না করে সাহসে ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। প্রভুকন্যার শুশ্রূষার কাজে লেগে গেল সে। পুগাচেভ বেরিয়ে এল আর আমরা তিনজনে এলাম বসবার ঘরে।

হাসতে হাসতে পুগাচেভ বলল, 'তা হলে হুজুর? সুন্দরীকে উদ্ধার করা গেল, এবার তা হলে পাদ্রিকে ডেকে পাঠাই, সে এসে তার ভাইঝিকে সম্প্রদান করুক, কী বলো? আমি হব বরকর্তা, শ্ভাব্রিন হবে বরের বন্ধু! লাগাও হুল্লোড়, ঢালো মদ, ফটকে দাও তালা।'

আমার যা ভয় ছিল তাই ঘটল। পুগাচেভের প্রস্তাব শুনে ক্রোধে অন্ধ হয়ে শ্ভাব্রিন উন্মত্তের মতো চিৎকার করে উঠল:

'হুজুর, আপনার কাছে মিথ্যে বলা আমার অপরাধ হয়েছিল। কিন্তু গ্রিনেভও আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছে। মেয়েটি এখানকার পাদ্রির ভাইঝি নয়। এ হচ্ছে, কেল্লা দখলের সময়ে যাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, সেই ইভান মিরোনভের মেয়ে।'

আগুন-ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল পুগাচেভ।

ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে প্রশ্ন করল, 'এ আবার কী?'

দৃঢ় স্বরে আমি জবাব দিলাম, 'শ্ভাব্রিন সত্যি কথাই বলেছে।'

পুগাচেভের মুখটা কালো হয়ে উঠল। সে মন্তব্য করল, 'এ কথা তুমি আমায় তো বলো নি।'

'তুমি নিজেই ভেবে দেখো,' আমি উত্তর দিলাম, 'তোমার দলের লোকেদের সামনে বলতে পারতাম কিনা মিরোনভের মেয়ে বেঁচে আছে। তা হলে আর তাকে কিছুতেই বাঁচানো যেত না। সবাই মিলে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলত!'

পুগাচেভ হেসে বলল, 'এটাও ঠিক কথা, আমার মাতালগুলো বেচারি মেয়েটিকে মায়া করত না। পাদ্রির বৌ ওদের ঠকিয়ে উচিত কাজই করেছিল।'

পুগাচেভ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে বুঝতে পেরে আমি বললাম, 'শোনো, জানি না কী বলে তোমায় ডাকব, জানতেও চাই না... কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তুমি আমার জন্যে যা করেছ তার বিনিময়ে হাসিমুখে আমার জীবন দিয়ে প্রতিদান দিতে পারি। তুমি কেবল চেয়ো না যা আমার আত্মসম্মানের ও খ্রীষ্টীয় বিবেকের পরিপন্থী। তুমি আমার হিতৈষী। তুমি যা শুরু করেছ তা শেষ করো, বেচারা এই অনাথাকে আর আমাকে মুক্তি দাও। ভগবান যেদিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকেই আমরা চলে যাই। আর তুমি যেখানেই থাকো না কেন, তোমার ভাগ্যে যাই ঘটুক প্রতিটি দিন তোমার পাপী আত্মার মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করব...'

কথাগুলো যেন কঠোর-হৃদয় পুগাচেভকে স্পর্শ করল। সে বলল, 'তোমার কথাই থাক। শাস্তি দিতে হলে আমি শাস্তিই দিই। ক্ষমা করলে ক্ষমাই করি। এই হচ্ছে আমার স্বভাব। সুন্দরীকে তুমি নিয়ে যাও। চলে যাও যেখানে খুশি। ভগবান তোমাদের ভালোবাসা আর সুবুদ্ধি দিন!'

এই বলে সে শ্ভাব্রিনের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ জারি করল যেন আমাকে একটা শংসাপত্র দেওয়া হয় যা নিয়ে আমি পুগাচেভের অধীন সমস্ত চৌকি আর কেল্লায় অবাধে যাতায়াত করতে পারি। শ্ভাব্রিন একেবারে লাঞ্ছিত হয়ে পাথর বনে গেছে মনে হল। পুগাচেভ তারপর কেল্লা পরিদর্শনে বার হল। শ্ভাব্রিন গেল সঙ্গে। আমাদের যাত্রার তোড়জোড় করতে হবে — এই অজুহাতে আমি রয়ে গেলাম।

ছুটে গেলাম মারিয়া ইভানভনার ঘরে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় ঘা দিলাম। পালাশা জিজ্ঞেস করল: 'কে?' নিজের নাম বললাম আমি। দরজার ওপাশ থেকে মারিয়া ইভানভনার মধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'পিওতর আন্দ্রেইচ, একটু দাঁড়ান। আমি পোশাক বদলাচ্ছি। আকুলিনা পাম্ফিলভনার কাছে যান, এক্ষুনি আমিও যাচ্ছি সেখানে।'

মারিয়া ইভানভনার কথামতো আমি গিয়ে হাজির হলাম পাদ্রি গেরাসিমের বাড়িতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছুটে এলেন আমার কাছে। সাভেলিচ আগেই তাঁদের জানিয়ে রেখেছিল। পাদ্রির বৌ বললেন, 'পিওতর আন্দ্রেইচ, নমস্কার! ভগবানের ইচ্ছেয় আবার আমাদের দেখা হল। তারপর,

দিন কাটছে কেমন ? আমরা তো রোজই আপনার কথা বলাবলি করি। আপনি যখন ছিলেন না, সে সময়ে মারিয়া ইভানভনার কী দুর্ভোগটাই না গেছে। বেচারি!.. কিন্তু আমাদের বলুন শুনি, পুগাচেভের সঙ্গে আপনার এত খাতির হয়ে গেল কী করে? এখনো আপনাকে ফাঁসি দিল না যে! সেটাই আশ্চর্য। যাই হোক, অন্তত এ জন্যেও শয়তানটাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত।' স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়ে পাদ্রি গেরাসিম বললেন, 'হয়েছে গো হয়েছে। পেটের সমস্ত কথা বার না করলেও চলবে। আলগা জিভ হলেই তো বিপদ — ওতে কখনো মঙ্গল হয় না। পিওতর আন্দ্রেইচ, ভেতরে আসুন, আসুন। বহুকাল আমাদের দেখা নেই।'

পাদ্রির বৌ ভাঁড়ার উজাড় করে খেতে দিলেন আমাকে। তাঁর মুখের কথায় কিন্তু একটুও কামাই নেই। তাঁর কাছেই শুনলাম, মারিয়া ইভানভনাকে ওর হাতে তুলে দেবার জন্যে কীভাবে শ্ভাব্রিন তাঁদের বাধ্য করেছে, কীভাবে মারিয়া ইভানভনা কেঁদেছে, তাঁদের কাছ থেকে যেতে চায় নি, কীভাবে মারিয়া ইভানভনা পালাশার মারফত বরাবর যোগাযোগ রেখেছে তাঁদের সঙ্গে (পালাশা মেয়েটা কিন্তু খুবই তুখোড়, এমনকি সার্জেন্টটাকে পর্যন্ত ও খুশিমতো নাচায়), কীভাবে তিনি আমাকে চিঠি লেখবার জন্যে মারিয়া ইভানভনাকে পরামর্শ দিয়েছেন, এমনি সব কথা। আমার পালা আসতে আমিও আমার কাহিনী সংক্ষেপে বললাম। পাদ্রি এবং পাদ্রির বৌ যখন শুনলেন যে তাঁদের ছলনার কথা পুগাচেভ জেনে ফেলেছে — তখন দুজনেই বুকের ওপরে ক্রুশচিহ্ন আঁকলেন। আকুলিনা পাম্‌ফিলোভনা বললেন, 'ঈশ্বরই আমাদের শক্তি। প্রভু, এই ঝড়ো মেঘ উড়িয়ে দাও। তা হলে দেখা যাচ্ছে আলেক্সেই ইভানভিচ বেশ ঘুঘু লোক!' এমন সময়ে দরজাটা খুলে গেল। ফ্যাকাশে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঘরে ঢুকল মারিয়া ইভানভনা। কৃষক-নারীর বেশ সে ছেড়ে দিয়েছে, এখন তার সাজপোশাক আগেকার মতোই সাদাসিধে আর মনোমুগ্ধকর।

আমি ওর হাতটা ধরে রেখে বহুক্ষণ একটি কথাও বলতে পারলাম না। আমাদের দুজনেরই হৃদয় এত কানায় কানায় ভরে আছে যে কথার স্থান নেই সেখানে। গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁদের সঙ্গে কথা বলবার মতো অবস্থা আমাদের নয়, তখন দুজনেই ঘর ছেড়ে

চলে গেলেন। আমরা একা। ভুলে গেলাম সব কিছু। প্রাণ ভরে কথা বললাম দুজনে, কথা আর ফুরোয় না। মারিয়া ইভানভনা আমাকে বলতে লাগল, কেল্লা দখলের পর থেকে ওর জীবনে কী কী ঘটেছে, তার অবস্থা হয়েছিল কী ভয়াবহ, পাষণ্ড শ্ভাব্রিনটা তাকে কী বিপদের মধ্যে ফেলেছিল। অতীতের সুখী জীবনের কথাও আমরা বলাবলি করলাম... দুজনেই কাঁদলাম আমরা... শেষ পর্যন্ত আমি আমার প্রস্তাব খুলে বললাম। পুগাচেভের ক্ষমতাধীন এবং শ্ভাব্রিন শাসিত এই কেল্লায় ওকে ফেলে রেখে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অবরোধের সমস্ত দুর্দশা ভুগছে ওরেনবুর্গ, শহরে যাবার চিন্তাও আপাতত ত্যাগ করতে হবে। সারা পৃথিবীতে আত্মীয় বলতে ওর আর কেউ নেই। আমি প্রস্তাব দিলাম যে আমার দেশের বাড়িতে আমার বাপ-মার কাছে ও চলে যাক। প্রথমে ও ইতস্তত করল, কারণ ওর প্রতি আমার বাবার বিরূপ মনোভাবের কথা ও জানত এবং তা নিয়ে ওর মনে বেশ ভয়ও ছিল। কিন্তু ওকে আমি আশ্বস্ত করলাম। আমি জানতাম যে দেশের জন্যে যে যোদ্ধা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর কন্যাকে আশ্রয় দেওয়া আমার বাবা কর্তব্য বলে মনে করবেন এবং এতে তিনি গৌরব বোধ করবেন। শেষকালে আমি বললাম, 'প্রিয়তমা মারিয়া ইভানভনা, আমি তোমাকে আমার স্ত্রী বলে মনে করি। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা দুজনে চিরকালের জন্যে একসঙ্গে বাঁধা পড়েছি। এখন আর কোনো কিছুই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না।' সহজভাবে মারিয়া ইভানভনা আমার কথা শুনল, ছিল না তার ভান করা সঙ্কোচ অথবা কৃত্রিম কুণ্ঠা। ওর ভাগ্য যে আমার সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে, সেটা সে টের পাচ্ছিল। কিন্তু ফের সে আর একবার আমাকে জানিয়ে রাখল যে আমার বাপ-মার অনুমতি পেলে তবেই সে আমার স্ত্রী হবে। আমি ওর কথায় আপত্তি করলাম না। গভীর আবেগ আর আন্তরিকতায় আমরা দুজনে দুজনকে চুমু খেলাম। এইভাবেই আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সার্জেণ্ট আমাকে দিয়ে গেল শংসাপত্র, স্বাক্ষরে পুগাচেভের কাকের ছাঁ বকের ছাঁ। সার্জেণ্ট বলল যে পুগাচেভ আমাকে তার কাছে যেতে বলেছে। গিয়ে দেখলাম, পুগাচেভ রওনা হবার জন্যে তৈরি। এই ভয়ঙ্কর মানুষটি, এই পিশাচ, এক আমি ছাড়া আর সবার

সঙ্গে যে দানবের মতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদের দিনে আমার মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল তা প্রকাশ করে বলাটা আমার পক্ষে একটু শক্ত। কিন্তু সত্যকে গোপন করেই বা লাভ কী? সেই মুহূর্তে লোকটির প্রতি সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গিয়েছিল। প্রবল একটা ইচ্ছে জেগেছিল, ওর ওই দুষ্কৃতিকারী সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে আসি এবং সময় থাকতে ফাঁসিকাঠ থেকে উদ্ধার করি ওকে। কিন্তু সেখানে শ্ভাব্রিন এবং আরো অনেক সব লোক ভিড় করেছিল — আমার বুক-ভরা এই সমস্ত কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারি নি।

বন্ধুর মতো আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ভিড়ের মধ্যে আকুলিনা পাম্ফিলভনাকে দেখতে পেয়ে পুগাচেভ তাঁর দিকে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে আঙুল তুলে শাসাল। তারপর গাড়িতে উঠে কোচোয়ানকে বের্দার দিকে যাবার নির্দেশ দিল। গাড়ি যখন চলতে শুরু করেছে তখন মাথাটা গাড়ির ভিতর থেকে আর একবার বার করে আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'বিদায় হুজুর! আবার হয়ত আমাদের দেখা হবে!' দেখা আমাদের হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কী অবস্থায়!..

পুগাচেভ চলে গেল। যার ওপর দিয়ে ওর ত্রয়কা ছুটে চলেছে, সেই শাদা স্তেপের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমি। ভিড় সরে গেছে। শ্ভাব্রিন অন্তর্হিত। পাদ্রির বাড়িতে আমি ফিরে গেলাম। আমাদের যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। আর দেরি করাটা ঠিক মনে করলাম না। অধিনায়কের একটা পুরনো স্লেজগাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র বোঝাই করা হল। সঙ্গে সঙ্গে কোচোয়ান ঘোড়া জুতল গাড়ির সঙ্গে। মারিয়া ইভানভনা গেল গির্জার পিছনদিকে যেখানে ওর বাপ-মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল, শেষ বারের মতো বিদায় নিয়ে আসতে। আমিও ওর সঙ্গে যেতে চাইলাম কিন্তু আমাকে অনুরোধ জানাল আমি যেন ওকে একাই যেতে দিই। কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল ও। গাড়ি তৈরি। পাদ্রি গেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন বাইরের অলিন্দে। গাড়িতে আমরা তিনজন — মারিয়া ইভানভনা, পালাশা আর আমি। কোচোয়ানের আসনে উঠে বসেছে সাভেলিচ। দয়াবতী পাদ্রির বৌ বললেন, 'বিদায় মারিয়া ইভানভনা, আমার আদরের ধন! বিদায় পিওতর

আন্দ্রেইচ, আমাদের ঝলমলে বাজপাখি! শুভ যাত্রা! ভগবান আপনাদের সুখী করুন!' আমরা রওনা হলাম। অধিনায়কের বাড়ির জানলায় শ্ভাব্রিনকে দেখা গেল। তার চোখেমুখে ক্রূর হিংসা ফুটে বেরোচ্ছে। বিজয়ের উল্লাস দিয়ে বিধ্বস্ত শত্রুকে বিদ্ধ করার ইচ্ছা আমার ছিল না। অন্যদিকে আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপর একসময়ে বেরিয়ে এলাম কেল্লার ফটক দিয়ে, বেলোগর্স্ক কেল্লা চিরকালের জন্যে আমাদের পিছনে পড়ে রইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গ্রেপ্তার

'রাগ ক'রো না, ওগো মশায় — এটা আমার কাজ,
ধরে বেঁধে তোমাকে যে জেলে পুরব আজ!'
'বেশ তো আমি তৈরি আছি, কিন্তু আগে তার
আশা করি বলতে পাব বক্তব্য আমার।'

ক্নিয়াজ্নিন।*

ভালোবাসার পাত্রীর সঙ্গে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে যে আবার মিলিত হতে পেরেছি — এটা আমার কাছেই প্রায় অবিশ্বাস্য। আজ সকালেও ওর কথা ভেবে উদ্বেগের যন্ত্রণা সয়েছি। মনে হচ্ছিল যা কিছু ঘটেছে সমস্তটাই একটা ফাঁকা স্বপ্ন। মারিয়া ইভানভনা এক-একবার চিন্তিতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে, এক-একবার তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। মনে হল, ও যেন এখনো ঘোর কাটিয়ে উঠে সজ্ঞান হতে পারে নি। দুজনেই চুপ করে রইলাম। দুজনেরই মন ভারাক্রান্ত। ঘণ্টা দু-একের অলক্ষ্য সময় বাদে আমরা সবচেয়ে কাছের কেল্লাতে এসে পেঁছিলাম। এটাও পুগাচেভের কর্তৃত্বাধীন। এখানে আমাদের গাড়ির ঘোড়া বদলে নেওয়া হল। যত তাড়াতাড়ি তাজা ঘোড়া এনে গাড়ির সঙ্গে জুতে দেওয়া হল, যে দাড়িওলা কসাকটিকে পুগাচেভ অধিনায়কের পদে বসিয়ে গেছে, সে আমাদের যে রকম তোয়াজ করছে, তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে রাজানুগৃহীত ব্যক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। আমাদের কোচোয়ানের বকবকানিটা মাঠে মারা যায় নি।

আবার আমাদের যাত্রা শুরু। অন্ধকার হয়ে এল। এবার ছোট যে শহরটার কাছে এলাম দাড়িওলা কসাকটি আমাদের জানিয়েছে যে সেখানে

শক্তিশালী একটি বাহিনী মোতায়েন আছে এবং তা গিয়ে মিলবে ভুয়ো-জারের বাহিনীর সঙ্গে। শহরে ঢুকবার মুখে শান্ত্রীরা আমাদের থামিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে যায়?' বুক ফুলিয়ে কোচোয়ান জবাব দিল, 'জারের স্যাঙাত আর তাঁর বৌমা!' তারপরই কোথা দিয়ে কি হল, হুসার সৈন্যরা ভয়ঙ্কর গালিগালাজ করে ঘিরে ফেলল আমাদের, গোঁপওলা একজন সার্জেন্ট-মেজর হুঙ্কার ছাড়ল, 'বেরিয়ে আয় শয়তানের স্যাঙাত! দ্যাখ্-না তোকে আর তোর বৌকে কেমন মজাটা টের পাইয়ে দিই!'

আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দাবি করলাম, তারা আমাকে তাদের অধিনায়কের কাছে নিয়ে চলুক। অফিসার দেখে সৈন্যরা গালিগালাজ বন্ধ করল। সার্জেন্ট-মেজর আমাকে নিয়ে গেল মেজরের কাছে। সাভেলিচ আমার সঙ্গ ছাড়ে নি, আপন মনেই বিড়বিড় করে সে বলছে, 'হুঃ! জারের স্যাঙাত! এবার বোঝ ঠ্যালা! জলে কুমির ডাঙায় বাঘ! হে প্রভু! এ সব ঝামেলার শেষ হবে কিসে?' গাড়িটা আমাদের হাঁটার সঙ্গে তাল রেখে পিছনে চলল।

মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর আমরা এসে পৌঁছলাম উজ্জ্বল আলোকিত একটা বাড়ির কাছে। আমার কাছে পাহারা বসিয়ে সার্জেন্ট-মেজর গেল রিপোর্ট করতে। মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে জানাল যে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় হুজুরের নেই। হুকুম হয়েছে আমাকে নিয়ে জেলে পুরতে আর আমার স্ত্রীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে।

'এর মানে কী? উনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি?' রাগে অন্ধ হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম।

সার্জেন্ট-মেজর জবাব দিল, 'তা আমি জানি না হুজুর। আমি শুধু এইটুকু জানি হুজুর, যে বড়ো হুজুরের হুকুম হয়েছে, হুজুরকে ধরে নিয়ে জেলে পুরতে হবে আর হুজুরের বৌকে বড়ো হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

আমি ছুটে গিয়ে অলিন্দে উঠলাম। শান্ত্রীরা আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল না। সোজা গিয়ে ঢুকলাম একটা ঘরের মধ্যে। সেখানে হুসার বাহিনীর পাঁচ-ছ'জন অফিসার তাসের জুয়া খেলছে। মেজর তাস বাঁটছে। কী যে আমি অবাক হলাম মেজরকে চিনতে পেরে, সে হচ্ছে ইভান

ইভানভিচ জুরিন — সেই যে লোকটি সিম্‌বির্স্কের সরাইখানায় আমার কাছে বাজি জিতেছিল!

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ কী সম্ভব? ইভান ইভানভিচ, তুমি নাকি?'

'আরে, আরে, পিওতর আন্দ্রেইচ — তুমি! কী করে এলে? কোত্থেকে আসছ? এসো, এসো এক হাত খেলা হবে নাকি?'

'ধন্যবাদ। বরং আমার থাকবার জায়গাটা দেখিয়ে দেবার হুকুম দাও।'

'থাকবার জায়গা? কেন, আমার সঙ্গেই থেকে যাও-না?'

'তা হয় না। আমি একা নই।'

'তাতে কী হয়েছে, তোমার বন্ধুও আমার সঙ্গে থাকতে পারে।'

'আমার সঙ্গে একজন... মহিলা আছেন, বন্ধু নয়।'

'মহিলা? মহিলা আবার জোটালে কোত্থেকে হে? ওহে বাপু!' (এ কথায় জুরিন এমন অর্থপূর্ণভাবে শিস্ দিল যে প্রত্যেকেই হো-হো করে হেসে উঠল; আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম।)

জুরিন বলে চলল, 'ঠিক আছে। তাই হোক, তোমাকে একটা ঘর দেওয়া হবে। কিন্তু বড়ো আফসোসের কথা... একসঙ্গে একটু ফুর্তি করা যেত আগের বারের মতো... আচ্ছা এক কাজ করো না হে, পুগাচেভের স্যাঙাতনীটিকে এখানেই আনো না কেন? জাহাঁবাজ মেয়েলোক বুঝি? ওকে বলো যে কিচ্ছু ভয় নেই। ভদ্রলোকটি অতি চমৎকার মানুষ, সে তাকে খেয়ে ফেলবে না। আর যদি তেমন সোরগোল করে তবে খানিকটা কড়া দাওয়াই দিয়ে দিলেই চলবে।'

জুরিনকে আমি বললাম, 'বলছ কী? পুগাচেভের স্যাঙাতনী আবার কে? তিনি হচ্ছেন মৃত ক্যাপটেন মিরোনভের কন্যা। তাঁকে আমি বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করেছি এবং তাঁকে নিয়ে চলেছি আমার বাবার কাছে। সেখানে আমি তাঁকে রেখে আসব।'

'ও, তা হলে তোমার কথাই একটু আগে আমার কাছে বলে গেছে? সত্যি, এর মানেটা কী?'

'পরে সব কথা খুলে বলব। কিন্তু এখন দোহাই তোমার, বেচারা মেয়েটিকে একটু আশ্বস্ত করো। তোমার হুসাররা ওঁকে ভারি ভয় পাইয়ে দিয়েছে।'

জ্যুরিন সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল। অনিচ্ছাকৃত যেটুকু ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে সে জন্যে ক্ষমা চাইবার জন্যে নিজে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। সার্জেণ্ট-মেজরকে হুকুম দিল, শহরের সেরা ঘরটিতে যেন মারিয়া ইভানভনার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। আমি থেকে গেলাম ওর কাছেই রাত কাটাবার জন্যে।

রাত্রের খাওয়াদাওয়ার পরে যখন ঘরে আর কেউ রইল না তখন আমি তার কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনল সে ; তারপর আমার কথা শেষ হলে মাথা নেড়ে বলল, 'সবই ভালো কথা, ভাই। কিন্তু, একটা কথা ভালো নয়, দূর ছাই, বিয়ে করতে চাইছ কেন? সৈন্যদলের আমি বিবেকমান অফিসার, তোমায় মিছে কথা বলতে চাই না। বিশ্বাস করো আমায়, বিয়ে করাটা অতি আহাম্মকী ব্যাপার। বৌ আর একপাল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে তোমার কী স্বর্গলাভ হবে শুনি? ধুর, ধুর! আমি বলি কি, ক্যাপটেনের মেয়ের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রেখো না। সিম্‌বির্স্কে যাবার রাস্তা আমি সাফ করেছি, এখন তা নিরাপদ, কালই মেয়েটিকে একাই পাঠিয়ে দাও তোমার বাপ-মার কাছে। আর তুমি নিজে এখানে আমার সৈন্যদলেই থেকে যাও। ওরেনবুর্গে ফিরে যাবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। বিদ্রোহীদের হাতে পড়বে। আর একবার কি আর ছাড়া পাবে? এতে প্রেমের পাগলামি কেটে যাবে আপনা থেকেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

যদিও জ্যুরিনের মতামতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত ছিলাম না, তা সত্ত্বেও আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কর্তব্যবোধ ও সম্মানকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে সম্রাজ্ঞীর সেনাদলে আমার উপস্থিতিটা প্রয়োজন। জ্যুরিনের উপদেশ শিরোধার্য করে আমি স্থির করলাম যে মারিয়া ইভানভনাকে দেশে পাঠিয়ে দেব, আর আমি নিজে থেকে যাব এই বাহিনীতেই

আমার পোশাক ছাড়ার সময় সাভেলিচ এসে দাঁড়াল। তাকে আমি বললাম, পরদিন মারিয়া ইভানভনাকে নিয়ে রওনা হবার জন্যে যেন সে প্রস্তুত থাকে। শুনেই সে বেঁকে বসল: 'কী বলছ দাদাবাবু? তোমাকে ছেড়ে আমি যাব কী করে? কে তোমার দেখাশোনা করবে? কি বলবে তোমার বাপ-মায়েরা?'

আমার খুড়োটির একগুঁয়েমি আমার জানা ছিল। সুতরাং আমি ঠিক করলাম যে অকপটে মিষ্টি কথা বলে তাকে স্বমতে নিয়ে আসব। বললাম, 'আর্খিপ সাভেলিচ, বন্ধু আমার! আমার মুখ চেয়ে এই কাজটি করো। এখানে আমার দেখাশোনা করবার জন্যে কোনো লোকের দরকার নেই। কিন্তু তোমায় ছাড়া মারিয়া ইভানভনাকে যদি একা রওনা হতে হয় তা হলে আমি শান্তি পাব না। ওর দেখাশোনা করলেই আমারও দেখাশোনা করা হবে। কারণ আমি একেবারে মনস্থির করেছি যে অবস্থা অনুকূল হলেই আমি ওকে বিয়ে করব।'

একথা শুনে সাভেলিচ দুহাত তুলে এমন একটা ভাব করল যেন সে আকাশ থেকে পড়েছে।

বলল, 'বিয়ে করবে? এই বয়সেই বিয়ে! শুনলে তোমার বাবা কী বলবেন, কী ভাববেন মা?'

আমি ওকে আশ্বস্ত করলাম, 'বাবা-মার মত হবে, নিশ্চয়ই মত হবে। মারিয়া ইভানভনাকে দেখার পর কিছুতেই তাঁরা অমত হবেন না। এ ব্যাপারে তোমার ওপরে ভরসা করছি। আমার বাপ-মা তোমায় বিশ্বাস করে। আমাদের হয়ে তুমিও কিছু বলবে, তাই না?'

বৃদ্ধ বিচলিত হল, 'ওহ্ দাদাবাবু! তোমাকে আমি আর কী বলব? বিয়ের বয়েস অবিশ্যি তোমার হয় নি। কিন্তু মারিয়া ইভানভনা এমন ভালো মেয়ে যে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। বেশ, তাই হোক! এই সোনার প্রতিমাকে আমিই আগলে নিয়ে যাব। আর তোমার বাবা-মাকে বিনীতভাবে জানাব যে এমন কন্যের জন্যে যৌতুক না হলেও চলে।'

সাভেলিচকে ধন্যবাদ জানালাম। রাত্রিবেলা শুলাম জুরিনের সঙ্গে এক ঘরে। উৎসাহে ও উত্তেজনায় অবিশ্রান্ত বকবক করতে লাগলাম। প্রথম দিকে জুরিন সাগ্রহেই আমার সঙ্গে কথা কইছিল, কিন্তু ক্রমেই তার সাড়া হয়ে এল অসংলগ্ন ও স্বল্পতর। শেষকালে আমার জিজ্ঞাসার জবাবে সে শুধু নাক ডাকাতে লাগল, নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা শিস্ দেওয়ার মতো শব্দ বেরিয়ে আসতে থাকল। আমি চুপ করে গেলাম, কিছুক্ষণ পরে আমিও অনুসরণ করলাম তার দৃষ্টান্ত।

পরদিন সকালে আমি গেলাম মারিয়া ইভানভনার কাছে, ওকে আমার

প্রস্তাব জানালাম। প্রস্তাবটি যে অযৌক্তিক নয় তাও সে স্বীকার করল এবং আমার মতে সায় দিল। জুরিনের সৈন্যদল আজই শহর ছেড়ে চলে যাবে সুতরাং দেরি করবার মতো সময় আর নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। ওর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছেড়ে দিলাম সাভেলিচের হাতে এবং ওর কাছে আমার বাবা-মার নামে একটা চিঠি দিলাম। মারিয়া ইভানভনা কাঁদতে লাগল, চাপা স্বরে বলল, 'বিদায়, পিওতর আন্দ্রেইচ। ঈশ্বর জানেন, আবার তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা! কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমি তোমার কথা মনে রাখব, আমি কবরে যাওয়া পর্যন্ত আমার বুকের মাঝখানে থাকবে শুধু তুমি।' আমি কোনো কথাই বলতে পারলাম না। আমাদের চারদিকে লোক, ওদের সামনে আমি মনের অনুভূতি প্রকাশ করতে চাই নি। অবশেষে ও চলে গেল। ভারি মন নিয়ে আমি জুরিনের কাছে ফিরে এলাম, কারো সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালো লাগছিল না। জুরিন যথাসাধ্য চেষ্টা করল আমাকে চাঙ্গা করে তুলতে, যা হোক একটা কিছুতে মন ফেরাতে আমিও চাইছিলাম। সারাটা দিন কাটল হুল্লোড় আর হুটোপাটির মধ্যে। সন্ধ্যাবেলা শহর ছেড়ে আমরা রওনা হলাম।

তখন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিক। শীতকাল শেষ হয়ে আসছে। এই শীতকালের জন্যেই সামরিক কার্যকলাপে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল, এবার আমাদের জেনারেলরা একসঙ্গে যুক্ত অভিযান করবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। পুগাচেভ এখনো ওরেনবুর্গ অবরোধ করে রেখেছে বটে, কিন্তু ছোটো ছোটো সৈন্যদল এসে অনবরত মিলছে এবং চতুর্দিক থেকে অভিযান শুরু করেছে বিদ্রোহী ঘাঁটির দিকে। বিদ্রোহী গ্রামগুলো আমাদের সৈন্যদলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বশ্যতা স্বীকার করছিল। দস্যুদলেরা পালাচ্ছিল আমাদের কাছ থেকে। সব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল একটা অনুকূল সমাপ্তি আসন্ন।

অল্পদিনের মধ্যেই তাতিস্‌চেভো কেল্লার কাছে প্রিন্স গলিৎসিন পুগাচেভকে পরাস্ত করেন, তার অনুগামীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে, ওরেনবুর্গ অবরোধমুক্ত হয়। মনে হল বিদ্রোহকে চূড়ান্ত এবং মোক্ষম আঘাত হানা গেছে। এই সময়ে জুরিনকে পাঠানো হয় একদল বিদ্রোহী বাশ্‌কিরের

বিরুদ্ধে। আমরা আসার আগেই তারা পালিয়ে যায়, তাদের টিকিটিও দেখতে পেলাম না। বসন্তকালে আমরা এসে আটকে গেলাম একটা তাতার গাঁয়ে। নদীগুলো ফুলেফেঁপে উঠেছে, রাস্তা দুর্গম। নিষ্ক্রিয়ভাবে দিন কাটাতে হয় আমাদের আর আমরা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিই যে দুর্বৃত্ত ও বর্বরদের বিরুদ্ধে এই বিরক্তিকর ও অকিঞ্চিৎকর লড়াই শেষ হবে শীঘ্রই।

কিন্তু পুগাচেভকে ধরা যায় নি। সাইবেরিয়ার লোহা-কারখানা অঞ্চলে আবির্ভাব হয় তার, নতুন করে দল সংগ্রহ করে, এবং দুষ্কৃতি চালিয়ে যেতে থাকে। আবার গুজব শোনা যায় যে পুগাচেভ বিজয়গর্বে অগ্রসর হচ্ছে। সাইবেরিয়ার কেল্লাগুলির ধ্বংসকার্যের কাহিনী আমাদের কানে এল। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই খবর এল যে কাজান বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে এবং ভুয়ো-জার মস্কোর দিকে অভিযান শুরু করেছে। আমাদের সামরিক কর্তারা এতদিন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, তাঁদের স্থির ধারণা ছিল যে ওই ঘৃণ্য বিদ্রোহীটার কোনো ক্ষমতাই নেই। জুরিনের ওপর হুকুম হল, সৈন্যদলকে ভল্‌গা নদী পার করিয়ে নিয়ে যেতে হবে।**

আমাদের অভিযান কিভাবে চলে বা যুদ্ধ কিভাবে শেষ হয়, সেই বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে আমি যাব না। শুধু সংক্ষেপে বলি যে জনসাধারণ-কে চূড়ান্ত দুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। বিদ্রোহীরা যে সব গ্রাম লুটপাট করে গেছে, সেই সব গ্রামের মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হয়। গ্রামে তখনো যেটুকু অন্নসংস্থান থাকে, তা অনিবার্যভাবে আমরাই গ্রাস করি। কোথাও শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। জমিদাররা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। চারদিকে দুর্বৃত্তদের রাজত্ব, অবাধে অত্যাচার চলে। এক-একটা বাহিনীর সর্দার শাস্তি দেয় আর ক্ষমা করে নেহাতই খেয়ালখুশি মতো। আগুন যেখানে জ্বলেছে সেই বিরাট অঞ্চলটার অবস্থা হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর... হে ভগবান, রুশ দেশের বিদ্রোহ, নির্মম ও নিরর্থক বিদ্রোহ, আমাদের যেন আর দেখতে না হয়!

** এইখানে একটি অধ্যায় ছিল যা পুশকিন পরে বাদ দিয়েছেন। শুধু পাণ্ডুলিপির প্রথম খসড়াতেই এই অধ্যায়টিকে পাওয়া যায়।

পুগাচেভ পালাল। পুগাচেভের পশ্চাদ্ধাবন করলেন ইভান ইভানভিচ মিখেল্সন। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শুনতে পেলাম, পুগাচেভ পরাজিত হয়েছে। শেষকালে জুরিনের কাছে খবর এল ভুয়ো-জারের গ্রেপ্তারের আর সেই সঙ্গে অভিযান থামাবার আদেশ। যুদ্ধ শেষ। এবার আমি বাবা-মার কাছে যেতে পারি। মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে এতদিন আমি এক লাইন সংবাদও পাই নি, আবার তাঁদের স্নেহালিঙ্গন পাব, মারিয়া ইভানভনাকে দেখব — এই চিন্তায় আমি একেবারে ডগমগ। ছেলেমানুষের মতো নাচতে লাগলাম। জুরিন হাসে, কাঁধ বাঁকায়, আর বলে, 'বুঝতে পারছি, তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে! যাও বিয়ে করো গিয়ে, ঠ্যালা বুঝবে এখন!'

কিন্তু আমার এই সুখকে যেন মলিন করে দিচ্ছিল অদ্ভুত একটা অনুভূতি। যে দুর্বৃত্ত এত নিরীহ লোকের রক্তপাত করেছে তার চিন্তা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি না, কিছুতেই ভুলতে পারি না তার আসন্ন মৃত্যুদণ্ডের কথা। সখেদে ভাবি, 'ইয়েমেলিয়া! ইয়েমেলিয়া! কেন তুমি বেওনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে না? কেন বুক পেতে বুলেট নিলে না? এর চেয়ে ভালো কিছু আর ভেবে পাও নি।' তার জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটময় মুহূর্তে পুগাচেভ যেভাবে আমার প্রতি দাক্ষিণ্য বর্ষণ করেছে এবং শয়তান শ্ভাব্রিনের কবল থেকে যেভাবে আমার বাগ্দত্তাকে মুক্ত করে দিয়েছে তা আমি ভুলতে পারি না। পুগাচেভের চিন্তার সঙ্গে এইসব চিন্তাও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে।

জুরিন আমাকে ছুটি দিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই আমি আমার বাড়ির লোকজনের মধ্যে উপস্থিত হতে পারব, আবার দেখতে পাব আমার মারিয়া ইভানভনাকে... এমন সময়ে বজ্রপাত হল মাথায় হঠাৎ।

যেদিন আমার রওনা হবার কথা, ঠিক যে সময় আমি রওনা হতে চলেছি, ঠিক সেই মুহূর্তে জুরিন আমার ঘরে এল, হাতে একটা কাগজ, চেহারা অত্যন্ত বিচলিত। আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করে উঠল। অকারণেই কেমন জানি ভয় হতে লাগল আমার। আমার আর্দালিকে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে জুরিন আমাকে বলল যে সে আমাকে কিছু বলতে চায়। উদ্বিগ্ন হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী?' কাগজটা আমার

হাতে দিয়ে সে জবাব দিল, 'সামান্য একটা অপ্রিয় ব্যাপার, পড়ে দ্যাখো এক্ষুনি আমি যা পেয়েছি।' আমি পড়তে শুরু করলাম। এটা একটা গোপন সামরিক আদেশ, পাঠানো হয়েছে সমস্ত সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে। তাতে নির্দেশ আছে যে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে অবিলম্বে যেন গ্রেপ্তার করা হয় আর পাহারাধীনে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কাজানে। সেখানে একটি কমিশন পুগাচেভ সম্পর্কিত ব্যাপারে তদন্ত করছে, সেই কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে আমাকে।

কাগজটা আমার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাচ্ছিল। জুরিন বলল, 'কোনো উপায় নেই। এই আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে। মনে হয় পুগাচেভের সঙ্গে তোমার যে খানিকটা দহরম-মহরম ছিল, যে কোনো সূত্রেই হোক সে খবর সরকারী মহলের কানে উঠেছে। আশা করি, পরিণামে খারাপ কিছু হবে না, তুমি যে কোনো অন্যায় করো নি তা প্রমাণ করতে পারবে কমিশনের সামনে। হতাশ হয়ো না — এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ো।' বিবেকের দিক থেকে আমি গ্লানিমুক্ত। আসন্ন বিচারকে আমি ভয় পাই না। কিন্তু প্রিয়মিলনের মধুর মুহূর্তটিকে হয়ত কয়েকমাসের জন্যেই স্থগিত রাখতে হবে — এই চিন্তাতে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আমার জন্যে গাড়ি তৈরি। জুরিন বন্ধুর মতো আমাকে বিদায় জানাল। আমাকে বসানো হল গাড়িতে। দুজন হুসার সৈন্য খোলা তলোয়ার নিয়ে বসল আমার দুপাশে। গাড়ি চলল রাজপথ ধরে।

আলেক্সান্দর তুর্গেনেভ (১৭৮৪-১৮৪৫) — ঐতিহাসিক, পণ্ডিত, লেখক, উচ্চ রাজপুরুষ। পুশকিনের বয়োজ্যেষ্ঠ সুহৃদ। লিথোগ্রাফ। ১৮৩০

ভ্লাদিমির দাল (১৮০১-১৮৭২) — লেখক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক। কবিবান্ধব। ডুয়েলে আহত পুশকিনের চিকিৎসা করেন।

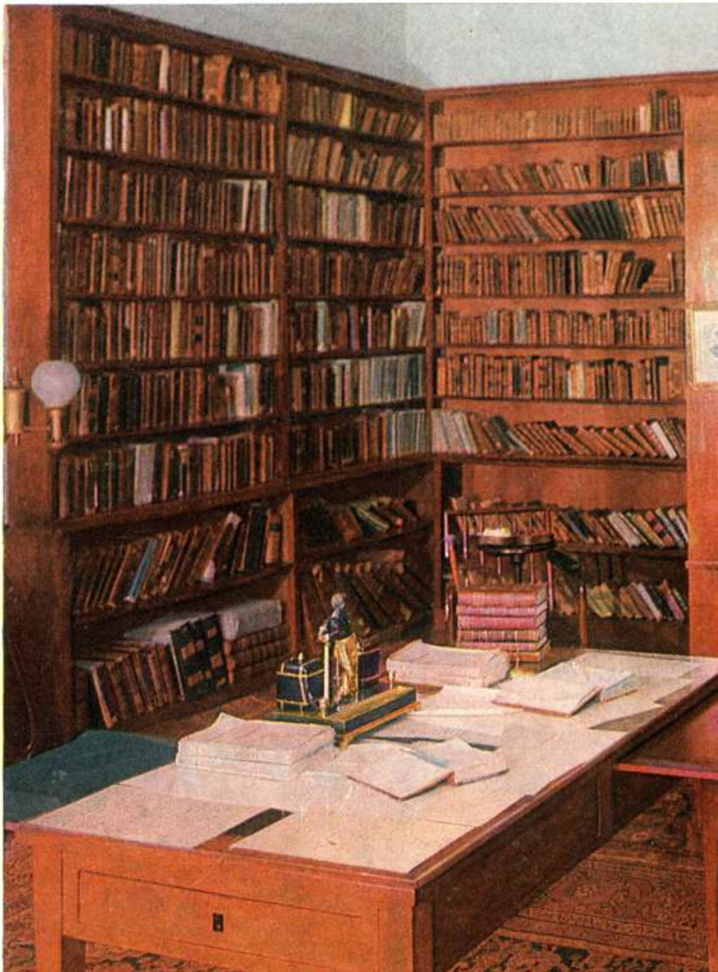

পিটারবুর্গে মোইকা তীরস্থ রাস্তায় পুশকিনের ফ্ল্যাটে তাঁর কাজের ঘর। বর্ত
লেনিনগ্রাদে সারা ইউনিয়ন পুশকিন মিউজিয়ম।

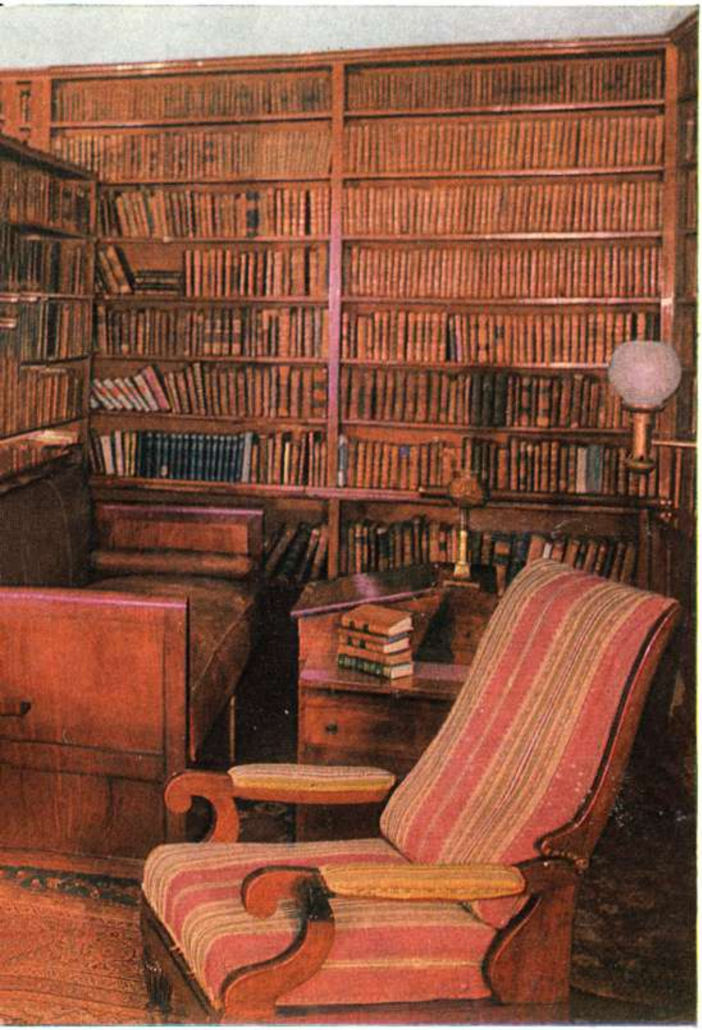

মস্কোয় অপেকুশিন প্রকল্পে পুশকিন স্মরণিক। সারা রাশিয়ার জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে এটির উদ্বোধন হয় ১৮৮০ সালে।

চতুর্দশ অধ্যায়

বিচার

দুনিয়ার গুজব —
দরিয়ার ঢেউ।

প্রবাদ।

এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না যে ওরেনবুর্গ থেকে কাউকে না বলে-কয়ে চলে আসাটাই আমার একমাত্র অপরাধ। তবে আমার আচরণের সপক্ষে অনেক যুক্তি আছে — সেদিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই। শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে বারণ করা তো দূরের কথা, বরাবর খুব বেশি রকম উৎসাহই দেওয়া হয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে অতিরিক্ত আগ্রহ, শৃংখলাভঙ্গ নয়। অপরপক্ষে, পুগাচেভের সঙ্গে যে আমার দহরম-মহরম ছিল তা প্রমাণের জন্যে প্রচুর সাক্ষীসাবুদ পাওয়া যাবে; এবং খুব কম করেও যদি বলা হয়, ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহজনক বলে মনে হতে বাধ্য। কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আর কী ধরনের জবাব দেওয়া উচিত — ভাবতে ভাবতেই সারাটা রাস্তা কাটিয়ে দিলাম। স্থির করলাম যে বিচারকের সামনে সত্য গোপন করব না — এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি।

কাজানে এসে পৌঁছলাম। ভস্মীভূত ছারখার শহর। রাস্তায় বাড়ির বদলে অঙ্গারের স্তূপ, মধ্যে মধ্যে খাড়া আছে ছাদ আর জানলা ছাড়া ঝলসানো দেওয়াল। এই ধরনের সব চিহ্ন রেখে গেছে পুগাচেভ! আমাকে কেল্লায় নিয়ে যাওয়া হল। পোড়া শহরে একমাত্র এই কেল্লাটি ছিল অক্ষত। হুসার সৈন্যরা আমার ভার ছেড়ে দিল পাহারদারদের অফিসারের হাতে।

সে কামার ডাকল। খুব শক্ত করে বেড়ি পরানো হল আমার পায়ে, তারপর নিয়ে গেল বন্দীশালায়। অন্ধকার ঘুপসি একটা কামরা, ন্যাড়া দেওয়াল আর লোহার গরাদে বসানো গবাক্ষ। শুরু হল নিঃসঙ্গ বন্দীজীবন।

এমনধারা শুরুটা কোনো কিছু ভালোর পূর্বাভাস নয়। কিন্তু আমি নিরুৎসাহ হলাম না বা দমে গেলাম না। দুঃখকষ্টে পড়ে সব মানুষই যেভাবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে আমিও তাই করলাম। পবিত্র কিন্তু ক্ষতবিক্ষত অন্তঃকরণ থেকে বেরিয়ে আসা প্রার্থনার মাধুর্য এই প্রথম অনুভব করতে পারলাম। তারপর, আমার ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে জেলরক্ষক এসে আমাকে ডেকে তুলল। বলল যে আমাকে কমিশনের সামনে হাজির হতে হবে। দুজন সৈন্য আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল অধিনায়কের বাড়িতে; সেখানে তারা বাইরের ঘরে থেকে গেল, আমাকে একা ঢুকতে দিল ভেতরের ঘরে।

ঢুকলাম বেশ প্রশস্ত একটা হলঘরে। কাগজপত্র-ছড়ানো একটা টেবিলের সামনে দুজন লোক বসে আছে। একজন প্রবীণ জেনারেল, নিষ্প্রাণ ও কঠোর; অপরজন রক্ষী বাহিনীর একজন তরুণ ক্যাপটেন, বছর আটাশ বয়স, সুদর্শন চেহারা, চটপটে চালচলন, কমনীয় ব্যবহার। সেক্রেটারি বসে আছে জানলার কাছে তার নিজস্ব টেবিলে, কানে গোঁজা পালকের কলম, আমার সাক্ষ্য নেবার জন্যে তৈরি হয়ে কাগজের ওপরে ঝুঁকে আছে। শুরু হল জেরা। আমার নাম ও পদবী জিজ্ঞেস করা হল। জেনারেল জানতে চাইলেন, আমি আন্দ্রেই পেত্রোভিচ গ্রিনেভের পুত্র কিনা? আমি স্বীকার করতেই তিনি কঠোর মন্তব্য করলেন, 'খুবই দুঃখের ব্যাপার যে এমন একজন মাননীয় ব্যক্তির এমন অযোগ্য পুত্র!' শান্তভাবে আমি জবাব দিলাম যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ যাই হোক না কেন, আশা করি খোলাখুলি সত্য কথা বলে আমি তা নিরসন করব। নিজের ওপরে আমার এতটা আস্থা আছে দেখে তিনি যেন অসন্তুষ্ট হলেন, ভ্রূকুটি করে বললেন, 'যতই তুমি চোখা কথা বলো কিন্তু তোমার চেয়েও চালাক লোককে আমরা টিট্ করেছি।'

তরুণ অফিসারটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী করে এবং কখন আমি

পুগাচেভের অধীনে সৈন্যদলে কাজ করেছি এবং কোন কোন বিশেষ কাজে পুগাচেভ আমাকে নিয়োগ করেছে।

আমি ক্রোধের সঙ্গে জবাব দিলাম যে আমি রক্ষী বাহিনীর একজন অফিসার এবং অভিজাত বংশে আমার জন্ম — সুতরাং কোনো অবস্থাতেই আমার পক্ষে পুগাচেভের অধীনে কাজ করা সম্ভব নয় এবং তার কোনো নির্দেশও আমি পালন করতে পারি না।

তরুণ অফিসারটি জেরা চালিয়ে গেল: 'তাহলে এটা কী করে সম্ভব হল যে অফিসার ও অভিজাতদের মধ্যে মাত্র একজনকে ভুয়ো-জার ছেড়ে দেয় আর তার সঙ্গীসাথী সবাইকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে? এটাই বা কী করে সম্ভব হল যে সেই একই অভিজাত অফিসার বিদ্রোহীদের সঙ্গে দোস্তের মতো খানাপিনা করে এবং প্রধান দুর্বৃত্তের হাত থেকে উপহার হিসেবে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট, একটা ঘোড়া আর পঞ্চাশটা কোপেক নেয়? এই অস্বাভাবিক বন্ধুত্বের মূলে যদি বিশ্বাসঘাতকতা না থাকে বা অন্তত নীচ ও জঘন্য কাপুরুষতা না থাকে — তাহলে আর কী থাকতে পারে?'

রক্ষী বাহিনীর অফিসারটির কথায় আমি ভয়ানক আহত হলাম। উত্তেজিত হয়ে শুরু করলাম আমার কৈফিয়ৎ। কী করে তুষার-ঝড়ের মধ্যে স্তেপ অঞ্চলে পুগাচেভের সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং কী করে বেলোগর্স্ক কেল্লা দখল করার পরে সে আমাকে চিনতে পারে ও ক্ষমা করে। ভুয়ো-জারের কাছ থেকে আমি যে বিনা দ্বিধায় ভেড়ার কোট ও ঘোড়া নিয়েছি সে কথা অস্বীকার করি না। তবে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বেলোগর্স্ক কেল্লা রক্ষা করবার জন্যে আমি শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছি। শেষকালে জেনারেলের নাম উল্লেখ করে আমি বলি যে জেনারেল সাক্ষ্য দিতে পারবেন, ওরেনবুর্গ অবরোধের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে শত্রুর বিরুদ্ধে আমার কর্মতৎপরতা কেমন ছিল।

কঠোর চেহারার লোকটি টেবিলের উপর থেকে একটা খোলা চিঠি তুলে নিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন:

'এন্‌সাইন্ গ্রিনেভের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে যে সে নাকি বর্তমান অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত এবং সামরিক আইনকানুন ও

আন্‌গত্যের শপথের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সে দ্‌র্বৃত্তের সহিত যোগসাজশ স্থাপন করিয়াছে। উক্ত গ্রিনেভ সম্পর্কে আপনি যাহা কিছ্‌ জানিতে চাহিয়াছেন তাহার জবাবে আমার বিনীত বক্তব্য এই: উক্ত গ্রিনেভ ১৭৭৩ সালের অক্টোবর মাসের শ্‌র্‌ হইতে বর্তমান বৎসরের ২৪শে ফেব্র্‌য়ারি পর্যন্ত ওরেনব্‌র্গে কার্যনিরত ছিল। শেষোক্ত তারিখে সে শহর হইতে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং অতঃপর আমার অধীনস্থ সৈন্যদলে তাহাকে আর দেখা যায় নাই। দলত্যাগীদের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে প্‌গাচেভের সহিত সে গ্রামে ছিল এবং তাহার সহিত একত্রে সে তাহার প্‌র্বতন কর্মস্থল বেলোগর্স্ক কেল্লায় যায়। তাহার স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে আমার বক্তব্য...' হঠাৎ পড়া থামিয়ে তিনি কঠোর স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর জবাবে তোমার কী বলবার আছে?'

ঠিক করেছিলাম যেভাবে আমি আমার বক্তব্য শ্‌র্‌ করেছিলাম সেইভাবেই বলে যাব, মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্য সমস্ত ঘটনার মতোই আমি গোপন করব না — কিন্তু হঠাৎ একটা অদম্য বিতৃষ্ণা আমায় পেয়ে বসল। মনে হল, যদি আমি মারিয়া ইভানভনার নাম উল্লেখ করি তা হলে ওকে জেরা করবার জন্যে কমিশনের সামনে হাজির করা হবে। একদল দ্‌র্বৃত্তের নীচ কুৎসারটনার সঙ্গে ওর নামও জড়িয়ে যাবে এবং ওকে এসে সশরীরে তাদের সামনে হাজির হতে হবে — ভাবতেই ব্যাপারটা আমার কাছে এমন ভয়ঙ্কর মনে হল যে আমি তোৎলাতে শ্‌র্‌ করি, এলোমেলো হয়ে পড়ে কথা।

বিচারকেরা আমার সম্পর্কে কিছ্‌টা প্রশ্রয়ের মনোভাব নিয়ে আমার বক্তব্য শ্‌নতে শ্‌র্‌ করেছিলেন বলে মনে হয়, কিন্তু হঠাৎ আমাকে এভাবে আমতা আমতা করতে দেখে তাঁদের মন আবার বির্‌প হয়ে উঠল। রক্ষী বাহিনীর অফিসার দাবি জানায় যে প্রধান সংবাদদাতাকে আসামীর সামনে হাজির করা হোক। জেনারেল **গতকালের দ্‌র্বৃত্তটিকে** হাজির করবার হ্‌কুম দিলেন। আমাকে যে অভিয্‌ক্ত করেছে তার উপস্থিতির অপেক্ষায় আমি আগ্রহের সঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছ্‌ক্ষণ পরেই শোনা গেল শিকলের ঝনঝনানি; দরজা খ্‌লে গেল, ভিতরে ঢুকল... শ্‌ভাব্রিন। ওর পরিবর্তনটা অবাক হবার মতো। ভয়ানক রোগা আর

ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মাথার চুল কিছুকাল আগেও ছিল কুচকুচে কালো, এখন তা হয়ে গেছে একেবারে সাদা। লম্বা দাড়িতে বহুদিন চিরুনি পড়ে নি। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি সে আবার বলে গেল। তার গলার স্বর দুর্বল কিন্তু দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তার মতে আমি নাকি পুগাচেভের হুকুমে গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে ওরেনবুর্গে গেছি; রোজই লড়াইয়ে বেরতাম শহরের ঘটনাবলির লিখিত সংবাদ পাঠিয়ে দেবার জন্যে; শেষকালে খোলাখুলি ভুয়ো-জারের দলে যোগ দিই, তার সঙ্গে গাড়িতে চেপে কেল্লা থেকে কেল্লায় ঘুরে বেড়িয়েছি, নিজের বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীসাথীদের সর্বপ্রকারে সর্বনাশ করতে চেষ্টা করি — যাতে তাদের জায়গায় নিজেই বহাল হয়ে বসে ভুয়ো-জারের অনুগ্রহ লাভ করে ধন্য হতে পারি। আমি নিঃশব্দে ওর কথা শুনলাম। আমার কাছে সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার হল এই যে বদমায়েশটা মারিয়া ইভানভনার নাম মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে নি। হয়ত, যে মেয়েটি নাকি এমন ঘৃণার সঙ্গে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে তার নাম মুখে আনতে ওর আত্মসম্মানে লাগছে। নাকি ওর মধ্যে এখনো এমন অনুভূতির ফুলকি থেকে গেছে যা আমারও মধ্যে আছে বলে মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে আমি নির্বাক থাকতে পেরেছি। যে জন্যেই হোক, বেলোগর্স্ক কেল্লার অধিনায়ক-কন্যার নাম কমিশনের কাছে উল্লিখিত হল না। এতে আমার অভিপ্রায়টা আরো জোরালো হয়ে উঠল। বিচারকেরা যখন জিজ্ঞেস করলেন, শ্ভাব্রিনের সাক্ষ্য আমি খণ্ডন করতে পারি কিনা, আমি বললাম যে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আমি ইতিপূর্বে যা বলেছি তা ছাড়া আমার আর কোনো বক্তব্য নেই। তখন জেনারেলের হুকুমে আমাদের ঘর থেকে বার করে নিয়ে আনা হল। একসঙ্গে বেরিয়ে এলাম দুজনে। একটি কথাও না বলে শ্ভাব্রিনের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম। ক্রুর হাসি হেসে শ্ভাব্রিন শিকলটা তুলে ধরে আমার আগে আগে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে গেল। আমি আবার বন্দীশালায় আটক হলাম। সেই সময় থেকে জেরায় হাজির হবার জন্যেও আর কোনোদিন আমার ডাক পড়ে নি।

অতঃপর আমি পাঠকদের কাছে যে ঘটনাবলির বিবরণ দেব তার প্রত্যক্ষদর্শী আমি নই। কিন্তু সে কথা আমি এতবার শুনেছি যে তুচ্ছতম

ঘটনাও আমার স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে। মনে হয় যেন এ সব ঘটনা যখন ঘটে তখন আমি অদৃশ্যভাবে উপস্থিত ছিলাম।

গত শতাব্দীর মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের অন্তরঙ্গ আতিথেয়তা। মারিয়া ইভানভনাকে আমার বাবা-মাও এমনি অন্তরঙ্গ আতিথেয়তায় গ্রহণ করেছিলেন। এই সহায়সম্বলহীনা অনাথা মেয়েটিকে তাঁরা যে আশ্রয় ও ভরসা দিতে পেরেছিলেন, এতে ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত দেখেছিলেন তাঁরা। কিছুদিনের মধ্যেই মেয়েটির প্রতি তাঁদের অন্তরের টান এসে গেল। কারণ মারিয়া ইভানভনার সংস্পর্শে যে-ই আসে সে-ই তাকে না ভালোবেসে পারে না। আমার ভালোবাসাটা তখন আমার বাবার কাছে আর খামখেয়ালি বলে মনে হয় নি। আর অমার মার তো একমাত্র কামনা হয়ে উঠল কী করে তাঁর পেত্রুশার সঙ্গে ক্যাপটেন-কন্যার বিয়ে দেওয়া যায়।

ঠিক এমনি সময়ে আমার গ্রেপ্তারের গুজব এসে পেঁছিল। আমার বাড়ির লোকজনরা একেবারে থ'। ইতিপূর্বে পুগাচেভের সঙ্গে আমার অদ্ভুত যোগাযোগের এমন একটা সহজ বিবরণ মারিয়া ইভানভনার কাছ থেকে আমার বাবা-মা শুনেছিলেন যা তাঁদের কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত করে নি। বরং সে সব কাহিনীর কোনো কোনো অংশ শুনে তাঁরা প্রাণভরে হেসেছিলেন। যে ঘৃণ্য বিদ্রোহের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং অভিজাতশ্রেণীর বিলোপ তার মধ্যে আমি জড়িয়ে থাকতে পারি এ কথা বিশ্বাস করা আমার বাবার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাভেলিচকে তিনি খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেন। আমার খুড়োটি খোলাখুলি বলে যে ইয়েমেলকা পুগাচেভ দাদাবাবুকে ভোজ খাইয়েছে, দুর্বৃত্তটা দাদাবাবুর অনেক উপকারও করেছে — কিন্তু দাদাবাবু যে কোথাও বেইমানি করে নি এ কথা সে হলফ করে বলতে পারে। এ সব শুনে বুড়ো-বুড়ির আতঙ্ক কাটে এবং দুজনেই অধীর হয়ে সুসংবাদের প্রতীক্ষা করতে থাকেন। মারিয়া ইভানভনাও ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল কিন্তু মুখে কিছু বলে নি, কারণ তার স্বভাবের একটা বড়ো গুণ হচ্ছে নম্রতা আর সাবধানতা।

কয়েক সপ্তাহ কাটে... বাবা হঠাৎ একটা চিঠি পেলেন পিটারবুর্গ

আমাদের আত্মীয় প্রিন্স 'ব'-এর কাছ থেকে। আমার সম্পর্কে চিঠি। চিঠির যথারীতি শুরুর পর প্রিন্স 'ব' জানিয়েছেন যে বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, দুঃখের বিষয় এমন সন্দেহ পোষণ করবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, এক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থানীয় মৃত্যুদণ্ড আমার উপযুক্ত শাস্তি; কিন্তু আমার বাবার বৃদ্ধ বয়েস এবং অতীতের রাজসেবার কথা মনে রেখে সম্রাজ্ঞী তাঁর কুলাঙ্গার পুত্রটিকে ক্ষমা করবেন স্থির করেছেন এবং ফাঁসিমঞ্চে অগৌরবের মৃত্যুর পরিবর্তে সাইবেরিয়ার দূরপ্রান্তে আজীবন নির্বাসন দিয়েছেন।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাত আমার বাবাকে মৃতপ্রায় করে তোলে। চরিত্রের স্বাভাবিক দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেন তিনি এবং মনের দুঃখকে (যা অন্য সময়ে চাপা থাকে) তিক্ত বিলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে থাকেন। উত্তেজিত হয়ে বারবার বলতে থাকেন: 'আমার — আমার ছেলে কিনা শেষকালে গিয়ে পুগাচেভের সঙ্গে ষড় করল! হা ভগবান, এও দেখতে হল আমাকে! সম্রাজ্ঞী ওর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা মকুব করেছেন! কিন্তু তাতে আমার সান্ত্বনা কোথায়? ফাঁসিটা আতঙ্কের ব্যাপার নয়! আমার একজন পূর্বপুরুষেরও তো ফাঁসি হয়েছে — কিন্তু তিনি প্রাণ দিয়েছেন নিজের বিশ্বাসের মর্যাদা রাখার জন্যে! আমার বাবা তো ভলিন্স্কি আর খ্রুস্‌শেভের* সঙ্গে শহীদ হয়েছেন! কিন্তু অভিজাত-বংশের ছেলে যদি শপথ ভঙ্গ করে, যদি গিয়ে যোগ দেয় শয়তান, খুনী আর রাস্তার ছোটলোকের দলে — তা হলে আর মুখ দেখানো যায় না!.. এ যে আমাদের বংশের কলঙ্ক!..' আমার বাবাকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলবার সাহসটুকুও আমার মায়ের থাকে না, বাবাকে তিনি নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করতেন, বলতেন যে, গুজব কখনো সত্যি হয় না, মানুষের মতামতের কোনো স্থিরতা নেই, ইত্যাদি। কিন্তু আমার বাবা কোনো কথাতেই প্রবোধ মানতে চান না।

সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করে মারিয়া ইভানভনা। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতাম। সে আসল ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে পারে এবং আমার এই দুর্ভোগের জন্যে মনে মনে নিজেকে দায়ী করতে থাকে। কী করে আমাকে উদ্ধার

করা যায়, এই হয়ে ওঠে তার সর্বক্ষণের চিন্তা; কারো সামনে চোখের জল ফেলে না বা নিজের যন্ত্রণাকে প্রকাশ করে না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমার বাবা সোফায় বসে রাজ্য-পঞ্জিকার পাতা উল্টোচ্ছিলেন। তাঁর চিন্তা উধাও হয়ে গিয়েছিল অন্য এক জগতে। পড়া থেকে কোনো ফল হচ্ছিল না। আগেকার দিনের একটা পল্টনী সুর শিস্ দিয়ে গাইছিলেন তিনি। আমার মা বসেছিলেন নির্বাক হয়ে, একটা উলের জামা বুনছিলেন তিনি, মাঝে মাঝে তাঁর চোখের জল টপ্‌টপ্ করে ঝরে পড়ছিল তাতে। একটা সেলাই হাতে নিয়ে মারিয়া ইভানভনা বসে ছিল মার পাশে। হঠাৎ সে জানায় যে অবস্থার চাপে বাধ্য হয়ে তাকে একবার পিটারবুর্গে যেতে হবে এবং আমার বাবা-মা যেন তার জন্যে একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দেন। শুনে আমার মার খুবই দুঃখ হয়। তিনি বলেন, 'তোমার পিটারবুর্গে যাবার কী দরকার পড়ল? তুমিও আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছ নাকি মারিয়া ইভানভনা?' জবাবে মারিয়া ইভানভনা বলল যে এই যাত্রার ওপরেই তার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। পিটারবুর্গে গিয়ে সে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার বাবা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন তাঁর মেয়ে হিসেবে।

আমার বাবা মাথা নিচু করে থাকলেন। নিজের ছেলের তথাকথিত অপরাধের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এমন যে কোনো কথাই তাঁর কাছে যন্ত্রণাদায়ক; তাঁর মনে হত কেউ যেন তাঁকে ভর্ৎসনা করছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'তোমাকে আর কী বলব মা! তুমি যাও, আমরা তোমার সুখের পথে বাধা হব না। ঈশ্বর করুন, তুমি যেন খুব ভালো স্বামী পাও। যাকে সবাই বিশ্বাসঘাতক বলে জানে এমন লোক যেন না হয়।' এই বলে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরে যখন আমার মা ছাড়া আর কেউ থাকে না তখন মারিয়া ইভানভনা আমার মার কাছে তার অভিপ্রায়ের কথা খানিকটা প্রকাশ করে বলল। আমার মা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মারিয়া ইভানভনাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন মারিয়া ইভানভনার উদ্দেশ্য সফল হয়। যাত্রার আয়োজন চলতে থাকল এবং দিনকয়েক পরে বিশ্বস্ত ঝি পালাশা আর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী সাভেলিচকে

নিয়ে মারিয়া ইভানভনা যাত্রা শুরু করল। সাভেলিচ আমাকে ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল; এবার আমার ভাবী বধূকে কিছুটা সাহায্য করতে পারছে ভেবে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করল।

ম্যারিয়া ইভানেভনা নিরাপদে সোফিয়ায় পেঁছিল। ডাক-স্টেশনে এসে শুনল যে ত্‌সারস্কোয়ে সেলোতে রাজদরবার বসেছে। তাই ঠিক করল, সেখানেই থেকে যাবে। পার্টিশনের পেছনে একটুখানি ঠাঁই মিলল। ডাক-বাবুর বৌ তক্ষুনি আলাপ জুড়ে দিল তার সঙ্গে, এও জানিয়ে দিল যে সে হচ্ছে রাজদরবারের চুল্লীদারের ভাইঝি এবং রাজদরবারের অনেক সব গোপন তথ্য মারিয়া ইভানভনার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। বললে, সম্রাজ্ঞী কখন ঘুম থেকে ওঠেন, কখন কফি খান, কখন বেড়াতে যান, বেড়াতে যাবার সময়ে পরিষদদের মধ্যে কে কে তাঁর সঙ্গে থাকেন, আগের দিন ভোজের টেবিলে তিনি কী কী মন্তব্য করেছেন, সন্ধ্যার সময় কে কে তাঁর দর্শনপ্রার্থী ছিল, ইত্যাদি। মোটা কথায় আন্না ভ্‌লাসিয়েভনা যা বললেন, সেটা হল ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা নোটের সমতুল্য, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে তা মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য হতে পারে। মারিয়া ইভানভনা মন দিয়ে তার কথা শুনল। পার্কে বেড়াতে গেল দুজনে। আন্না ভ্‌লাসিয়েভনা সঙ্গিনীকে প্রতিটি তরুবীথি ও প্রতিটি সাঁকোর ইতিবৃত্ত বললেন। বেড়ানো শেষ করে দুজনে যখন আবার ডাক-ঘাঁটিতে ফিরে এল, ততক্ষণে বেশ ভাব হয়ে গেছে তাদের মধ্যে।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠল মারিয়া ইভানভনা, সাজপোশাক করল, তারপর নিঃশব্দে পার্কে চলে গেল। ভারি সুন্দর সকাল, লাইমগাছের চূড়াগুলো সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত। শরতের তাজা হাওয়ায় ইতিমধ্যেই হলদে ছোপ ধরেছে লাইমগাছের পাতায়। প্রশস্ত সরোবর নিথর হয়ে ঝকঝক করছে। ঘুম ভেঙে রাজহাঁসগুলো কিনারের ছায়াছন্ন ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে ভেসে যাচ্ছে দেমাকী চালে। ভারি চমৎকার একটা মাঠ দিয়ে গেল মারিয়া ইভানভনা। সেখানে সদ্য একটা স্মৃতিস্তম্ভ* তোলা হয়েছে কাউণ্ট পিওতর আলেক্সান্দ্রোভিচ রুমিয়ান্‌ৎসেভের সাম্প্রতিক জয়লাভের সম্মানে। হঠাৎ একটা ছোট্ট সাদা বিলিতী কুকুর ঘেউঘেউ করতে করতে মারিয়া ইভানভনার দিকে ছুটে

এল। আতঙ্কে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। আর ঠিক সেই সময়ে শোনা গেল মিষ্টি মেয়েলি একটা গলা, 'ভয় নেই। ও কামড়াবে না।' স্মৃতিস্তম্ভের উল্টোদিকে একটা বেঞ্চিতে একজন মহিলাকে বসে থাকতে দেখল সে। মারিয়া ইভানভনা গিয়ে বসল বেঞ্চিটার অপর প্রান্তে। মহিলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে, আর সেও মাঝে মাঝে আড়চোখে চেয়ে মহিলার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে নিল। পরনে তার সাদা প্রভাতী পোশাক, রাতটুপি আর তুলো-ভরা জ্যাকেট। মনে হল মহিলার বয়স প্রায় চল্লিশ। ভরাট মুখ, লালচে গাল, তাতে ফুটে উঠেছে গুরুত্ব আর স্থৈর্যের ভাব। তাঁর নীল চোখে ও মুখের মৃদু হাসিতে এমন একটা আকর্ষণ আছে যা ভাষায় বর্ণনা যায় না। তিনিই প্রথম নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে বললেন।

'আপনি নিশ্চয়ই এখানে নতুন এসেছেন — না?'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। মাত্র গতকাল আমি মফস্বল থেকে এসেছি।'

'বাড়ির লোকজনের সঙ্গে?'

'আজ্ঞে না, আমি একা-একাই এসেছি।'

'একা-একা? এইটুকু বয়সে একা-একা!'

'আমার বাবাও নেই, মাও নেই।'

'নিশ্চয়ই কোনো একটা দরকারী কাজে এখানে এসেছেন — নয় কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি সম্রাজ্ঞীর কাছে একটি আবেদন জানাতে এসেছি।'

'আপনার তো মা-বাবা নেই। মনে হয়, আপনি কিছু একটা অন্যায়ের প্রতিকার চাইতে এসেছেন?'

'আজ্ঞে না। আমি বিচার চাইতে আসি নি, এসেছি করুণা চাইতে।'

'আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?'

'আমি ক্যাপটেন মিরোনভের মেয়ে।'

'ক্যাপটেন মিরোনভ! যিনি ওরেনবুর্গ এলাকার একটা কেল্লার অধিনায়ক ছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মহিলাকে বিচলিত মনে হল। আরো স্নেহের স্বরে তিনি বললেন, 'আপনার ব্যাপারটায় আমি যদি নাক গলাই কিছু মনে করবেন না।

রাজদরবারে আমি গিয়ে থাকি। আপনি কী অনুগ্রহ চাইতে এসেছেন আমার কাছে বলুন — আমি হয়ত আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।'

মারিয়া ইভানভনা উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সম্মান করে মহিলাকে ধন্যবাদ জানালে। এই অপরিচিতা মহিলা সব কিছুতেই আপনা থেকে আকৃষ্ট করছে তাকে, বিশ্বাস জাগাচ্ছে। পকেট থেকে সে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে দিল অপরিচিতা বরদাত্রীর হাতে। তিনি নিঃশব্দে সেটা পড়তে শুরু করলেন।

প্রথমটা তিনি পড়ছিলেন মনোযোগ ও সহানুভূতির সঙ্গে। কিন্তু পড়তে পড়তে সহসা তাঁর মুখচোখের চেহারা বদলে গেল। মারিয়া ইভানভনা তাঁর মুখের প্রতিটি পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। সে দেখল, এই কিছুক্ষণ আগে যে মুখটি ছিল এত মধুর আর প্রশান্ত, তা হয়ে উঠছে অত্যন্ত কঠোর। ভয় পেয়ে গেল সে।

নিরুত্তাপ গলায় মহিলা বললেন, 'আপনি গ্রিনেভের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে এসেছেন? কিন্তু সম্রাজ্ঞী তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। ভুয়ো-জারের দলে সে যোগ দিয়েছে, কিছু না বুঝে, নেহাৎ সহজ বিশ্বাসের বশে তো নয়, নীতিহীন বিপজ্জনক এক পাষন্ড হিসেবে।'

মারিয়া ইভ্যনভনা বলে উঠল, 'আহ্ এ কথা ঠিক নয়।'

'ঠিক নয় মানে?' মহিলা প্রতিধ্বনি করলেন, তাঁর চোখেমুখে রক্তের উচ্ছ্বাস ফুটে উঠেছে।

'না, ঠিক নয়। ভগবানের দিব্যি, ঠিক নয়। আমি সব জানি, সব কথা আপনাকে বলব। সে যে মুখ বুজে সমস্ত কিছু সহ্য করছে তা একমাত্র আমারই জন্যে। বিচারের সময় সে যদি আত্মপক্ষ সমর্থন না করে থাকে তবে তার একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে সে এই বিচারে আমার নাম জড়াতে চায় নি।' তারপর মারিয়া ইভানভনা উত্তেজিত হয়ে যে কাহিনী বলল তা পাঠকদের আগেই জানা আছে।

মহিলা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কোথায় উঠেছেন আপনি?' আন্না ভ্লাসিয়েভনার ওখানে উঠেছেন শুনে একটু হেসে বললেন, 'তাই নাকি! আমি ওকে চিনি।

আচ্ছা, এখন চলি। আমাদের এই সাক্ষাতের কথা কারো কাছে বলবেন না। কিন্তু আশা করি, আপনার চিঠির জবাব পেতে খুব বেশি দেরি হবে না।'

এই কথা বলে তিনি উঠলেন এবং একটা পল্লবাচ্ছাদিত বীথি ধরে চলে গেলেন। সানন্দ আশা নিয়ে মারিয়া ইভানভনা ফিরে এল আন্না ভ্লাসিয়েভনার কাছে।

শরৎকালে এত ভোরে বেড়াতে বেরুবার জন্যে গৃহকর্ত্রীর কাছে তাকে তিরস্কৃত হতে হল; গৃহকর্ত্রীর মতে এটা নাকি তরুণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। তারপর সামোভার আনা হল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সবেমাত্র রাজদরবারের অফুরন্ত গল্প শুরু হতে চলেছে এমন সময় রাজদরবারের একটা গাড়ি এসে থামল বাড়ির দরজার সামনে। রাজদরবারের বার্তাবহ এসে জানাল যে সম্রাজ্ঞী মারিয়া মিরোনভা মেয়েটিকে তলব দিয়েছেন।

আন্না ভ্লাসিয়েভনা তো একেবারে অবাক। বলে উঠল, 'সে কী! বাপরে! সম্রাজ্ঞী আপনাকে রাজদরবারে ডেকেছেন! আপনার খবর উনি পেলেন কী করে? কিন্তু সম্রাজ্ঞীর সামনে আপনি বাছা কী করে যে দাঁড়াবেন বুঝতে পারছি নে! রাজদরবারে কিভাবে কথাবার্তা বলতে হয় তা আপনি কিছু জানেন বলে মনে হয় না... বরং আমিও আপনার সঙ্গে যাই — কী বলেন? অন্তত আপনাকে খানিকটা দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে পারব। আর আপনার এই রাস্তার পোশাক পরে রাজদরবারে যাবেনই বা কী করে! বরং ধাইয়ের কাছে লোক পাঠাই, তার হলদে পোশাকটা নিয়ে আসুক।' রাজদরবারের বার্তাবহ জানাল যে সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছা, মারিয়া ইভানভনা যেন একাই আসে এবং যে পোশাকে আছেন সেই পোশাকেই চলে আসেন। এর ওপরে আর কথা চলে না। মারিয়া ইভানভনা গাড়িতে উঠে বসল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা নানা উপদেশ দিল ও শুভেচ্ছা জানাল — শুনতে শুনতে মারিয়া ইভানভনা রওনা হল রাজপ্রাসাদের দিকে।

মারিয়া ইভানভনা অনুমান করে নিতে পেরেছিল যে আমাদের দুজনের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হতে চলেছে। তার বুকের

ভিতরটায় কাঁপুনি শুরু হয়ে গেল, স্পন্দন থেমে যাবার মতো অবস্থা। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি এসে থামল রাজপ্রাসাদের সামনে। কম্পিত বক্ষে মারিয়া ইভানভনা সিঁড়ি দিয়ে উঠল। তার সামনে দরজা হাঁ করে খুলে গেল। সে গেল চমৎকার সব সারি সারি শূন্য কত কক্ষ দিয়ে। বার্তাবহ আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। শেষকালে পৌঁছল একটা বন্ধ দরজার সামনে, সম্রাজ্ঞীর কাছে সে মারিয়া ইভানভনার আগমন-বার্তা জানাবে বলে তাকে একা দাঁড় করিয়ে রেখে বার্তাবহ ভিতরে ঢুকল।

সম্রাজ্ঞীর সামনে সশরীরে গিয়ে দাঁড়ানো! ব্যাপারটা ভাবতেই মারিয়া ইভানভনার এত আতঙ্ক হল যে দুপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতাটুকু যেন তার আর থাকে না। কিছুক্ষণ পরেই ঘরের দরজা খুলে গেল। এই ঘরটি হচ্ছে সম্রাজ্ঞীর প্রসাধনকক্ষ। মারিয়া ইভানভনা ভিতরে ঢুকল।

প্রসাধন টেবিলের সামনে সম্রাজ্ঞী বসে আছেন। জনকয়েক সভাসদ তাঁকে ঘিরে। তারা সসম্ভ্রমে মারিয়া ইভানভনার জন্যে পথ ছেড়ে দিল। সস্নেহে সম্রাজ্ঞী মারিয়া ইভানভনাকে গ্রহণ করলেন আর মারিয়া ইভানভনা চিনতে পারল যে এই মহিলাটির সঙ্গেই অল্প কিছুক্ষণ আগে সে এমন খোলাখুলি কথা বলেছে। সম্রাজ্ঞী তাকে কাছে ডেকে স্মিত হাস্যে বললেন, 'আমি যে কথা রাখতে পেরেছি, আপনার অনুরোধ পূর্ণ করতে পেরেছি তার জন্যে আমি খুশি। আপনার ব্যাপারটা চুকে গেছে। আপনার ভাবী স্বামী যে নির্দোষ সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আর এই নিন, এই চিঠিটা আপনি নিজে আপনার ভাবী শ্বশুরের হাতে দেবেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে মারিয়া ইভানভনার হাত কাঁপছিল। কাঁদতে কাঁদতে সে সম্রাজ্ঞীর পায়ের সামনে লুটিয়ে পড়ল। সম্রাজ্ঞী তাকে তুলে ধরে চুম্বন করলেন এবং তার সঙ্গে নানা কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, 'আমি জানি আপনি ধনী নন। কিন্তু ক্যাপটেন মিরোনভের মেয়ের প্রতি আমার কিছুটা কর্তব্য তো আছে। ভবিষ্যতের জন্যে দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার ব্যবস্থা করার ভার আমি নিচ্ছি।'

বাপ-মা হারা বেচারা মেয়েটিকে তিনি স্নেহভরে বিদায় দিলেন। রাজদরবারের সেই একই গাড়িতে মারিয়া ইভানভনা ফিরে এল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা তার জন্যে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল, ফিরে আসতেই

প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করল। মারিয়া ইভানভনা সাধ্যমতো জবাব দিল। আন্না ভ্লাসিয়েভনা জবাবে শুনে খুশি হল না। অনেক কথাই মেয়েটা ভুলে গেছে। কারণ হিসেবে ধরে নিল যে গাঁয়ের মেয়েরা বড়ো লাজুক এবং সদয়ভাবে তাকে ক্ষমা করল। মারিয়া ইভানভনা পিটারবুর্গ শহর দেখবার জন্যেও আর অপেক্ষা করল না, সেই দিনই গ্রামে ফিরে গেল...

পিওতর আন্দ্রেইচ গ্রিনেভের নোটে এখানেই শেষ। পারিবারিক পরম্পরা থেকে জানা যায় যে ১৭৭৪ সালের শেষদিকে সম্রাজ্ঞীর আদেশে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান। পুগাচেভের প্রাণদণ্ডের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং ভিড়ের মধ্যে তাঁকে চিনতে পেরে পুগাচেভ মাথা নাড়ে। সেই মাথাই কিছুক্ষণ পরে রক্তাক্ত ও নিষ্প্রাণ অবস্থায় দেখানো হয় লোকেদের। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই মারিয়া ইভানভনাকে বিয়ে করেন পিওতর আন্দ্রেইচ। তাঁদের বংশধররা এখন সিমবির্স্ক তালুকে সমৃদ্ধিশালী লোক। ক... শহর থেকে ত্রিশ ভার্স্ট দূরে একটি গ্রাম আছে; গ্রামের দশ মালিক। এখানকার একটি আবাসের কোনো একটি ঘরে ফ্রেম আর কাচ দিয়ে বাঁধানো একটি চিঠি আছে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের হাতে লেখা। চিঠিটা লেখা পিওতর আন্দ্রেইচের বাবার কাছে। তাতে ছেলের নির্দোষিতার সংবাদ আছে এবং ক্যাপটেন মিরোনভের কন্যার হৃদয় ও মনের প্রশংসা করা হয়েছে। পিওতর আন্দ্রেইচের এই পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে আসে তাঁর পৌত্র-পৌত্রীদের একজনের মারফত। তিনি জানতেন যে তাঁর পিতামহ যে সময়কালের বর্ণনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমাদেরও আগ্রহ আছে। আমরা স্থির করি যে আত্মীয়বর্গের অনুমতি নিয়ে এই পাণ্ডুলিপিটিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা প্রত্যেক অধ্যায়ে যথোপযুক্ত শীর্ষলিপি উদ্ধৃত করেছি এবং কয়েকটা আসল নাম বদলে দিয়েছি।

প্রকাশক।

১৯ অক্টোবর, ১৮৩৬

পরিশিষ্ট

বর্জিত অধ্যায়*

আমরা এবার ভল্‌গা তীরের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছি। ক... গ্রামে আমাদের বাহিনী ঢুকল এবং রাত্রের মতো আমরা আশ্রয় নিলাম। গ্রামের মণ্ডলের কাছে শুনলাম যে নদীর অপর তীরে সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহ করেছে; সর্বত্র পুগাচেভের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। খবরটা শুনে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। এই নদী আমাদের পার হবার কথা পরের দিন সকালে।

অধৈর্য আমায় পেয়ে বসল। নদীর অপর তীর থেকে প্রায় ত্রিশ ভার্স্ট দূরে আমার বাবার জমিদারি। রাত্রিবেলা কেউ আমাকে নদী পার করিয়ে দিতে পারে কিনা খোঁজ করলাম। গ্রামের চাষীরা সবাই মৎস্যজীবী, সুতরাং নৌকার অপ্রাচুর্য নেই। গ্রিনেভের কাছে গিয়ে আমি আমার ইচ্ছাটা প্রকাশ করলাম। সে আমাকে বলল, 'সাবধান, একা যাওয়া বিপজ্জনক। বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো। প্রথমেই আমরা নদী পার হব আর পঞ্চাশ জন হুসার সৈন্য পাঠাব তোমার বাবা-মার অতিথি হিসেবে, বলা তো যায় না কাজে লাগতে পারে।'

আমি কারো কথা শুনতে রাজি নই। নৌকা তৈরি। দুজন দাঁড়ীকে নিয়ে আমি নৌকায় চাপলাম। নৌকাটাকে ঠেলে দিয়ে তারা জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল।

আকাশ পরিষ্কার। উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। শান্ত আবহাওয়া। ভল্‌গা নদী মসৃণ স্রোতে বয়ে চলেছে। কালো জলের ওপর দিয়ে দুলে দুলে আমাদের নৌকা দ্রুত এগিয়ে গেল। কল্পনাবিলাসে আমি ডুব দিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা সময় পার হয়েছে। আমরা নদীর মাঝামাঝি এসে পৌঁচেছি... এমন সময় দাঁড়ীরা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু করে দিল। সজাগ হয়ে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপারটা কী?' 'ভগবান জানেন ব্যাপার কী, আমরা বুঝতে পারছি না।' একই দিকে তাকিয়ে দুজনে

জবাব দিল। তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমিও তাকালাম। অন্ধকারের মধ্যে দেখা গেল একটা কিছু স্রোতে ভাসতে ভাসতে আসছে। অজানা জিনিসটা কাছিয়ে আসছিল। মাঝিদের আমি নৌকা থামাতে বললাম। জিনিসটা কাছে এগিয়ে আসুক, ততক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। মেঘের পিছনে চাঁদ আড়াল হয়ে গেল। ভাসমান অপচ্ছায়াটি হয়ে উঠল আরো অস্পষ্ট। এবার সেটা খুবই কাছে এসে পড়েছে কিন্তু তবুও কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। দাঁড়ীরা বলাবলি করল, 'কী ওটা! নৌকার পালও নয়, মাস্তুলও নয়...'

হঠাৎ মেঘের পিছন থেকে চাঁদ বেরিয়ে এল আর উদ্ঘাটিত হল এক ভয়াবহ দৃশ্য। আমাদের দিকে ভেসে আসছে একটা ভেলা, ভেলার ওপরে ফাঁসিকাঠ আর তা থেকে ঝুলছে তিনটি দেহ। একটা অস্বাস্থ্যকর কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। ইচ্ছে হল, ফাঁসিতে লট্‌কানো মানুষগুলোর মুখ দেখব।

আমার হুকুমে মাঝিরা লগি দিয়ে ভেলাটা টেনে ধরল। ভাসমান ফাঁসিমঞ্চের গায়ে ধাক্কা খেল আমার নৌকাটা। লাফিয়ে আমি ভেলার ওপর উঠে এলাম এবং দাঁড়ালাম এসে ফাঁসিকাঠের সেই দুই ভয়ঙ্কর খুঁটির মাঝখানে। চাঁদের আলো এসে পড়েছে হতভাগ্যদের বিকৃত মুখাবয়বের ওপরে। একজন হচ্ছে এক বুড়ো চুভাশ। আর একজন এক রুশ চাষী — শক্তসমর্থ জোরালো চেহারা, বছর কুড়ি বয়েস। কিন্তু তৃতীয় জনের দিকে চোখ পড়তেই আমাকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেতে হল, আর্তনাদ না করে পারলাম না। এ হল ভানিয়া, বেচারি আমার ভানিয়া — মূর্খতা বশে সে যোগ দিয়েছিল পুগাচেভের দলে। কালো একটা তক্তা তাদের মাথার ওপরে লাগানো; তাতে গোটা গোটা সাদা অক্ষরে লেখা: 'চোর ও বিদ্রোহী'। দাঁড়ীরা লগি দিয়ে ভেলাটাকে টেনে ধরে নির্বিকারের মতো দেখছিল আর অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আমি নৌকাতে ফিরে গেলাম। ভেলাটা ভেসে চলল ভাটির দিকে। রাত্রের অন্ধকারে অনেকক্ষণ ধরে ফাঁসিমঞ্চটা ফুটে রইল কালো হয়ে। অবশেষে একসময়ে আর দেখা গেল না। ইতিমধ্যে আমার নৌকা খাড়া পাড়ে এসে লেগেছে...

দরাজ হাতে দাঁড়ীদের আমি টাকা দিলাম। ওদের মধ্যে একজন আমাকে নিয়ে চলল ফেরিঘাটের পাশে গ্রামের একজন সর্দারের কাছে। লোকটির পিছনে পিছনে এসে আমি একটা কুঁড়েঘরের মধ্যে ঢুকলাম। সর্দার যখন শুনল যে আমি ঘোড়া চাইছি তখন সে বেশ রূঢ়তাই দেখাতে যাচ্ছিল। কিন্তু নৌকার মাঝি ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল তাকে, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কর্কশ ব্যবহার বদলে গেল, দেখা দিল অতি বিনীত আনুগত্য। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রয়কা তৈরি। আমি গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার হুকুমে আমাদের দেশের বাড়ির দিকে গাড়ি চলল।

চওড়া সড়ক দিয়ে ঘোড়া কদমে ছুটছে। রাস্তার দুপাশে ঘুমন্ত গ্রাম। আমার একমাত্র ভয়, রাস্তায় না আটক হয়ে পড়ি। ভল্‌গায় আমার ঐ নৈশ সাক্ষাৎকারটায় বোঝা গেছে যে বিদ্রোহীরা আছে, তেমনি পাওয়া যায় শক্তিশালী সরকারী প্রতিরোধের চিহ্ন। আমার পকেটে পুগাচেভের হুকুমনামা আছে আবার কর্ণেল গ্রিনেভের শংসাপত্রও আছে; প্রয়োজনের সময় যেটা খুশি ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু রাস্তায় কারো সঙ্গে আমার দেখা হল না। সকালের দিকে দূর থেকে চোখে পড়ল আমাদের গ্রামের নদী ও ফার গাছের বন, যাদের পিছনে আমাদের গ্রাম। কোচোয়ান কষে চাবুক চালাল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা এসে ক... গ্রামে পেঁছিলাম।

গ্রামের অপরপ্রান্তে জমিদারের বাড়ি। পুরোদমে ঘোড়া ছুটছে। হঠাৎ এক জায়গায় এসে রাস্তায় ঠিক মাঝখানে কোচোয়ান লাগাম টেনে ধরল। অধৈর্য হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?' মাঝরাস্তায় কোনো রকমে গাড়ি থামিয়ে সে জবাব দিল, 'হুজুর, সামনের পথ আটক।' আর বাস্তবিকই দেখা গেল, রাস্তার মাঝখানে ঠেকা তুলে রাখা হয়েছে। আর একজন চাষাভুষো ধরনের লোক পাহারায় মোতায়েন। তার হাতে একটা লাঠি। আমার কাছে এসে মাথার টুপি খুলে সে অনুমতিপত্র দেখতে চাইল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এর মানে কী? এভাবে রাস্তা আটক করেছ কেন? এখানে আবার পাহারা কিসের?' মাথা চুলকে সে জবাব দিল, 'আমরা হুজুর, বিদ্রোহ করেছি।'

দমে গিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমাদের মনিবরা কোথায়?..'

'মনিবরা?' সে বলল, 'মনিবরা গোলাঘরে।'

'গোলাঘরে?'

'মানে, আন্দ্রিউশ্‌কা ওদের হাত-পায়ে বেড়ি দিয়ে আটক করে রেখেছে। ও বলে, ওদের নিয়ে জারের সামনে হাজির করবে।'

'সর্বনাশ! ঠেকা তুলে ধরো, ওরে হাঁদারাম! হাঁ করে দেখছিস কী?'

লোকটা ইতস্তত করছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে আমি (বলতে লজ্জা করে) লোকটার কানের ওপর একটা চড় মারলাম এবং নিজেই ঠেকাটা তুলে দিলাম। লোকটা আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। গাড়িতে উঠে আমি কোচোয়ানকে হুকুম দিলাম জমিদারের বাড়ির দিকে গাড়ি চালাতে। গোলাঘরটা উঠোনের মাঝখানে। বন্ধ দরজার সামনে একই রকম লাঠি হাতে দুজন চাষা দাঁড়িয়ে। গাড়ি এসে থামল একেবারে লোকদুটোর সামনে। লাফিয়ে নেমে আমি তেড়ে গেলাম ওদের দিকে। 'দরজা খোল!'

আমার চেহারাটা সম্ভবত হয়েছিল ভয়াবহ। ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে ওরা দুজনেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। তালাটাকে খসিয়ে দরজা ভাঙার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দরজাটা ছিল ওক কাঠের আর বিশাল তালাটাকে কিছুতেই আয়ত্তে আনা গেল না। ঠিক এই সময়ে একজন লম্বামতো তরুণ ছোকরা চাষী একটা কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এসে উদ্ধতভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি কেন এমন হট্টগোল শুরু করেছি। 'আন্দ্রিউশ্‌কা কে? তাকে ডেকে নিয়ে এসো আমার কাছে।' আমি হুঙ্কার ছাড়ি।

'আমিই হচ্ছি আন্দ্রেই আফানাসিয়েভিচ, আন্দ্রিউশ্‌কা নই। কী চান আপনি?' দুহাত কোমরে রেখে মুখের ওপরে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটিয়ে তুলে সে জবাব দিল।

তার প্রশ্নের জবাব দেবার বদলে, তার কলারটা চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে তাকে নিয়ে এলাম গোলাঘরের দরজার সামনে। তালা খুলে দিতে হুকুম করলাম। একমুহূর্ত গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে, কিন্তু আমার এই **পিতৃসুলভ** শাস্তিদানে কাজ হল শেষ পর্যন্ত। চাবিটা বার করে খুলে দিল গোলাঘরের দরজা। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে ছুটলাম আমি। ছাদের একটা সরু ফাটল দিয়ে অস্পষ্ট একটা

আলোর রেখা এসে পড়েছিল; সেই আলোয় ঘরের এক অন্ধকার কোণে দেখতে পেলাম আমার মা ও বাবাকে। তাঁদের হাত বাঁধা। পায়ে কাঠের বেড়ি। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ছুটে গিয়ে তাঁদের জড়িয়ে ধরলাম। তাঁরা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তিন বছরের পল্টনী জীবন আমার মধ্যে এত বেশি পরিবর্তন এনেছে যে তাঁরা আমাকে চিনতে পারলেন না। আমার মা রুদ্ধ আবেগে কেঁদে ফেললেন।

হঠাৎ অতি প্রিয় পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর কানে এল। 'পিওতর আন্দ্রেইচ! আপনি?' আড়ষ্ট হয়ে গেলাম আমি... মুখ ফিরিয়ে ঘরের আর এক কোণে দেখতে পেলাম ম্যারিয়া ইভানভনাকে। ওরও হাত বাঁধা, পায়ে বেড়ি।

আমার বাবা নির্বাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আনন্দে তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত। আমার তলোয়ার দিয়ে তাড়াতাড়ি তাঁদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাবা বললেন, 'পেত্রুশা, তুই! আয়! আয়! ভগবানের দয়ায় তোকে আবার দেখতে পেলাম...'

মা বললেন, 'পেত্রুশা, মাণিক আমার! ভগবান তোকে পাঠাল কেমন করে? ভালো আছিস তো?'

আর সময় নষ্ট না করে আমি তাঁদের সকলকে আটক অবস্থা থেকে বাইরে নিয়ে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু দরজার কাছে এসে দেখি, আবার তা তালাবন্ধ। 'আন্দ্রিউশ্‌কা! দরজা খোল!' আমি চিৎকার করে উঠলাম। দরজার অন্যদিক থেকে জবাব এল, 'সেটি হচ্ছে না! ওখানেই বসে থাকো। কিভাবে হট্টগোল করতে হয় আর জারের কর্মচারীর কলার টিপে ধরতে হয় তার শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

গোলাঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কোনো উপায় আছে কিনা দেখতে শুরু করলাম।

বাবা বললেন, 'ও দেখে কোনো লাভ নেই। আমি তেমন কর্তা নই যে আমার গোলাঘরে চোরের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে কোনো ফাঁক রাখব।'

আমি এসেছি বলে আমার মা প্রথমে খুশি হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তারপর যখন দেখলেন যে বাড়ির অন্য সবার মতো আমারও সেই একই দুরদৃষ্ট — তখন তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন। আমার বাবা-মা ও মারিয়া ইভানভনার মধ্যে এসে পড়ে আমি নিজে কিন্তু আরো বেশি সুস্থির হয়ে উঠেছি। আমার কাছে তলোয়ার আর দুটো পিস্তল আছে। যতই ওরা আমাদের ঘিরে রাখুক না কেন, আমি পরোয়া করি না। সন্ধ্যা নাগাদ গ্রিনেভের এখানে পৌঁছে যাবার কথা, আমাদের সে মুক্ত করবে। আমার বাবা-মাকে এ সব কথা বললাম, শান্ত করলাম মাকে। আবার আমরা একসঙ্গে মিলতে পেরেছি — এই আনন্দে তখন তাঁরা মেতে উঠলেন।

বাবা বললেন, 'শোনো পিওতর, তোমায় একটা কথা বলি। এতদিন অনেক দুষ্টুমি করেছ তুমি, সে জন্যে আমার রাগও হয়েছে। কিন্তু সে সব কথা আজ আর তুলতে চাই না। আশা করি তুমি নিজেকে শুধরে নিতে পেরেছ, তোমার বয়েসকালের খেয়ালিপনা দূর হয়েছে। জানি যে তুমি সৈন্যদলে সসম্মানে কর্তব্য পালন করতে পেরেছ। ধন্যবাদ পিওতর! বুড়ো বয়েসে আমার মনে তুমি শান্তি দিতে পেরেছ। আর আজ যদি তোমার জন্যে বেঁচে যেতে পারি — তা হলে আমার জীবন দ্বিগুণ মধুর হয়ে উঠবে।'

চোখে জল নিয়ে তাঁর হাত চুম্বন করলাম আমি। তারপর মারিয়া ইভানভনার দিকে চাইলাম, আমার উপস্থিতিতে ওর এত আনন্দ যে মনে হয় সুখ আর প্রশান্তির অবধি নেই।

দুপুরের দিকে একটা অস্বাভাবিক গোলমাল ও হৈচৈ কানে এল। বাবা বললেন, 'এর মানে কী? তোমার সেই কর্ণেল এর মধ্যেই এসে পড়ল নাকি?' আমি বললাম, 'অসম্ভব। সন্ধ্যার আগে সে কিছুতেই এখানে পৌঁছতে পারে না।' গোলমাল বেড়ে চলেছে। বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘোড়ায় চেপে একদল লোক উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঠিক সেই সময়ে দেওয়ালের একটা সরু ফাটলে সাভেলিচের পাকা চুলওলা মাথাটা জেগে উঠল, আর বেচারি খুড়ো আর্তস্বরে চিৎকার করে বলল: 'কর্তাবাবু! গিন্নি-মা! দাদাবাবু! দিদিমণি! খুবই খারাপ খবর! শয়তানরা

গাঁয়ে এসে পড়েছে। আর দাদাবাবু, শয়তানগুলোর সর্দার কে হয়েছে জানো? সেই নরকের কীট শ্ভাব্রিন।' দুচোখের বিষ এই লোকটার নাম শুনে মারিয়া ইভানভনা হাতের একটা হতাশ ভঙ্গি করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি বললাম, 'শোন্ সাভেলিচ! কেউ একজন ঘোড়ায় চেপে ফেরিঘাটে চলে যাক। ওখানে হুসার সৈন্যরা আছে। তাদের গিয়ে বলুক যে তারা যেন কর্ণেলকে আমাদের বিপদের কথা জানায়।'

'কাকে পাঠাই দাদাবাবু, ছোকরারা সকলেই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে। সমস্ত ঘোড়া ওদের হাতে। হা ভগবান, এই ওরা এসে পড়ল, এই ঢুকেছে উঠোনে, এই আসছে গোলাঘরের দিকে।'

এবার দরজার ওপাশ থেকে কয়েকজন লোকের গলার স্বর শোনা গেল। আমি নীরবে আমার মাকে ও মারিয়া ইভানভনাকে ঘরের এক কোণে সরে যেতে ইঙ্গিত করলাম। তারপর তলোয়ার বার করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার ঠিক পাশটিতে। আমার বাবা পিস্তলদুটো তৈরি রেখে ঘাঁটি নিয়ে দাঁড়ালেন আমার পাশে। তালায় চাবি ঘুরোবার শব্দ পাওয়া গেল। তারপরেই দরজাটা খুলে গেল আর দেখা দিল আন্দ্রিউশ্কার মাথা। আমি তলোয়ারের কোপ বসালোম, দরজাটা আগলে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে বাবা একটা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন। আমাদের যারা ঘেরাও করেছিল, তারা আমাদের মুণ্ডপাত করতে করতে পালিয়ে গেল। আহত লোকটিকে ঘরের ভিতর টেনে এনে আমি ভিতর থেকে ছিট্‌কিনি তুলে দিলাম। উঠোন-ভর্তি সশস্ত্র মানুষ। শ্ভাব্রিন রয়েছে ওদের মধ্যে।

আমার মা ও মারিয়া ইভানভনার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'ভয় নেই! এখনো আশা আছে। আর বাবা, আপনি আর এখন গুলি চালাবেন না, শেষ গুলিটা বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

আমার মা নিঃশব্দে ভগবানের নাম করছেন। তাঁর পাশে মারিয়া ইভানভনা। স্বর্গীয় স্থৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করছে ভাগ্যের। বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, গালাগালি আর শাসানি। আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার নিজের জায়গায়; যে কেউ মাথা গলাতে সাহস করবে তাকেই

আমি কেটে দুটুকরো করব। হঠাৎ বাইরের গোলমাল একেবারে থেমে গেল আর শোনা গেল শ্ভাব্রিন আমার নাম ধরে ডাকছে।

'আমি আছি এখানে। কী চাও তুমি?'

'আত্মসমর্পণ করো বুলানিন, প্রতিরোধ নিষ্ফল। তোমার বুড়ো মা-বাপের কথা ভাবো একটু! গোঁয়ার্তুমি করে বাঁচতে পারবে না। তোমাদের আমার হাতে ধরা পড়তেই হবে।'

'চেষ্টা করেই দেখো-না, বিশ্বাসঘাতক!'

'তুমি কি ভাবছ, আমি নিজে বোকার মতো ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করব বা আমার লোকজনের জীবন বিপন্ন করব? মোটেই না। শুধু আগুন ধরিয়ে দেব গোলাঘরটায়। আর তখন, ওহে বেলোগর্স্কের ডন-কুইক্সট, কী তুমি করো দেখা যাবে। এখন খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। আপাতত এই ঘরের মধ্যেই বসে বসে ভাবো। চললাম মারিয়া ইভানভনা, তোমার কাছে আমি কোনো মাপ চাইছি না। আর তোমার বীরপুরুষের পাশে অন্ধকারে ফুর্তিতেই আছ আশা করি।'

গোলাঘরের দরজার কাছে পাহারা দাঁড় করিয়ে শ্ভাব্রিন চলে গেল। আমরা সবাই নির্বাক। প্রত্যেকেই নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে আছি, মনের কথা বলবার সাহস নেই। রাগে অন্ধ হয়ে শ্ভাব্রিন যে কী কী করতে পারে — মনে মনে আমি তা কল্পনা করলাম। নিজের জন্যে আমার প্রায় কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। আর যদি সত্যি কথা বলতে হয় — আমার বাবা-মা সম্পর্কে আমার যতটা না উদ্বেগ তার চেয়ে অনেক বেশি উদ্বেগ মারিয়া ইভানভনা সম্পর্কে। আমি জানতাম গাঁয়ের চাষীরা এবং বাড়ির দাসদাসীরা আমার মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে; আমার বাবার অনেক রকম কড়াকড়ি আছে, কিন্তু তিনি ন্যায়ের পথে চলেন এবং প্রজাদের সত্যিকারের অভাব-অভিযোগের কথা জানেন বলে সবাই তাঁকে ভালোবাসে। প্রজাদের এই বিদ্রোহ একটা বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়, এ একটা ক্ষণিক মত্ততা; এর মধ্যে তাদের ক্রোধের পরিচয় নেই। সুতরাং আমার মা-বাবার ক্ষেত্রে মার্জনা নিশ্চিত। কিন্তু মারিয়া ইভানভনা? এই দুশ্চরিত্র ও বিবেকবর্জিত লোকটার হাতে কোন ভাগ্য অপেক্ষা করছে ওর জন্যে? ভাবতেও শিউরে উঠছি আমি। এই নিষ্ঠুর শত্রুর হাতে দ্বিতীয়বার পড়ার চেয়ে (ঈশ্বর

আমাকে ক্ষমা করুন) আমি ওকে নিজের হাতে খুন করতে প্রস্তুত হল্যাম।

আরো একঘণ্টা কাটল। গাঁয়ের দিক থেকে মাতাল গানের শব্দ ভেসে আসছে। গোলাঘরের দরজায় যারা পাহারা দাঁড়িয়ে, তারা এই হুল্লোড়ে যোগ দিতে পারে নি বলে ক্ষুব্ধ। রাগে আমাদের উদ্দেশে গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল তারা আর ভয় দেখাতে ল্যাগল যে আমাদের সকলের ওপরে ভয়ানক অত্যাচার হবে, আমাদের সকলকে মরতে হবে। শ্ভাব্রিনের শাসানির ফল আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত এক সময়ে, উঠোনে খুব গতিবিধির শব্দ শুরু হয়ে গেল। আবার শুনতে পেলাম শ্ভাব্রিনের গলা।

'কী ঠিক করলে বলো! নিজের থেকে আমার হাতে ধরা দেবে?'

আমরা নিরুত্তর। অল্প একটু সময় অপেক্ষা করে শ্ভাব্রিন খড় আনবার জন্যে হুকুম দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই লকলকে আগুনের শিখায় আলো হয়ে গেল অন্ধকার গোলাঘর, ধোঁয়া উঠতে লাগল দরজার তলা থেকে। আর এমনি সময়ে মারিয়া ইভানভনা এসে দাঁড়াল আমার কাছে, আমার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে চাপা স্বরে বলল:

'যথেষ্ট হয়েছে পিওতর আন্দ্রেইচ, আমার জন্যে কেন প্রাণ দেবে তুমি আর তোমার বাবা-মা? আমায় ছেড়ে দাও। শ্ভাব্রিন আমার কথা শুনবে।'

'না, কক্ষনো না!' উত্তেজিত হয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'জানেন কী অবস্থা হবে আপনার?'

শান্ত স্বরে ও জবাব দিল, 'কোনো কিছু অসম্মান হলেই আমি মরব। কিন্তু আমার উদ্ধারকর্তার আর যে পরিবার এক অনাথাকে এত উদারভাবে আশ্রয় দিয়েছেন — তাঁদের হয়ত প্রাণরক্ষা হবে। বিদায়, আন্দ্রেই পেত্রোভিচ! বিদায়, আভ্দোতিয়া ভাসিলিয়েভনা! আপনারা আমার জন্যে যা করেছেন তা শুধু উপকার করা নয় — তার চেয়ে অনেক বেশি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন। আপনিও আমাকে বিদায় দিন, পিওতর আন্দ্রেইচ। আর এ কথা স্থির জানবেন যে... যে...' এই বলে দুহাতে মুখ ঢেকে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল... আমার তখন প্রায় একটা উন্মত্ত অবস্থা। আমার মাও কাঁদছেন।

বাবা বললেন, 'মারিয়া ইভানভনা, ও সব কথা ভুলে যাও। ভেবো না, তোমাকে এই শয়তানদের কাছে কে তোমায় যেতে দেবে? চুপটি করে বসে থাকো। যদি মরতেই হয় তো সবাই একসঙ্গে মরব। শোনো, শোনো, কী আবার বলছে!'

শ্ভাব্রিন চিৎকার করে বললে, 'আত্মসমর্পণ করবে কি? দেখছ তো, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুড়ে মরতে হবে।'

আমার বাবা দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, 'আত্মসমর্পণ করব না রে শয়তান।'

কুণ্চনে ভরা তাঁর মুখ অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, সাদা ভুরু জোড়ার নিচে জ্বলছে চোখদুটো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন:

'বাস, আর দেরি করা নয়।'

দরজা খুললেন তিনি। আগুনের শিখা লকলক করে ছুটে এল। পাক খেয়ে খেয়ে উঠল শুকনো শ্যাওলা গোঁজা কাঠের গুঁড়িগুলোর গায়ে। আমার বাবা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়লেন, তারপর জ্বলন্ত চৌকাঠ পার হয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বললেন, 'তোমরা সবাই চলে এসো আমার পিছনে পিছনে!' আমার মা ও মারিয়া ইভানভনার হাত ধরে দুজনকে তাড়াতাড়ি বাইরের হাওয়ায় নিয়ে এলাম। আমার বাবার লোল হাতের গুলিতে বিদ্ধ শ্ভাব্রিন পড়ে আছে চৌকাঠের কাছে। আমরা এভাবে আচমকা বেরিয়ে এসে আক্রমণ করাতে শয়তানের দল প্রথমে ছুটে পালিয়েছিল কিন্তু এখন আবার সাহস পেয়ে ঘিরে ফেলছে আমাদের। আমি আরো কয়েকবার তরোয়াল চালাতে পেয়েছি এমন সময়ে খুব ভালোভাবে তাক-করা একটা ইট ঠিক আমার বুকে এসে লাগে। আমি মাটিতে পড়ে গেলাম এবং মুহূর্তের জন্যে অজ্ঞান হয়ে রইলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি রক্তে-ভেজা ঘাসের ওপরে শ্ভাব্রিন বসে আছে আর তার সামনে আমাদের গোটা পরিবার। বগলের তলে ঠেকা দিয়ে আমাকে ধরে রাখা হয়েছে। একদল চাষী, কসাক আর বাশ্কির ঘিরে আছে আমাদের। শ্ভাব্রিন মড়ার মতো ফ্যাকাশে, এক হাতে সে আহত স্থানটা চেপে ধরে আছে। যন্ত্রণা আর ক্রোধ একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে তার

চোখেমুখে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে সে আমার দিকে তাকাল আর খুব অস্পষ্ট ও দুর্বল স্বরে বলল:

'ফাঁসিতে লটকাও ওকে... সবক'টাকে... শুধু এই মেয়েটিকে বাদ দিও...'

শয়তানগুলো তক্ষুনি আমাদের ঘিরে ফেলে হৈহৈ করে টানতে টানতে নিয়ে চলে ফটকের দিকে। তারপরই হঠাৎ আমাদের ছেড়ে দিয়ে যে যেদিকে পারে পালাতে লাগল। ফটক দিয়ে ঢুকল গ্রিনেভ, তার পিছনে পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে পুরো এক বাহিনী সৈন্য।

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চারদিকে পালাচ্ছে। হুসার সৈন্যরা ধাওয়া করছে পিছু পিছু; তলোয়ার দিয়ে কাটছে, বন্দী করছে। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে এল গ্রিনেভ, আমার মা-বাবাকে অভিবাদন করে সজোরে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'দেখছ তো, ঠিক সময়ে এসে পড়েছি। তা হলে ইনিই হচ্ছেন তোমার বাগ্‌দত্তা!' মারিয়া ইভানভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। বাবা আলোড়িত হলেও স্থিরভাবে গ্রিনেভের কাছে এসে তাকে ধন্যবাদ জানালেন; আমার মা গ্রিনেভকে ঈশ্বরের দূত বলে বুকে টেনে নিলেন একেবারে। 'আসুন, আমাদের বাড়িতে আসুন।' বলে আমার বাবা পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন।

শ্‌ভাব্রিনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গ্রিনেভ দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এই লোকটি কে?' আহত লোকটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'এই লোকটি হচ্ছে পালের গোদা। ভগবানের দয়ায় এই বুড়ো হাত দিয়েই শাস্তি দিয়েছি জোয়ান দুর্বৃত্তটাকে। আমার ছেলের রক্তপাত করার শোধ তুলেছি।' খানিকটা গর্বের সুরে বাবা জবাব দিলেন; তিনি যে এককালে সৈনিক ছিলেন, এটা যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে।

গ্রিনেভকে আমি বললাম, 'এই হচ্ছে শ্‌ভাব্রিন।'

'শ্‌ভাব্রিন! দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হল! ওহে সৈন্যরা! লোকটাকে তুলে নিয়ে যাও! আমাদের বৈদ্যের কাছে বলবে, ওর ক্ষতস্থান যেন ধুয়ে

বেঁধে দেয় আর চোখের মণির মতো ওকে আগলে রাখে। অবশ্য-অবশ্যই কাজানের গোপন কমিশনের কাছে হাজির করাতে হবে ওকে। ও হচ্ছে একজন প্রধান অপরাধী, ওর সাক্ষ্য খুবই মূল্যবান হবার কথা।'

ক্লান্তভাবে চোখ খুলে তাকাল শ্‌ভাব্রিন। মুখে ওর ফুটে উঠেছে শুধু একটা শারীরিক যন্ত্রণার ছাপ। হুসার সৈন্যরা ওকে একটা ওভারকোটের ওপরে শুইয়ে নিয়ে গেল।

আমরা বাড়ির ভিতরে গেলাম। দুরুদুরু বুকে আমি তাকিয়ে দেখলাম চারিদিকে, যাতে ছেলেবেলার কথা আমার মনে পড়ছিল। বাড়ির ভিতরে কোনো কিছুই বদলায় নি। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। শ্‌ভাব্রিন তার লোকজনকে লুটপাট করতে দেয় নি। লোকটার যথেষ্ট অধঃপতন হয়েছে বটে কিন্তু লুটপাট করার মতো নিচু কাজের প্রতি অচেতন বিতৃষ্ণা সে বজায় রেখেছে এখনো। বাড়ির দাসদাসীরা বাইরের ঘরে ভিড় করে এল। তারা এই অভ্যুত্থানে যোগ দেয় নি এবং আমরা যে বিপন্মুক্ত হয়েছি এতে সবাই আন্তরিকভাবেই খুশি। সাভেলিচ বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাভেলিচের কৃতিত্বের কথাটা বলে রাখা প্রয়োজন। বিদ্রোহীরা আক্রমণ করার পর চারিদিকে যখন দারুণ সোরগোল শুরু হয় তখন সাভেলিচ গিয়ে হাজির হয় আস্তাবলে; সেখানে শ্‌ভাব্রিনের ঘোড়াটা ছিল, চুপি চুপি সেটাকে জিন পরিয়ে বার করে আনে, তারপর ঘোড়ায় চেপে ছোটে ফেরিঘাটের দিকে। চারিদিকের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তার দিকে কারো নজর পড়ে না। ফেরিঘাটে এসে যখন সে পৌঁছয় তখন গ্রিনেভের সৈন্যবাহিনী ইতিমধ্যেই ভল্‌গা পার হয়ে বিশ্রাম করছিল। সাভেলিচের মুখে আমাদের বিপদের কথা শুনে গ্রিনেভ সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে কদমে ছুটে আসে। আর ভগবানের অশেষ দয়া, এসে তারা পৌঁছয় ঠিক সময়েই।

গ্রিনেভ জেদ করল, সরাইখানার পাশে খোলা জায়গায় সকলের চোখের ওপরে কয়েক ঘণ্টা আন্দ্রিউশ্‌কার মাথাটা শূলে বিঁধিয়ে রাখতে হবে।

হুসার সৈন্যরা বিদ্রোহীদের পিছু ধাওয়া করেছিল, তারা ফিরে এল। কয়েকজনকে বন্দী করে এনেছে। যে গোলাঘরে কিছুক্ষণ আগে

আমরা আটক ছিলাম এবং যেখানে থেকে বিদ্রোহীদের স্মরণীয় অবরোধ ঠেকিয়েছিলাম — সেখানেই আটক করে রাখা হল তাদের।

তারপর আমরা যে যার ঘরে গেলাম। আমার বাবা-মার বিশ্রাম দরকার। আমি গতরাত্রে ঘুমোই নি, বিছানায় শুয়েই আমার চোখে গভীর ঘুম নেমে এল। গ্রিনেভ গেল সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে নির্দেশ জারি করতে।

সন্ধ্যাবেলা আবার আমরা সকলে এসে বসলাম ড্রইং-রুমে। সামোভার ঘিরে বিগত বিপদটা নিয়ে চলছে সানন্দ আলোচনা। মারিয়া ইভানভনা চা ঢালছে। আমি বসেছি তার পাশেই। আমার সমস্ত মনোযোগ ওর দিকেই কেন্দ্রীভূত। আমাদের সম্পর্কের এই কমনীয়তাকে আমার বাবা-মা যেন অনুকূল দৃষ্টিতে দেখছেন বলে মনে হল। এই সন্ধ্যাটির কথা এখনো আমি ভুলি নি। আমি ছিলাম সুখী — পরিপূর্ণরূপে সুখী। মানুষের দীনহীন জীবনে এই রকম মুহূর্ত খুব বেশি আসে কি?

পরদিন সকালে বাবার কাছে খবর এল যে ক্ষমা চাইবার জন্যে চাষীরা বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছে। বাবা বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন অলিন্দে। তাঁকে দেখে চাষীরা জানু পেতে বসে পড়ল।

বাবা বললেন, 'হ্যাঁ রে বোকার দল, হাঙ্গামা করার খেয়াল তোদের মাথায় এল কী করে?'

সমস্বরে তারা বলে উঠল, 'দোষ হয়ে গেছে হুজুর, মালিক তুমি আমাদের।'

'দোষ হয়ে গেছে। দুরন্তপনা করে নিজেরাই তার ফল ভোগ করছ। তবে ভগবানের দয়ায় আমার ছেলে পিওতর আন্দ্রেইচের সঙ্গে মিলন হল, এই আনন্দে মাপ করে দিচ্ছি। নাও, হয়েছে — মাপ চাইলে আর তলোয়ার চলে না। দোষ হয়ে গেছে! দোষ তো হয়েছেই। ভগবান কেমন সুন্দর রোদ-ঝলমলে দিন পাঠিয়েছেন, এখন কোথায় মাঠে গিয়ে ঘাস কাটবি, তা নয়। তিন-তিনটে দিন কী করলি হাঁদারা? শোন মোড়ল! সবাইকে ঘাস কাটায় লাগাও। আর দেখো পাঠাকিলে মাথা শয়তান, সেণ্ট ইলিয়ার পরব শুরু হবার আগেই মাঠ থেকে সমস্ত ঘাসে গাদায় তুলতে হবে। যাও এবার!'

চাষীরা কুর্নিশ করে চলে গেল বেগার খাটতে। ভাবখানা এমন যেন কিছুই হয় নি।

শ্‌ভারিনের ক্ষত মারাত্মক নয়। তাকে পাহারা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল কাজানে। তাকে যখন গাড়িতে তোলা হয় তখন আমি জানলায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। চোখাচোখি হতেই সে মাথা নিচু করল। আমি তাড়াতাড়ি সরে এলাম জানলা থেকে। শত্রুর মন্দভাগ্য ও নিগ্রহ দেখে আমার খুব উল্লাস হয়েছে — এ কথা যেন কেউ মনে করতে পারে ভেবে আমার ভয় হয়েছিল।

গ্রিনেভকে আরো এগিয়ে যেতে হবে। আমি স্থির করলাম যে আমিও গ্রিনেভের সঙ্গে চলে যাব, যদিও পরিবারের মধ্যে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছেটা আমার খুবই ছিল। সৈন্যদলটির যেদিন রওনা হবার কথা, তার আগের দিন বাবা-মার কাছে গিয়ে তৎকালীন প্রথামতো তাঁদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম এবং মারিয়া ইভানভনার সঙ্গে আমার বিয়েতে তাঁদের সম্মতি চেয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম। আনন্দে বাবা-মার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল, আমাকে তুলে ধরে তাঁরা সম্মতি দিলেন। মারিয়া ইভানভনাকে হাত ধরে নিয়ে এলাম ওঁদের কাছে। ওর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সারা শরীর কাঁপছে, আমার বাবা-মা আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করলেন... ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনের ভাব যে কী হয়েছিল, তা বর্ণনা করবার চেষ্টা আমি করব না। আমার মতো অবস্থায় যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এমনিতেই বুঝতে পারবেন। আর যাঁরা পড়েন নি তাঁদের আমি শুধু করুণাই করতে পারি। তাঁদের প্রতি আমার উপদেশ, সময় থাকতে থাকতেই প্রেমে পড়ুন, এবং বাবা-মার আশীর্বাদ নিন।

পরদিন সকালে সৈন্যদলের বেরিয়ে পড়বার কথা। গ্রিনেভ আমাদের বাড়ির সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল। সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন শীঘ্রই শেষ হবে, এ বিষয়ে আমরা সকলেই নিশ্চিত। আমি আশা করছিলাম যে মাসখানেকের মধ্যেই আমি বিয়ে করতে পারব। মারিয়া ইভানভনা আমাকে বিদায় জানাল এবং সকলের সামনেই চুম্বন করল আমায়। আমি ঘোড়ায় চেপে বসলাম, সাভেলিচ আবার আগের মতো আমার সঙ্গী হল। সৈন্যদল বেরিয়ে পড়ল।

এই দ্বিতীয়বার আমি বাড়ি ছাড়ছি। বহুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম আমাদের বাড়ির দিকে। আমার মনটা ভার হয়ে আছে, কেমন একটা বিষণ্ণতা আচ্ছন্ন করেছে আমাকে। কেন জানি মন বলছিল, আমার দুর্ভাগ্যের দিন এখনো শেষ হয় নি। টের পাচ্ছিলাম, আরো ঝড়ঝাপ্‌টা আমার কপালে আছে।

পুগাচেভ বিদ্রোহের অবসান এবং আমাদের সামরিক অভিযানের বিস্তৃত বর্ণনার মধ্যে আমি যাব না। গ্রামের পর গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হল। পুগাচেভ সেখানে ধ্বংসকাণ্ড চালিয়েছে। দুর্বৃত্তরা যেটুকু রেখে গেছে সেটুকুও হতভাগা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আমরা নিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

কার কথা মেনে চলবে লোকে বুঝতে পারছিল না। কোথাও শাসনব্যবস্থার চিহ্নমাত্র নেই। জমিদাররা বনে গিয়ে লুকিয়েছে। দুর্বৃত্তদল সর্বত্র অত্যাচার চালাচ্ছে। পুগাচেভ আস্ত্রাখানের দিকে পালাচ্ছে, পিছন পিছন ধাওয়া করছে যে সব সৈন্যদল, তাদের অধিনায়করা শাস্তি দেবার সময়ে দোষী-নির্দোষী বিচার করে না। যেখানে আগুন জ্বলে উঠেছিল সেই গোটা অঞ্চলটার অবস্থা ভয়াবহ। হে ভগবান, রুশ দেশের বিদ্রোহ, নির্মম ও নিরর্থক বিদ্রোহ, আমাদের যেন কোনোদিন দেখতে না হয়। যারা আমাদের দেশে অসম্ভব বিপ্লব আনতে চায় তারা হয় ছেলেমানুষ আর আমাদের জনসাধারণকে জানে না, নয় তারা কঠোর-হৃদয় লোক, যারা অপরের জীবনকে শস্তা বলে মনে করে, নিজেদের মুণ্ডুর দামও তাদের কাছে কানাকড়ি।

পুগাচেভ পালাল, পিছনে পিছনে ধাওয়া করলেন ইভান ইভানভিচ মিখেল্‌সন। শীঘ্রই খবর এল যে পুগাচেভ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছে। অবশেষে গ্রিনেভ তার জেনারেলের কাছ থেকে জানতে পেল যে ভুয়ো-জার ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে থামবার হুকুম এল, এবার আমি বাড়ি ফিরে যেতে পারি। আনন্দে আমি দিশেহারা। কিন্তু অদ্ভুত ঐ অনুভূতিটা কালো ছায়া ফেলেছিল আমার আনন্দে।

টীকা

পুশকিনের কথাসাহিত্য মহাকবির সৃষ্টিকর্মের একটা নতুন পর্ব। গদ্যের দিকে তিনি মন দেন ২০-এর দশকে। ১৮৩০ সালের শরতে পুশকিন বোল্‌দিনো গ্রামে 'বেলকিনের গল্প' নাম দিয়ে একই কথামালায় লেখেন পরপর পাঁচটি গল্প।

পুশকিনের শৈলীর বৈশিষ্ট্য হল অপরিসীম প্রাঞ্জলতা, সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ প্রকাশভঙ্গি, রূপক ও বিশেষণাদির একান্ত অনুপস্থিতি, প্লটের উন্মোচনে একাগ্রতা পুশকিন লিখেছেন, 'যাথার্থ্য ও সংক্ষিপ্ততা — এই হল গদ্যের সর্বপ্রথম গুণ। গদ্য চায় প্রভূত চিন্তা, তা ছাড়া চমৎকারী ভাষায় কোনো ফল হয় না।'

'ক্যাপটেনের মেয়ে', 'স্টেশনের ডাকবাবু' প্রভৃতি রচনায় পুশকিন নতুন রুশ বাস্তববাদী কথাসাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করে যান।

প্রয়াত ইভান পেত্রোভিচ বেলকিনের গল্প

'বেলকিনের গল্প'গুলি পুশকিন লেখেন বোল্‌দিনো গ্রামে ১৮৩০ সালের শরতে। ১৮৩১ সালের এপ্রিলে কবি গল্পগুলি পড়ে শোনান মস্কোয়। পুশকিন ঠিক করেছিলেন গল্পগুলি ছাপাবেন বেনামীতে, তাঁর লিখনস্বত্ব ছাপাবেন কল্পিত এক 'প্রয়াত বেলকিনের' ওপর। গল্পগুচ্ছের সঙ্গে পুশকিন যোগ করেন 'সম্পাদকের বক্তব্য'।

১৮৩১ সালের অক্টোবরের শেষে গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। আসল লেখকের নামে তা বেরয় ১৮৩৪ সালে।

•

'বয়স্ক নাবালক' — ১৮শ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ নাট্যকার ও সাংবাদিক দেনিস ফনভিজিন-এর মিলনান্ত নাটক (১৭৮২)।

লক্ষ্যভেদ

প্রথম শিরোলিপি — পুশকিনের সুহৃৎ, কবি ইয়েভ্‌গেনি বারাতিন্‌স্কির (১৮০০-১৮৪৪) 'বলনাচ' কবিতা থেকে (১৮২৮) একটা পদ।

দ্বিতীয় শিরোলিপি — বেস্তুজেভ-মারলিন্স্কির একটি গল্প থেকে। ১৮২৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সশস্ত্র বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন বেস্তুজেভ্-মারলিন্স্কি (১৭৯৭-১৮৩৭)। জার আমলের কড়া সেন্সর-ব্যবস্থার দাপটে পুশকিনকে লেখকের নামটি বাদ দিতে হয়েছে। এ'র লেখা উদ্ধৃত করে পুশকিন অবশ্য প্রকারান্তরে 'ডিসেম্বর-বিদ্রোহে' তাঁর নিজের সমর্থনের কথাই পাঠককে জানিয়ে দিয়েছেন।

'কবি দেনিস দাভিদভ যাঁকে অমর করে গেছেন সেই বিখ্যাত বুর্তসোভের...' — পুশকিনের বন্ধু কবি দেনিস দাভিদভ সামরিক বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে লিখতেন। ১৮১২ সালে তিনি পার্টিজান ফৌজের নেতৃত্ব করেছিলেন। চাষী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিয়ে ফৌজটি ফরাসী আক্রমণকারীদের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে সামিল হয়েছিল। দেনিস দাভিদভের কবিতায় ১৮১২ সালের দেশপ্রেমিক যুদ্ধের একজন অংশগ্রাহী বুর্তসোভের নামের বারংবার উল্লেখ আছে।

আলেক্সান্দর ইপ্সিলান্তি — একজন রুশ সেনাপতি। ১৮২০ সালে তুর্কী হামলাদারদের হাত থেকে গ্রীসকে মুক্ত করবার জন্যে যে গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়া হয়েছিল তারই একজন নেতা ছিলেন ইনি। ১৮২১ সালের ২৯শে জুন প্রুত্ নদীর ধারে স্কুলিয়ানি গ্রামে তুর্কী বাহিনীর হাতে ইপ্সিলান্তির ফৌজটির পরাজয় ঘটে।

তুষার-ঝঞ্ঝা

শিরোলিপি — রুশ কবি ও অনুবাদক ভাসিলি জুকোভ্স্কির (১৭৮৩-১৮৫২) পল্লীগাথা 'স্ভেত্লানা' (১৮১৩)।

ত্রয়কা — তিন ঘোড়ায় টানা রুশ দেশের গাড়ি।

আর্তেমিস্ — হালিকার্নাস রাজা মাউসল-এর (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতক) বিধবা পত্নী, পতিব্রতা, স্বামীর স্মৃতিস্তম্ভ গড়েন, 'পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য'-এর এটি অন্যতম।

'Vive Henri-Quatre' — ফরাসী নাট্যকার শার্ল কোল্লে (১৭০৯-১৭৮৩)-এর কমেডি '৪র্থ হেন্‌রিখের মৃগয়া যাত্রা' থেকে দদম্বয়।

জকোন্দ্-এর আরিয়া — নিকলো ইজ্য়ার (১৭৭৫-১৮১৮)-এর প্রহসন অপেরা 'জকোন্দ অথবা অ্যাডভেঞ্চার সন্ধানী'।

'...আর ওড়না উড়িয়ে দেয় বাতাসে!' — ১৯ শতকের খ্যাতনামা রুশ নাট্যকার ও কূটনীতিক আলেক্সান্দর গ্রিবয়েদভ-এর কমেডি 'অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি' (১৮২৪) প্রহসন থেকে উদ্ধৃতি।

'...St-Preux-এর প্রথম পত্রের কথা।' — জাঁ-জাক রুসোর 'ইউলিয়া, অথবা নতুন এলোইস' (১৭৬১) উপন্যাসে সাঁ-প্রে'র প্রেমপত্রের কথা বলা হচ্ছে।

কফিনওয়ালা

শিরোলিপি — বিখ্যাত রুশ কবি গাব্রিইল দের্জাভিনের (১৭৪৩-১৮১৬) 'ঝরণা' কবিতা থেকে।

চুখোনেৎস — রুশ ভাষায় ফিন্ জাতির বিদ্রূপের নাম।

'...পগোরেল্স্কির সেই বিখ্যাত পোস্টম্যানের মতো...' — আন্তোনি পগোরেল্স্কি ছদ্মনামে ১৯শ শতাব্দীর লেখক আলেক্সেই পেরভস্কির একটি উপন্যাসের প্রধান চরিত্র সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

লাল মরক্কোয়-বাঁধানো বইয়ের মতো — কিছুটা পরিবর্তিত আকারে ইয়াকভ ক্নিয়াজ্নিনের একটি মিলনান্ত কবিতা 'বাক-সর্বস্ব' (১৭৮৬) থেকে।

স্টেশনের ডাকবাবু

শিরোলিপি — কিছুটা পরিবর্তিত আকারে উনিশ শতকের কবি পিওতর ভিয়াজেম্স্কির (১৭৯২-১৮৭৮) 'ডাক স্টেশন' কবিতা থেকে।

বাবুর মেয়ে, চাষীর মেয়ে

শিরোলিপি — কবি ইপ্পলিৎ বোগদানোভিচের (১৭৪৩-১৮০৩) 'প্রিয়া' কবিতা থেকে।

যার কাজ তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে... — আলেক্সান্দর শাখভ্স্কির (১৭৭৭-১৮৪৬) ব্যঙ্গ রচনা থেকে উদ্ধৃতি।

'জয়লাস্' — প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক ও সমালোচক, হোমারের বিরুদ্ধে তুচ্ছ ছিদ্রান্বেষী আক্রমণের জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর নাম বিশেষ্য পদবাচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মাদাম দ্য পম্পাদুর — ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের প্রণয়িনী।

সারাফান — মহিলাদের একধরনের রুশী পোশাক।

লাপ্তি — গাছের ছাল দিয়ে বোনা জুতো।

'বয়ার-কন্যা নাতালিয়া' — ন. ম. কারাম্জিনের (১৭৬৬-১৮২৬) ঐতিহাসিক উপন্যাস।

তারাস স্কতিনিন — ফনভিজিন-এর মিলনান্ত 'বয়স্ক নাবালক'এর একটি চরিত্র।

ইস্কাপনের বিবি

কাহিনীটি রচিত ১৮৩৩ সালে বোল্দিনোতে। সমসাময়িকদের মতে কাহিনীর প্রধান ঘটনাটি কল্পিত নয়। বৃদ্ধা কাউণ্ট মস্কোর বড়োলাট দ্মিত্রি ভ্লাদিমিরোভিচ-এর মা নাতালিয়া পেত্রোভনা গলিৎসিনা প্যারিসে সত্যিই সেইভাবে দিন কাটিয়েছেন যা বর্ণনা করেছেন পুশকিন। তাঁর নাতি গলিৎসিন পুশকিনকে বলেন যে একবার তিনি জুয়ায় হেরে ঠাকুর্মার কাছে টাকা চান, ঠাকুর্মা টাকা না দিয়ে তিনটে তাসের নাম করেন... ' নাতি সেই তাস ধরে জিতে যায়। উপন্যাসের বাকি ঘটনাগুলো কল্পিত।'

স্বয়ং পুশকিনের কথায়, উপন্যাসটি খুবই সাফল্য লাভ করে: 'আমার 'ইস্কাপনের বিবি'-র খুবই চল হয়েছে। জুয়াড়িরা তিরি, সাত, টেক্কার বাজি ধরছে।'

শ্ভেডেন্বর্গ, ইম্মান্ইল (১৬৮৮-১৭২২) — স্ইডিস ধর্মতত্ত্ববিদ-অতিন্দ্রীয়বাদী।

র্তে — ক্রমান্বয়ে একই তাসের ওপর বাজি।

ক্যাপটেনের মেয়ে

ইয়েমেলিয়ান প্গাচেভের (১৭৪৪-১৭৭৫) ব্যক্তিত্ব প্শকিনকে আকৃষ্ট করে। মহাফেজখানার মালমশলা অধ্যয়ন করেন তিনি, অভ্যুত্থান যে সব জায়গায় ছড়িয়েছিল সেখানে যান, আলাপ করেন প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে এবং একই সময়ে লিখতে থাকেন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ক্যাপটেনের মেয়ে' আর গবেষণা গ্রন্থ 'প্গাচেভ বিদ্রোহের ইতিহাস'।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোলিপি — 'বাক-সর্বস্ব' নামক একটি মিলনান্ত থেকে; রচয়িতা ইয়কেভ ক্নিয়াজ্নিন (১৭৪২-১৭৯১)।

ক্ভাস — র্টি থেকে তৈরি এক ধরনের পানীয়।

'মাদাম, জ্য ভু প্রি ভদ্কিউ!' — 'মাদাম, দয়া করে আমাকে একটু ভদ্কা দিন।' (ফরাসী)

আন্না ইয়োআন্নোভ্না — র্শ সম্রাজ্ঞী (রাজত্বের কাল — ১৭৩০-১৭৪০ সাল)।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোলিপি — ইয়াকভ ক্নিয়াজনিন-এর 'উৎকেন্দ্রিকের দল' কমেডি থেকে।

স্মারোকভ (১৭১৮-১৭৭৭) — র্শ নাট্যকার ও সাংবাদিক; র্শ সাহিত্যে ক্ল্যাসিকাল ঝোঁকটির প্রতিনিধি।

ইচ্ছা করে নাশ করি প্রেমের ভাবনা... — 'র্শ গানের একটি নতুন ও সম্প্র্ণ সংগ্রহ' থেকে একটু পরিবর্তিত গান। সংকলন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পরিচিত র্শ শিক্ষাবিদ নিকোলাই নভিকভ।

ত্রেদিয়াকোভ্‌স্কি — অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ কবি ও অনুবাদক। রুশ সাহিত্যের ভাষা সৃষ্টির কাজে এবং রুশ গদ্যভাষার সংস্কার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যম নিয়োজিত ছিল।

ক্যাপটেনের মেয়ে ঘরেই থাকো, নিশুতি রাতে বেড়াতে যেও নাকো। — ইভান প্রাচের 'রুশ গানের সংকলন, স্বরলিপি সম্বলিত' থেকে।

ইয়াক্‌সি! — 'আচ্ছা বেশ।' (তাতার) ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রুশ দেশে তাতার-মঙ্গোল আধিপত্য ছিল, সেই সময়কার একটি প্রবাদবাক্য।

গ্রিশ্‌কা ওত্রেপিয়েভ — ভুয়ো-জার নিজের পরিচয় দেয় দুর্ধর্ষ ইভানের পুত্র প্রিন্স দ্‌মিত্রি বলে। ১৬০৫-১৬০৬ সালে, পোলীয় হস্তক্ষেপকারীদের সহায়তায় এই 'ভুয়ো-দ্‌মিত্রি' এগারো মাস মস্কো অধিকার করে থাকে।

তব সাথে পরিচয় ছিল সে মধুর, — রুশ কবি ও নাট্যকার মিখাইল খেরাস্কোভ-এর (১৭৩৩-১৮০৭) 'বিদায়' গান থেকে।

দখল রেখে প্রান্তরে ও পাহাড়ে — খেরাস্কোভ-এর 'রাশিয়াদা' মহাকাব্য থেকে। ১৫৫২ সালে দুর্ধর্ষ ইভান কাজান শহর অধিকার করেন (তার আগে পর্যন্ত শহরটি তাতার খানের দখলে ছিল); এই ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্যে কবিতাটি রচিত।

হিংস্র হলেও পেটটা ভরা থাকায় — যদিও সুমারোকভের নাম লেখা আছে, কিন্তু আসলে এই উদ্ধৃতিটি পুশকিনের নিজের লেখা।

ফিওদর ফিওদরিচ — পুগাচেভ শ্লেষের সঙ্গে প্রুশীয় রাজা দ্বিতীয় ফ্রিডরিখের নামটিকে রুশীয় নামে রূপান্তরিত করছেন।

আমাদের আপেল গাছের... — বিয়ের যে গান পুশকিন টুকে নিয়েছিলেন তার রূপান্তর।

'রাগ ক'রো না, ওগো মশায়' — যদিও ক্‌নিয়াজ্‌নিনের নাম লেখা আছে, কিন্তু এই উদ্ধৃতিটি আসলে পুশকিনের নিজেরই লেখা।

আমার বাবা তো ভলিন্‌স্কি আর খ্রুস্‌শেভের সঙ্গে শহীদ হয়েছেন! — আরতেমি ভলিন্‌স্কি ছিলেন সম্রাজ্ঞী আন্না ইয়োআন্নোভ্‌নার মন্ত্রী। তার সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন নৌ-বাহিনীর মন্ত্রী-দপ্তরের অফিসার পরামর্শদাতা আন্দ্রেই খ্রুস্‌শেভ; ১৭৪০ সালে কুদেতা'র অভিযোগে তাঁদের একই সঙ্গে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

...একটা স্মৃতিস্তম্ভ — ১৭৭০ সালের ২১শে জুলাই কাগুলো নদীর তীরে রুশ বাহিনী জয়লাভ করে তুর্কীদের ওপরে। এই জয়লাভকে মর্যাদা দেবার জন্যে ত্সার্‌স্কোয়ে সেলোতে একটি স্তম্ভ স্থাপিত হয়।

'ক্যাপটেনের মেয়ে'র এই অধ্যায়টি মূল পুস্তক থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বোঝা যায় সেন্সরের কারণে। শুধু পাণ্ডুলিপিতেই এই অধ্যায়টিকে পাওয়া যায় এবং নাম দেওয়া হয়েছে 'বর্জিত অধ্যায়'। এই ভাষ্যে গ্রিনেভের নাম 'বুলানিন' এবং জুরিনের নাম 'গ্রিনেভ'।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন
১৭, জুবভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮০

আলেক্সান্দর পুশকিন · গল্প

৫৮